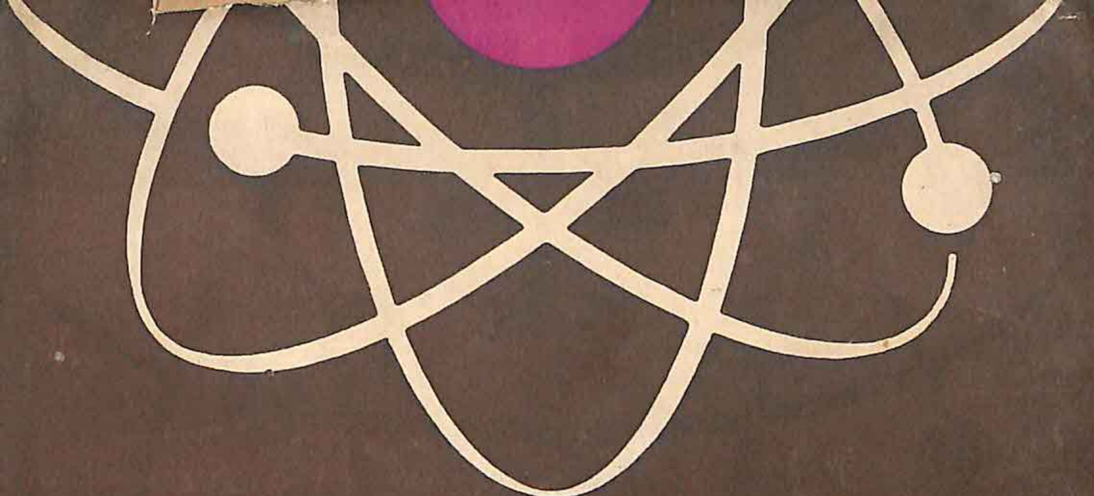


অগ্রজ বিজ্ঞানী

সমরজিৎ কর



১৯১৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠা করলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। পরের বছর সদ্য এম. এস. সি. পাশ একদল তরুণ এলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। তাঁদের আর্জি, রসায়নে এম. এস. সি. পড়ানোর ব্যবস্থা যেমন রয়েছে, আধুনিক গণিত ও পদার্থবিদ্যায়ও তেমন ব্যবস্থা করা হোক। 'কে পড়াবে?' প্রশ্ন করলেন স্যার আশুতোষ। 'কেন? আমরা।' জবাবে বললেন সেই তরুণ ছাত্রদল। এর পরের ইতিহাস অনেকেরই জানা। নিজেদের তৈরি করে নিয়ে, অল্প বেতনে, নতুন-খোলা বিষয়ে দারুণ উদ্যমে এম. এস. সি. পড়াতে লাগলেন সেই ছাত্ররা। লেকচারার নিযুক্ত হলেন এঁরা সবাই। সেদিন যাঁদের আবেদনে সাড়া দিয়েছিলেন স্যার আশুতোষ, তাঁদের মধ্যে ছিলেন মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ বিজ্ঞানীরা। বিজ্ঞানচর্চাকে সেদিন যাঁরা জীবনের ব্রত রূপে গ্রহণ করেছিলেন, স্ব-স্ব ক্ষেত্রে তাঁরা অচিরেই হয়ে উঠলেন এক-একটি ইন্‌স্টিটিউশন। ভারতকে প্রতিষ্ঠিত করলেন তাঁরা পৃথিবীর বিজ্ঞান-মানচিত্রে।

এমনই কয়েকজন অগ্রণী বিজ্ঞানীর জীবন ও কর্মের পরিচয় দিয়েছেন এই বইতে সমরজিৎ কর—বিজ্ঞানকে সাহিত্যের মতো স্বাদু ও সর্বজনগ্রাহ্য করে তোলায় যাঁর জুড়ি মেলা ভার। প্রতিটি বিজ্ঞানীর ফোটো এ-বইয়ের আলাদা আকর্ষণ।

১৫·০০

অগ্রজ বিজ্ঞানী

সমরজিৎ কর

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ জ্বলাই ১৯৮০ প্রচ্ছদ বিপ্বল গ্বহ গ্রন্থস্বত্ব শীলা কর

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ফণিভূষণ দেব কর্তৃক ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলিকাতা ৭০০০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে দ্বিজেন্দ্রনাথ বস্ব কর্তৃক পি ২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম নং ৬ এম কলিকাতা ৭০০০৫৪ থেকে ম্বদ্রিত।

ম্ল্য ১৫·০০

শ্রীগৌরকিশোর ঘোষ
শ্রদ্ধাভাজনেষু

॥ প্রসঙ্গ কথা ॥

২৭ মার্চ, ১৯১৪। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলো। প্রতিষ্ঠা করলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তার পরের বছর সদ্য এম. এস. সি. পাশ করে একদল তরুণ এলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।

কি ব্যাপার? জিজ্ঞেস করলেন আশুতোষ।

তাঁরা বললেন, স্যার, আমরা এম. এস. সি. তো পাশ করলাম। এখন কী করবো? আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নে এম. এস. সি. পড়ানোর ব্যবস্থা রয়েছে। এবার আধুনিক গণিত এবং পদার্থবিদ্যায় এম. এস. সি. পড়ানোর কি ব্যবস্থা করা যায়?

কে পড়াবে?

কেন আমরা?

পারবে?

নিজেদের আমরা তৈরি করে নেবো।

বেশ। একটু ভাবতে দাও আমাকে। কী করা যায় পরে বলবো।

আশুতোষের মাথায় তখন একটিমাত্র চিন্তা। দেশকে আত্মনির্ভর করে গড়ে তুলতে গেলে চাই উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষা। বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপযুক্ত পরিবেশ। এর জন্যেই পশ্চিমী দেশগুলি অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে প্রচণ্ডভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। ভারত পিছিয়ে থাকবে কেন? তিনি বুঝেছিলেন, বিদেশী শাসকরা এ ব্যাপারে ভারতীয়দের কখনই সাহায্য করবে না। নিজেদের হাল নিজেদেরই ধরতে হবে।

তরুণ ছাত্রদের আবেদনে সাড়া দিলেন আশুতোষ।

কয়েকদিন পর তাঁদের ডেকে তিনি বললেন, তোমাদের কথাই রইলো। আধুনিক গণিত এবং পদার্থবিদ্যার এম. এস. সি. কোর্স খুলবো। তবে দুটি কথা। কিছুটা সময় দিচ্ছি। এর মধ্যে পড়ানোর ব্যাপারে নিজেদের যোগ্য করে গড়ে তোল তোমরা। সরকারী চাকরি করলে তোমরা বড়লোক হতে পারতে। এখানে কিন্তু সে সুযোগ নেই। এখানে যা বেতন পাবে তা খুবই কম। এ কথাটি তোমাদের মনে রাখতে হবে।

আশুতোষের কথা শুনে তরুণ ছাত্রদের মধ্যে সে কী উৎসাহ! যেন হাতে স্বর্গ পেলেন তাঁরা। মাইনে? দূর দূর! কে ভাবছে মাইনের কথা?

আশুতোষ বৃত্তির ব্যবস্থা করলেন। বিদেশ থেকে বইপত্র এবং গবেষণামূলক পত্র-পত্রিকা আনিয়ে পাঠাগারের ব্যবস্থা করলেন। শিক্ষকতার কাজে নিজেদের প্রস্তুত করে নিলেন তরুণ ছাত্ররা।

প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ১৯১৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মিশ্রগণিত এবং পদার্থবিদ্যার এম. এস. সি. কোর্স খুললেন স্যার আশুতোষ। যাঁদের আবেদনে সেদিন তিনি সাড়া দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ। মিশ্রগণিত এবং পদার্থবিদ্যা পড়ানোর জন্যে তাঁদের লেকচারারের পদে নিযুক্ত করা হলো।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সে এক মাহেন্দ্রক্ষণ। ভারতীয় বিজ্ঞান উদ্যোগেও কি

নয়? বিজ্ঞানচর্চাকে সেদিন যাঁরা জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, দেখা গেল স্ব স্ব ক্ষেত্রে নিজেরাই তাঁরা হয়ে উঠলেন এক একটি ইনসটিটিউশন। ভারতকে তাঁরা প্রতিষ্ঠিত করলেন পৃথিবীর বিজ্ঞান-মানচিত্রে। বলা বাহুল্য, এই ঘটনার উত্তরসূরী আরও কয়েকজন। তাঁদেরও কর্মযজ্ঞের শুরু কলকাতায়। উত্তরকালে তাঁদেরও অবদান বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আলোর সন্ধান জুগিয়েছে।

বাঙালীর মধ্যে যাঁরা কলকাতাকে কেন্দ্র করে ওই সময় বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাঁদের মোট কর্মময় জীবন এবং ধ্যানধারণার রেখাচিত্রই বর্তমান গ্রন্থের বিষয়বস্তু। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এখনও আমাদের মধ্যে রয়েছেন। কেউ বা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। যখন তাঁদের পরিণত বয়েস, কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়েছেন, ওই সময় তাঁদের অনেকেরই আমি একান্ত সাক্ষাৎকার নেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। এই সাক্ষাৎকারের প্রেরণা 'দেশ' সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ এবং আমার অগ্রজপ্রতিম সাহিত্যিক শ্রীগৌরকিশোর ঘোষ (রূপদর্শী)। ওঁরা বললেন, 'গুরুগম্ভীর পাণ্ডিত্যের দরকার নেই। দেশের মানুষ, বিশেষ করে আমাদের তরুণ-তরুণীরা যাতে আমাদের অগ্রজ বিজ্ঞানীদের কাজকর্মের পরিচয় পায়, তাঁদের আদর্শ এবং মানসিকতা উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়, সেদিকে লক্ষ রেখে তাঁদের কথা তুলে ধরো।' তাই রচনাগুলি মুখ্যতঃ সাক্ষাৎকারের উপর ভিত্তি করেই লেখা হয়েছে। তাঁরা নিজের মুখে যা বলেছেন আমি তা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এর ফলে পাঠক-পাঠিকারা তাঁদের পরিণত বয়েসের মানসিকতা এবং ব্যবহারিক জীবনের কিছুটা আভাস পাবেন। আমার মনে হয়েছে, কোন ব্যক্তিত্বকে হৃদয়ের কাছে পেতে গেলে এটা দরকার। সাক্ষাৎকারগুলি 'দেশ'-এ প্রকাশিত হলে অগণিত পাঠক-পাঠিকা আমাকে অভিনন্দন জানান। এর জন্যে তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে নিবেদন, সাক্ষাৎকারের উপর নির্ভর করার দরুণ আরও কয়েকজন প্রথিতযশা বিজ্ঞানী বাদ পড়লেন। এঁদের মধ্যে আছেন জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, শিশিরকুমার মিত্র, প্রমুখ। এটা অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি। তাছাড়া বর্তমান লেখাগুলির পেছনেও আমার যে সুষ্ঠু পরিকল্পনা ছিল, তাও বলবো না। যাঁদের কথা বলেছি, এক একটি উপলক্ষকে কেন্দ্র করে তাঁদের সামনে গিয়ে আমাকে দাঁড়াতে হয়েছিল। তখন যেটুকু আমাকে তাঁরা বলেছেন আমি লিখে গিয়েছি। তাই পরিপূর্ণ রচনা না বলে লেখাগুলি স্কেচ্ বললেই ভালো হয়।

ডানকুনি (হুগলী)
জুলাই. ১৯৮০

সমরজিৎ কর

সূচী



মেঘনাদ সাহা

মেঘনাদ সাহা

অসাধারণ ধী-শক্তি, জ্ঞান এবং কর্মোত্তম। এবং সেই সঙ্গে অপরিসীম মানবিকতাবোধ। যদি কেউ মনে করেন, একটি মানুষের মধ্যে এতগুলি গুণের সমন্বয় বিরল ঘটনা, তা হলে অবশ্যই বলব, ভারতের ইতিহাসে মেঘনাদ সাহাও এক বিরল ব্যক্তিত্ব। বিজ্ঞান তাঁর কাছে ছিল জীবনের সোপান। বিশ্বাস। তিনি মনে করতেন, চিন্তাভাবনার কসরৎ অথবা ভৌতজগতের সত্যানুসন্ধানই বিজ্ঞানের একমাত্র উদ্দেশ্য হতে পারে না; মানুষের স্থূল প্রয়োজন থেকে শিল্প, কলা এবং সাংস্কৃতিক উত্তরণ সার্থক করে তোলার পেছনেও বিজ্ঞানের ভূমিকা অপরিহার্য। আর এর জন্যেই জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত তিনি সংগ্রাম করে গেছেন।

বছর দশ আগে। বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ডিরেকটার এবং বিশ্ববিশ্রুত পদার্থ-বিজ্ঞানী আচার্য দেবেন্দ্রমোহন বসু তখন অবসর জীবন যাপন করছেন। ওই সময় একদিন তাঁর ঘরে বসে নিভৃতে আলোচনা করছিলাম। আমাদের আলোচ্য বিষয় ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান-চর্চা। দেবেন্দ্রমোহন ছিলেন অত্যন্ত সংযতবাক্। সতর্কও। ঠিক যেটুকু কথা বলা দরকার, তার বেশি তিনি বলতেন না। মনে পড়ে, সেদিন তিনি অনেকেরই নাম করেছিলেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ থেকে শুরু করে তাঁর অনুজপ্রতিম যাঁরা ছিলেন, যেমন শিশিরকুমার মিত্র, সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি। কিন্তু মেঘনাদ সাহার কথা উঠতেই তাঁর বাক্সংযম যেন হারিয়ে গেল। দেবেন্দ্রমোহনকে অতটা উচ্ছ্বসিত এর আগে কখনও দেখি নি।

জিজ্ঞেস করেছিলাম, মেঘনাদ সাহার সঙ্গে ঠিক কোন সময়ে আপনার প্রথম পরিচয় হয়েছিল ?

'প্রথম পরিচয় বললে ভুল হবে। বরং বলতে পার প্রথম সাক্ষাৎ।' বললেন দেবেন্দ্রমোহন। 'সেটা ১৯১৩ সালের এপ্রিল মাস। স্কটিশচার্চ কলেজে তখন আমি পদার্থবিজ্ঞানের বি. এস. সি পাশ কোর্সের পরীক্ষা নিতে গেছি। আমার পরীক্ষার্থিদের মধ্যে ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ,

জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং আরও কয়েকজন। মেঘনাদ সাহাকে সেই প্রথম দেখেছিলাম আমি। পরে ১৯১৯ সালে বার্লিন থেকে ফিরে যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে যোগ দিলাম, সেখানে সতীর্থ হিসেবে পেলাম দুই তরুণকে। সত্যেন্দ্রনাথ এবং মেঘনাদ। ওঁদেরকে আমার অভিজ্ঞতার কথা জানালাম। বললাম, বিজ্ঞানে পাশ্চাত্যদেশগুলিতে অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটে চলেছে। বললাম বার্লিনে আমার অভিজ্ঞতার কথা। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় তখন আলোকিত করে রেখেছেন এক এক জন দিকপাল বিজ্ঞানী। যাঁদের মধ্যে আছেন ম্যাক্স প্লাঙ্ক, আলবার্ট আইনস্টাইন, ভারবুর্গ, ম্যাক্স বর্ণ, ওয়ালটার নার্নস্ট। কোয়াণ্টাম তত্ত্ব এবং আপেক্ষিকবাদ নিয়ে চলেছে নানান গবেষণা। লক্ষ করলাম, মেঘনাদ এবং সত্যেন্দ্রনাথ আমার কথাগুলি যেন গিলছেন। বার্লিন থেকে দুটি বই এনেছিলাম। প্লাঙ্কের লেখা। Thermodynamik এবং Warmesstrahlung। বই দুটির মধ্যে ডুবে গেলেন সত্যেন্দ্রনাথ। কিন্তু মেঘনাদ মুখর হয়ে উঠলেন। বিদেশে কোয়াণ্টাম পদার্থবিদ্যা এবং তাপবলবিদ্যার উপর সাম্প্রতিক গবেষণার খবরাখবর জানার জন্যে নিয়মিত আলোচনা করতে লাগলেন তিনি। বিশেষ করে 'থার্মাল আইওনাইজেশন' এবং কী ভাবে তার সাহায্যে নক্ষত্রের আলোক বর্ণালীর চরিত্রাবলী ব্যাখ্যা করা যায় তার উপর। আমার তখনই মনে হয়েছিল, শুধু তত্ত্ব নিয়ে চিন্তাভাবনা করেই মেঘনাদ ক্ষান্ত হতে চান না, তত্ত্বের পরীক্ষালব্ধ ফলাফল এবং তার প্রয়োগের দিকেই তাঁর আগ্রহ অনেক বেশী।'

ল অভ্ থার্মাল আইওনাইজেশন। বাংলা পরিভাষা করলে যা দাঁড়ায়: তাপ আয়নয়ন সূত্র। মেঘনাদ সাহার এই সূত্র জ্যোতি-পদার্থবিজ্ঞানে এক অভূতপূর্ব সংযোজন। সূর্য এবং যাবতীয় নক্ষত্রের চারপাশে ঘিরে রয়েছে গ্যাসীয় পরিমণ্ডল। সেই গ্যাসের মধ্যে থাকে নানা রকম মৌলিক পদার্থের 'নিউট্রাল অ্যাটম' বা বিদ্যুৎনিরপেক্ষ পরমাণু এবং আয়ন। বিভিন্ন নক্ষত্রের গ্যাসীয় মণ্ডলে কত ভাগ বিদ্যুৎনিরপেক্ষ পরমাণু এবং কতভাগ আয়ন থাকতে পারে মেঘনাদ সাহার এই সূত্রের সাহায্যে তার হিসেব করা যায়। এ ছাড়া নিখুঁত ভাবে বিভিন্ন নক্ষত্রের তাপমাত্রা নির্ণয় করার ব্যাপারেও এই সূত্রটি সাহায্য করে।

১৯৫৩ সালে মেঘনাদ সাহার ষষ্টতম জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়েছিল কলকাতায়। ওই সময় ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ডিপার্টমেন্টের জ্যোতির্বিজ্ঞানী ডঃ অটো স্ট্রুভে মন্তব্য করেছিলেনঃ মেঘনাদ সাহার 'তাপ আয়নয়ন সূত্র' বৈজ্ঞানিক চিন্তাজগতে একটি শ্রেষ্ঠতম উত্তরণ। নক্ষত্রের বর্ণালী বিশ্লেষণে ফ্রনহফার (১৮২৪) এবং কিরশফের (১৮৫৭) পর এমন গুরুত্বপূর্ণ সূত্রের আবিষ্কার এই প্রথম। জ্যোতি-পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণায় এই সূত্রের ভূমিকা আজও ম্লান হয় নি।

জ্যোতি-পদার্থবিজ্ঞানে মেঘনাদের আগ্রহ গোড়া থেকেই দেখা গিয়েছিল। তখন তিনি বালক। হাতে পেলেন দুটি বই। একটি সূর্যের উপর লেখা। অপরটির বিষয়বস্তু নক্ষত্রজগৎ। লেখিকা অ্যাগনেস ক্লার্ক। বই দুটি পড়ার পর নাক্ষত্রিক আবহাওয়ামণ্ডল নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করেন তিনি। উত্তরকালে এই ভাবনাচিন্তাই তাঁকে থার্মাল আইওনাইজেশনের সূত্রটি আবিষ্কার করতে সাহায্য করেছে। এই আবিষ্কারের মূল পটভূমি কী ছিল কৌতূহলী পাঠক-পাঠিকাদের জন্যে সংক্ষেপে তা তুলে ধরছি।

অনেকেই জানেন, সূর্য আমাদের নিকটতম নক্ষত্র। তার থালার মত উজ্জ্বলতম যে অংশটি আমরা খালি চোখে দেখতে পাই তার নাম 'ফটোস্ফিয়ার' বা জ্যোতির্মণ্ডল। ফটোস্ফিয়ারকে বেষ্টন করে ঘিরে থাকে 'ক্রোমোস্ফিয়ার' বা বর্ণমণ্ডল। হাজার হাজার মাইল বিস্তৃত এই অঞ্চলটির মধ্যে থাকে আয়নিত গ্যাস। এই অঞ্চলের তাপমাত্রা চার হাজার থেকে চল্লিশ হাজার ডিগ্রি কেলভিন। সূর্যের পূর্ণগ্রাস গ্রহণের সময় তার কালো থালার মত অঞ্চলটির চারপাশে একটি ফিকে আভা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই অঞ্চলটিকে বলা হয় 'করোনা' বা জ্যোতির্বলয়। অদ্ভুত ব্যাপার এই, সূর্যের উপরিভাগের তাপমাত্রা প্রায় ছয় হাজার ডিগ্রি কেলভিন। অথচ এই 'করোনা'র তাপমাত্রা প্রায় কুড়ি লক্ষ ডিগ্রি কেলভিন। কখনও বা এর কোন কোন অঞ্চলের তাপমাত্রা চল্লিশ লক্ষ ডিগ্রি হতেও দেখা গেছে। জ্যোতি-পদার্থবিজ্ঞানীরা এই অঞ্চলগুলির নাম রেখেছেন 'হট স্পট'। 'করোনা' সূর্যের ফটোস্ফিয়ার থেকে প্রায় ছয় লক্ষ গুণ কম উজ্জ্বল। আমরা জানি, যে কোন বস্তুকে প্রচণ্ডভাবে উত্তপ্ত করলে তা থেকে আলো নির্গত হয়। সোডিয়াম উত্তপ্ত হলে বিকীর্ণ করে এক ধরনের আলো। আবার হাইড্রোজেন উত্তপ্ত হলে বিকীর্ণ হয় আর এক ধরনের আলো

অর্থাৎ এক কথায়, অতিরিক্ত তাপমাত্রায় এক একটি বস্তু এক এক ধরনের আলো বিকীর্ণ করে। ফলে ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই : ধরা যাক কোন উৎস থেকে আলো বিকীর্ণ হচ্ছে। বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সেই আলো বিশ্লেষণ করে বলা সম্ভব সেই উৎসের মধ্যে কোন কোন বস্তু অবস্থান করছে। বলা বাহুল্য, সূর্যের কাছাকাছি অঞ্চলের গ্যাসীয় পরিমণ্ডলের বর্ণালী পরীক্ষা করে জ্যোতি-পদার্থবিজ্ঞানীরা সেখানে প্রায় একষট্টিটি মৌলিক পদার্থের সন্ধান পেয়েছেন।

মেঘনাদ সাহা তখন তাপবলবিদ্যা নিয়ে পড়াশুনা করছেন। সূর্যের আবহাওয়ামণ্ডল সম্পর্কে নতুন নতুন তথ্য আসছে তাঁর কাছে। পশ্চিমী বিজ্ঞানীরা তখন সূর্যের বর্ণালী নিয়ে নানাভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছেন। জানা গেল, সূর্যের আবহাওয়ামণ্ডলে রয়েছে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণু। কিন্তু অদ্ভুত একটি ঘটনাও লক্ষ করলেন অনেকে। সূর্যের কাছাকাছি অঞ্চলে হাল্কা পদার্থ, যেমন হাইড্রোজেন, হিলিয়াম,—এদের প্রাধান্যই বেশী। তুলনায় অপেক্ষাকৃত ভারী পদার্থগুলি ছড়িয়ে রয়েছে সূর্যের উর্ধ্বাকাশে। এই পদার্থ-গুলির মধ্যে ক্যালসিয়ম অন্যতম। তাজ্জব কাণ্ড! ভারী বস্তুগুলি থাকবে সূর্যপৃষ্ঠের কাছাকাছি অঞ্চলে, এবং হাল্কা যারা তারা থাকবে উর্ধ্বাকাশে এটাই তো নিয়ম হওয়া উচিত।

ইতিমধ্যে জানা হয়ে গেছে, বাতাসের মত আলোও চাপ সৃষ্টি করতে পারে। বায়ুপ্রবাহের মত আলোকপ্রবাহও বস্তুর উপর ধাক্কা দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। এই ধারণার উপর নির্ভর করে সৃষ্ট হলো 'থিওরি অভ্ সিলেকটিভ রেডিয়েশন প্রেসার'। বাংলা পরিভাষা করলে যা হয়ত দাঁড়ায় নির্বাচিত বিকিরন-চাপ তত্ত্ব। আলোক এক ধরনের কণা। যার নাম দেওয়া হয়েছে 'লাইট কোয়ান্টা'। এই তত্ত্বে বলা হলো, লাইট কোয়ান্টা এক এক ধরনের মৌলিক পদার্থের পরমাণুর উপর বিশেষ বিশেষ পরিমাণ চাপ সৃষ্টি করে। এই সূত্র ধরে মেঘনাদ সাহা দেখালেন, সূর্যের আলোর এমনই গঠনবৈচিত্র্য যে, বিশেষ বিশেষ পরমাণুর উপর তার চাপের পরিমাণও হয় ভিন্নতর। ক্যালসিয়মের উপর চাপের পরিমাণ বেশী। তাই ক্যালসিয়ম সূর্যপৃষ্ঠ থেকে দূরাঞ্চলে ছড়িয়ে যায়। মিলান প্রভৃতি বিজ্ঞানী পরবর্তীকালে তাঁর এই মতবাদটি সাফল্যের সঙ্গে প্রমাণ করেছেন।

১৯১৪ সালে প্রকাশিত হলো নীলস্ বোহ্‌রের পারমাণবিক গঠন তত্ত্ব। পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাসে সে এক যুগান্তকর ঘটনা। ভারতে বোহ্‌রের এই তত্ত্ব

নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করলেন মেঘনাদ সাহা। পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে নিউক্লিয়াস। তার চারপাশে বিভিন্ন কক্ষপথে ঘুরে চলে নিগেটিভ তড়িৎ-ধর্মী কণা ইলেকট্রন। জানা গেল, পরমাণু থেকে এক বা একাধিক ইলেকট্রন যদি ছিটকে বাইরে বেরিয়ে যায়, পরমাণু তখন আয়নিত হয়। মেঘনাদ বললেন, পরমাণুর আয়নে পরিণত হওয়ার ব্যাপারটা রাসায়নিক বিয়োজনেরই মত। জটিল কোন রাসায়নিক যৌগ ভেঙ্গে গিয়ে সৃষ্টি করে দুইটি সরলতর রাসায়নিক যৌগের মিশ্রণ। ঠিক তেমনি পরমাণু থেকে এক বা একাধিক ইলেকট্রন কণা স্খলিত হয়ে সৃষ্টি করে আয়ন এবং স্বাধীন ইলেকট্রনের মিশ্রণ। তিনি বললেন, প্রচণ্ড উত্তাপেও পরমাণু থেকে ইলেকট্রন কণা ছিটকে বেরিয়ে যায় এবং পরমাণুকে আয়নে পরিণত করে। তাপের মাত্রা যত বেশি হয়, সেই সঙ্গে বাড়ে আয়নের পরিমাণ।

হ্যাঁ, আরও একটি কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার। পরমাণু থেকে ইলেকট্রন বেরিয়ে যাওয়ার পর সৃষ্ট হয় আয়ন। তা হলে অবস্থা দাঁড়াচ্ছে এই : প্রচণ্ড তাপমাত্রায় পদার্থ গ্যাসে রূপান্তরিত হলো। সেই গ্যাসের কিছু কিছু পরমাণু পরিণত হলো আয়নে। আর সেই পরমাণু থেকে বেরিয়ে আসা ইলেকট্রন বিচরণ করতে শুরু করল আশেপাশে। মুক্ত এই ইলেকট্রন কোন আয়নের কাছে এলে ওই আয়ন তাকে বন্দীও করতে পারে। বন্দী করে পরিণত হতে পারে তড়িৎ নিরপেক্ষ পরমাণুতে। গ্যাসীয় পরিমণ্ডলের চাপ যত বেশি হবে, ইলেকট্রনের আয়নের সান্নিধ্যে আসার সম্ভাবনাও তত বেশি বেড়ে যাবে। বলা বাহুল্য, পরমাণুর ভেতর থেকে ইলেকট্রনের বেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অবশ্য নির্ভর করে পরমাণুর সঙ্গে ইলেকট্রন কতটা প্রবলভাবে যুক্ত থাকে তার ওপর। পরমাণুর সঙ্গে যে সব ইলেকট্রন প্রচণ্ড শক্তিতে আবদ্ধ থাকে, পরমাণু থেকে তারা সহজে বেরিয়ে আসতে পারে না। যাদের উপর শক্তির প্রভাব কম তারা সহজেই বেরিয়ে আসে।

'ইকুয়েশন অভ্ থারমাল আইওনাইজেশনে'র উপর তাঁর প্রথম গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হলো লণ্ডনের 'ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিন'-এ। সেটা ১৯২০ সাল। তখন তাঁর বয়েস মাত্র ২৭। গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানীমহলে মেঘনাদের নাম ছড়িয়ে পড়ল। তাঁর তত্ত্ব নাক্ষত্রিক বর্ণালী বিশ্লেষণের ব্যাপারে একটি নতুন দিগন্ত খুলে দিল। এবং সেই সঙ্গে

নক্ষত্রের আবহাওয়ামণ্ডলের রাসায়নিক গঠন, তাপমাত্রা, ঘনত্ব প্রভৃতি সম্পর্কে যথাযথ তথ্য জানার ব্যাপারে সাহায্য করল বিজ্ঞানীদের। এই অসামান্য কৃতিত্বের জন্যে লন্ডনের রয়েল সোসাইটি ১৯২৭ সালে মেঘনাদ সাহাকে ফেলো হিসেবে নির্বাচিত করে। উল্লেখ করা যেতে পারে, স্যার আর্থার এডিংটন একবার মন্তব্য করেছিলেন, গ্যালিলিওর দূরবীক্ষণ যন্ত্র তৈরির পর যে দশটি শ্রেষ্ঠতম আবিষ্কার জ্যোতির্বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠতম বলে বিবেচিত হয়েছে, মেঘনাদ সাহার থার্মাল আইওনাইজেশনের সূত্র তাদের মধ্যে অন্যতম।

হ্যাঁ, মেঘনাদ সাহার জীবন যেন এক বিচিত্র ইতিহাস।

জন্ম ৬ অক্টোবর, ১৮৯৩। ঢাকা জেলার সেওড়াতলী গ্রামে। বাবা জগন্নাথ সাহা। মা ভুবনেশ্বরী দেবী। গ্রামে স্কুল ছিল না। স্কুল বলতে সাত মাইল দূরে সেই সিমুলিয়ায়। সিমুলিয়াও একটি গ্রাম। বালক মেঘনাদকে দৈনিক যাওয়া আসা করে সেখানে গিয়েই পড়াশুনা করতে হত। ওই স্কুল থেকে ঢাকা জেলার সমস্ত পরীক্ষার্থিদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে ১৯০৫ সালে তিনি নিম্ন মাধ্যমিক (মিডল্ ইংলিশ) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

এর পর ঢাকার বিখ্যাত কলেজিয়েট স্কুলে এসে পড়াশুনা শুরু করেন মেঘনাদ। এটা ছিল উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়। এখানে তিনি সহপাঠী হিসেবে পেলেন নিখিলরঞ্জন সেন এবং সুরেন্দ্রকুমার রায়ের মত দু জন মেধাবী ছাত্রের সান্নিধ্য।

পড়াশুনা চলছিল ভালই। কিন্তু তার ফাঁকেই দেখা দিল বিপত্তি।

তখন বঙ্গবঙ্গ আন্দোলনের সময়। তার প্রভাব ঢাকাতেও গিয়ে পড়েছে। সেই আন্দোলনে ছাত্ররাও যে অংশগ্রহণ করছে, তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকারের তা অজানা ছিল না। একদিন খবর এল, বঙ্গের রাজ্যপাল আসছেন কলেজিয়েট স্কুল পরিদর্শনে। পরিদর্শন অবশ্য ছল মাত্র। আসলে স্কুলের ছাত্রদের মতিগতি দেখার জন্যেই তাঁর যে আগমন, এ কথা বুঝতে কারোরই আর বাকি রইল না।

রাজ্যপাল এলেন। ছাত্ররা তাঁকে বয়কট করার আন্দোলনে মাতলো। এই আন্দোলনে যোগ দেওয়ার অপরাধে আরও বহু ছাত্রের সঙ্গে মেঘনাদ এবং নিখিলরঞ্জন স্কুল থেকে বহিষ্কৃত হলেন।

না। অসুবিধে হয় নি। জেলা স্কুল থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার অল্প দিনের

মধ্যেই ঢাকার কিশোরীলাল জুবিলি স্কুলে তিনি ভর্তি হওয়ার সুযোগ পান। পেলেন বৃত্তি এবং বিনা বেতনে পড়ার সুযোগও। ১৯০৯ সালে এখান থেকেই পূর্ববঙ্গের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন মেঘনাদ। এই পরীক্ষায় ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত এবং গণিতে তিনি শীর্ষস্থান অধিকার করেন।

ইনটারমিডিয়েট ঢাকা কলেজ থেকে। এই পরীক্ষায় তিনি তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। এর পর চলে আসেন কলকাতায়। কলকাতায় এসে প্রেসিডেন্সি কলেজে বি. এস. সি ক্লাশে ভর্তি হন। বাসস্থান হিন্দু হোস্টেল। এখানে সতীর্থ হিসেবে পেলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু, নিখিলরঞ্জন সেন, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (উত্তর-কালে রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী নির্বেদানন্দ) প্রমুখ বিশিষ্ট ছাত্র। মেঘনাদ, সত্যেন্দ্রনাথ এবং নিখিলরঞ্জন নিলেন গণিতে অনার্স। এই সময় তাঁদের অধ্যাপকদের মধ্যে ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, ডঃ ডি. এন. মল্লিক এবং অধ্যাপক সি. ই. কালিস। প্রফুল্লচন্দ্র পড়াতেন রসায়ন। জগদীশচন্দ্র পদার্থবিস্তা। ডি. এন. মল্লিক এবং কালিস পড়াতেন গণিত। ১৯১৩ সালে গণিতে অনার্স নিয়ে মেঘনাদ বি. এস. সি পাশ করলেন। ১৯১৫ সালে এম. এস. সি। এম. এস. সি-তে তাঁর পাঠ্য বিষয় ছিল ফলিত গণিত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা তো শেষ হল। এবার কী করবেন তিনি? এতকাল দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছে তাঁকে। এবার কী করবেন তিনি যাতে এই দারিদ্র্যের হাত থেকে তিনি নিষ্কৃতি পান? ঠিক করলেন সরকারী ফিনান্স পরীক্ষা দিয়ে চাকরি করবেন। অনেক কৃতি ছাত্রই তখন এই পরীক্ষাটি পছন্দ করতেন। কিন্তু বাদ সাধলো পুলিশ। তারা খবর পেলো, কলেজে পড়ার সময় মেঘনাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল বিপ্লবী যতীন মুখার্জি (বাঘা যতীন) এবং অনুশীলন সমিতির পুলিন দাসের। ফলে তাঁকে ফিনান্স পরীক্ষায় বসার অনুমতি দেওয়া হল না।

এই ঘটনা বরং শাপে বর হয়ে দাঁড়ালো।

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পঠন-পাঠন এবং গবেষণার পরিকল্পনা করছেন। তাঁর আহ্বানে তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ফলিত গণিত পড়ানোর কাজে যোগ দিলেন। এর পর ১৯১৬ সালে

সেখানে তিনি পদার্থবিজ্ঞানের লেকচারারের পদে নিযুক্ত হলেন।

অধ্যাপক দেবেন্দ্রমোহন বসু বলেছেন, মেঘনাদের কর্মক্ষমতা ছিল অপরিসীম। পদার্থবিজ্ঞানের যে কোন জটিল তত্ত্ব আয়ত্ত করতে তাঁর সময় লাগত কম। গোড়ায় ছিলেন গণিতের ছাত্র। কিন্তু নিজের চেষ্টায় খুব কম সময়ের মধ্যে পৃথিবীর তৎকালীন আলোড়নকারী তত্ত্বগুলি তিনি দখল করে বসলেন। তাপ এবং চাপের প্রভাবে বিভিন্ন আয়ন সূর্যের আবহাওয়ামণ্ডলে কী ভাবে ছড়িয়ে থাকে, বর্ণালীর সাহায্যে তা যে জানা যায়, পরীক্ষার সাহায্যে মেঘনাদ সাহাই সর্বপ্রথম সেই ঘটনা প্রমাণ করতে সমর্থ হন।

ফিলোজফিক্যাল ম্যাগাজিন, অ্যাসট্রোফিজিক্যাল জার্নাল, ফিজিক্যাল রিভিউ, জার্নাল অভ্ দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি অভ্ বেঙ্গল, জার্নাল অভ্ দ্য ডিপার্টমেণ্ট অভ্ সায়ান্স, দেশ বিদেশের এমন বহু পত্রিকায় একে একে প্রকাশিত হলো নানান গবেষণামূলক রচনা। এই সব রচনার মধ্যে আছে: On the Maxwell's Stresses, On the Fundamental Law of Electrical Action, On the Selective Radiation Pressure and its Applications, On a New Equation of State, প্রভৃতি। এই গবেষণামূলক রচনার জন্যে ১৯১৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মেঘনাদ সাহাকে ডক্টরেট ডিগ্রিতে ভূষিত করে। ১৯১৯ সালে "On the Harvard Classification of Stellar Spectra" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখে তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন।

১৯১৯ সালে গুরুপ্রসন্ন ঘোষ বৃত্তি নিয়ে মেঘনাদ ইউরোপ গেলেন। ওই সময় লণ্ডনে ইমপিরিয়াল কলেজ অভ্ সায়ান্স অ্যাণ্ড টেকনলজির বিখ্যাত বর্ণালী বিজ্ঞানী অধ্যাপক ফাউলারের কাছে কিছুদিন গবেষণা করেন। ইংলণ্ড সফরের সময় কেমব্রিজে বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার জে. জে. টমসনের সান্নিধ্যে এলেন তিনি। টমসনের পরিচয়পত্র নিয়ে তিনি বার্লিন যান এবং সেখানকার ফিজিকালিশে ইনসটিটিউটে অধ্যাপক নার্ণস্টের গবেষণাগারে কাজ করার সুযোগ পান।

বার্লিনে অবস্থানকালে স্যার আশুতোষের জরুরী চিঠি গেল। স্যার আশুতোষের আহ্বানে ১৯২১ সালে মেঘনাদ কলকাতায় ফিরে এসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিদ্যা বিভাগের 'খয়রা' অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করলেন।

কিন্তু 'খয়রা' অধ্যাপকের পদে যোগ দেবার পর উৎসাহে ভাটা পড়ল। মেঘনাদ ভেবেছিলেন কলকাতায় ফিরে প্রবল উদ্যমে তিনি গবেষণার কাজে আত্মনিয়োগ করবেন। স্যার আশুতোষও চাইছিলেন স্নাতকোত্তর শিক্ষা এবং গবেষণায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অগ্রণীর ভূমিকা লাভ করুক। কিন্তু জগদ্দল বাধা হয়ে দাঁড়াল ব্রিটিশ সরকার। এর ফলে গঠনমূলক কাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়ল। এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে ডাক এল আলিগড় মুস্‌লিম বিশ্ববিদ্যালয়, বারানসীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। তাঁরা জানালেন, মেঘনাদ এসে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপকরূপে তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিন। ডঃ নীলরতন ধর তখন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নের অধ্যাপক। গবেষণার জন্যে সেখানে তিনি একটি সুষ্ঠু পরিবেশও গড়ে তুলেছেন। তা ছাড়া প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময় নীলরতন এবং মেঘনাদের মধ্যে বন্ধুত্বও গড়ে উঠেছিল। যদিও মেঘনাদের চেয়ে নীলরতন ছিলেন বয়েসে দুই বছরের বড়। অতএব নীলরতনের আকর্ষণেই এলাহাবাদে অধ্যাপকের পদে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিলেন মেঘনাদ। ১৯২৩ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন তিনি।

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে তৈরি করলেন তিনি 'আয়নমণ্ডল' বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র। আয়নমণ্ডলের ভেতর দিয়ে কী ভাবে বেতার সংকেত গমন করে, কী ভাবে আয়নমণ্ডলের বিভিন্ন স্তর তৈরি হয়—এ সব সম্পর্কে একাধিক তত্ত্ব দাঁড় করালেন এই গবেষণাগারেই পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে।

১৯৩৬ সালে মেঘনাদ গেলেন ই. ও. লরেন্সের গবেষণাগার দেখতে। সাইক্লোট্রন নামক পারমাণবিক ত্বরক যন্ত্র আবিষ্কার করে লরেন্স ইতিমধ্যেই নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। এই গবেষণাগার দেখার পর পরমাণু বিজ্ঞানে আগ্রহান্বিত হলেন তিনি। সেখান থেকে তিনি গেলেন কোপেনহেগেন। সেখানে আন্তর্জাতিক পরমাণু বিজ্ঞানের উপর এক আলোচনা সভায় যোগ দিতে। এর তিন বছর পর জার্মান বিজ্ঞানী অটো হান কৃত্রিম উপায়ে ইউরেনিয়ামের পারমাণবিক বিভাজন ঘটান। এই সব ঘটনা তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করল। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, পারমাণবিক বিভাজনের সাহায্যে ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করা সম্ভব হবে। এ ব্যাপারে একটি প্রবন্ধও লিখলেন তিনি। প্রবন্ধটি 'সায়ান্স অ্যাণ্ড কালচার'

পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে তিনিই প্রথম পারমাণবিক শক্তির সম্ভাবনার কথা জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, এর জন্যে গবেষণা দরকার। এবং ১৯৩৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'পালিত' অধ্যাপকের পদে যোগ দেওয়ার পর পারমাণবিক গবেষণাগার গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। গড়ে তুললেন ইনসটিটিউট অভ্ নিউক্লিয়ার ফিজিকস্। ১৯৪৮ সালে ২১ এপ্রিল এই ইনসটিটিউটের নতুন ভবনের ভিত্তি স্থাপন করলেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। এর দুই বছর পর ১১ জানুয়ারী, ১৯৫০ আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করেন নোবেল বিজ্ঞানী মাদাম ইরেন জোলিও-কুরি। এই প্রথম ভারতের মাটিতে পারমাণবিক গবেষণার সূচনা হল। এখন এই প্রতিষ্ঠানটির নাম সাহা ইনসটিটিউট অভ্ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স।

শুধু পারমাণবিক বিজ্ঞানই নয়, বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভারত যাতে আত্মনির্ভর হয়, মেঘনাদ সাহার দৃষ্টি সব সময় সেদিকে সজাগ ছিল। তাঁরই উদ্যোগে এবং পরিকল্পনায় ভারতে ভূ-পদার্থ বিজ্ঞানে গবেষণার কাজ শুরু হয়। দেশে নানা রকম পঞ্জিকার চল। ফলে অঞ্চল বিশেষে তিথি, নক্ষত্র গণনায় প্রচুর গরমিল। পঞ্জিকার এই গরমিল সংশোধনের জন্যে এগিয়ে এলেন তিনি। তাঁর উদ্যোগে ১৯৫২ সালে কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান এবং কারিগরি গবেষণা পর্ষৎ তৈরি করল 'ক্যালেন্ডার রিফর্ম কমিটি'। এই কমিটির চেয়ারম্যান হলেন মেঘনাদ সাহা। কমিটির উদ্দেশ্য, দেশের প্রচলিত পঞ্জিকাগুলি পরীক্ষা করা এবং এমন একটি পঞ্জিকা প্রণয়ন যা দেশের সর্বত্র এবং সর্বশ্রেণীর মানুষ ব্যবহার করতে পারে।

১৯৩১ সালে তাঁরই উদ্যোগে তৈরি হল উত্তর প্রদেশ বিজ্ঞান আকাদেমি। ১৯৩৪ সালে এই প্রতিষ্ঠানের নাম দেওয়া হয় ভারতের জাতীয় বিজ্ঞান আকাদেমি। আকাদেমির উদ্বোধন হয় ১ মার্চ, ১৯৩২। এলাহাবাদে। মেঘনাদ সাহা হলেন এর প্রথম সভাপতি। আকাদেমির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি যে ভাষণটি দেন তার ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। পাঠক-পাঠিকাদের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্যে সেই ভাষণের কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করলাম :

"...economic and scientific studies show that the world has resources enough for her whole population, and if there

be a rational programme of production and programme of judicious and equitable distribution, nobody should suffer from hunger, privation and can even afford to have much better amenities. But for this rivalry amongst nations and communities should give way to cooperative construction, and the politician should hand over many of his functions to an international board of trained scientific industrialists, economists and 'eugenists', who will think in terms of whole world as a unit, and devise means by which more necessities of life can be got out of the earth; the whole production should be controlled by scientific industrialists and the distribution should be supervised by economists."

মেঘনাদ সাহা বুঝেছিলেন, দেশে কিছু কিছু বিদগ্ধ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠুক। এই প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা এবং তার প্রয়োগ নিয়ে মাথা ঘামাবে। দেশের বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কর্মধারার উপর আলোকপাত করবে। জাতীয় বিজ্ঞান আকাদেমি প্রতিষ্ঠার পেছনে তাঁর এই মনোভাবই কাজ করেছে।

এবং এই একই উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৩৫ সালে তাঁর উদ্যোগে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হল 'ইনডিয়ান সায়ান্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশন'। এক হাজার টাকা অনুদান দিয়ে তাঁর এই প্রচেষ্টায় সাহায্য করলেন স্যার ইউ. এন. ব্রহ্মচারী। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় হলেন প্রতিষ্ঠানটির প্রথম সভাপতি এবং মেঘনাদ স্বয়ং হলেন এর সম্পাদক। এই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশ করা হল 'সায়ান্স অ্যাণ্ড কালচার' নামে একটি পত্রিকা। এই পত্রিকায় তিনি নিয়মিত দেশের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং নানা রকম সমস্যা নিয়ে লিখতে শুরু করেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, দেশে প্রচুর গবেষণাগার থাকা দরকার। এই গবেষণাগারগুলিতে বিজ্ঞানের আধুনিকতম বিষয় নিয়ে গবেষণা করার পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। চাই মৌলিক গবেষণা। সেই সঙ্গে চাই প্রায়োগিক গবেষণা। বিজ্ঞানকে শুধু সত্যের অনুসন্ধান অথবা মগজের কসরৎ হিসেবে রাখলে চলবে না। ব্যাপকভাবে এমন সব গবেষণা করতে হবে, যা আমাদের শিল্প-উৎপাদন,

দেশের অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক মান উন্নত করতে সমর্থ হয়। লিখে চললেন একের পর এক প্রবন্ধ। এই সব প্রবন্ধে ভৌত-গবেষণাগার, গ্লাস এবং সেরামিক্স গবেষণাগার, ভূ-পদার্থ বিজ্ঞানের উপর গবেষণার কথা বিধৃত করলেন তিনি। ওই সব গবেষণাগারের পরিকল্পনা কেমন হবে, উদ্দেশ্য কি হবে—সবই তুলে ধরলেন। এই সব প্রবন্ধের মাধ্যমে বিজ্ঞানের নানা পরিকল্পনার কথা এদেশে তিনিই প্রথম সরকারের নজরে আনার চেষ্টা করেন।

সেবার বাংলায় প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ হল। দুর্ভিক্ষে মারা গেল অসংখ্য মানুষ। মেঘনাদ সাহার অন্তর কেঁদে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সায়ান্স অ্যাণ্ড কালচারে লিখলেন একটি প্রবন্ধ। 'ফুড-ফ্যামিন'। এই প্রবন্ধে তিনি পরিষ্কারভাবে জানালেন, খাদ্যের উৎপাদন বাড়াতে হবে। চাষীদের সার দিতে হবে। বেশির ভাগ চাষীই নির্ভর করে জৈব-সারের উপর। তার যোগান কম। অতএব অজৈব সারের (সিনথেটিক ফারটিলাইজার) উৎপাদনের দিকে আমাদের নজর দেওয়া দরকার। এই ভাবে তিনিই প্রথম দেশে বড় বড় সার কারখানা তৈরির যৌক্তিকতা তুলে ধরেন।

১৯১৩ সাল। সেবার বর্ষা হল প্রচণ্ড। বর্ধমান ডিভিসনের নিম্ন দামোদর উপত্যকায় দেখা দিল প্রচণ্ড বন্যা। মেঘনাদ তখন এম. এস. সি ক্লাশের ছাত্র। কলকাতা থেকে একদল স্বেচ্ছাসেবী গেল বন্যাত্রাণের কাজে। সেই দলে মেঘনাদও ছিলেন। বন্যার তাণ্ডব ব্যাকুল করল তাঁকে। এর দশ বছর পর আবার বন্যা। এবার উত্তরবঙ্গে। মেঘনাদ তখন সবে ইউরোপ থেকে ফিরে এসেছেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র গড়ে তুলেছেন 'নর্থবেঙ্গল রিলিফ কমিটি'। মেঘনাদকে তিনি বললেন, এই কমিটিতে তুমি প্রচার অধিকর্তা হিসেবে যোগ দাও। অতএব আবার বন্যা দর্শন।

উত্তরবঙ্গের বন্যা অধ্যুষিত এলাকায় গিয়ে মেঘনাদের মাথায় এবার নতুন চিন্তা ভেসে উঠল। ইতিমধ্যে তিনি ঘুরে এসেছেন বার্লিন, ভিয়েনা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সেসব দেশে কী ভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা হয় দেখে এসেছেন তিনি। উত্তরবঙ্গ থেকে ফিরে এসে জানালেন, এদেশেও তো আমরা বন্যা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। তার জন্যে দরকার একটি হাইড্রলিক রিসার্চ ল্যাবোরেটারি। এই গবেণাগার বাংলাদেশেই (অবিভক্ত বঙ্গ) বসবে।

গবেষণাগারের কাজ হবে বন্যার জলের গতিপ্রকৃতির উপর অনুসন্ধান করা। কী ভাবে নদীর গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করা যায় তা নিয়ে গবেষণা করবেন সেখানকার বিজ্ঞানীরা। তিনি বললেন, ভিয়েনা, বার্লিন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা হয়েছে। শুধু বন্যা নিয়ন্ত্রণই নয়, নদীনালা এবং বন্যার জলকে সুপরিকল্পিত ভাবে কাজে লাগিয়ে তারা সেচের ব্যবস্থা করেছে, নৌ-পথের সমৃদ্ধি ঘটিয়েছে, সেই সঙ্গে উৎপাদন করছে জল-বিদ্যুৎ।

১৯৪৩ সালে দামোদরের বন্যার পর এসব নিয়ে নতুনভাবে মাথা ঘামাতে শুরু করেন মেঘনাদ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি নদী প্রকল্প দেখে এসেছেন তিনি। দামোদরের মত টেনেসি নদীর বন্যাও এক সময় হাজার হাজার মানুষের জীবন গ্রাস করেছে। কিন্তু সেই নদীর মাঝে বাঁধ দিয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। টেনেসি উপত্যকা এখন সেচের জলে শস্যশ্যামল। যদি তাই হয়, টেনেসির মত দামোদরকেও তো বাগে আনা যেতে পারে? টেনেসির অনুকরণে দামোদর প্রকল্প রচনা করলেন মেঘনাদ। তাঁর প্রকল্পই পরে অংশতঃ কাজে লাগান হয়।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে গেলে কলকারখানার সম্প্রসারণ চাই। আর তার জন্যে বাড়াতে হবে বিদ্যুৎ উপাদন। কী ভাবে দেশে বিদ্যুৎ শক্তির উৎপাদন বাড়ান যায় সে নিয়ে পর্যালোচনা করার জন্যে ১৯৩৮ সালে এলাহাবাদে জাতীয় বিজ্ঞান আকাদেমির উদ্যোগে একটি সভা আহ্বান করলেন মেঘনাদ। এই সভায় পৌরোহিত্য করেন ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। ওই একই বছর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। সুভাষচন্দ্রকে মেঘনাদ জানালেন জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা দরকার। বললেন, এর জন্যে দরকার একটি জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি। এই কমিটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্যে যা যা করা দরকার তার খসড়া তৈরি করবে। মেঘনাদের কথায় সম্মত হলেন সুভাষচন্দ্র। তৈরি হল জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি। মেঘনাদের প্রস্তাব অনুসারে এই কমিটির সভাপতিরূপে নির্বাচিত হলেন জওহরলাল নেহরু।

১৯৫২ সালে মেঘনাদ সাহা লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হলেন। প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে নিজেকে জড়িয়ে ফেলার দরুন ওই সময় অনেকেই খুশী হতে পারেন নি।

কেউ কেউ প্রশ্ন করেছিলেন তাঁকে, বিজ্ঞান ছেড়ে রাজনীতি করতে এলেন কেন?

সমালোচকদের উদ্দেশ্যে তখন তিনি বলেছিলেন :

'Scientists are often accused of living in the Ivory Tower and not troubling their mind with realities and apart from my association with political movements in my juvenile years, I lived in the Ivory Tower upto 1930. But Science & Techniques are as important for administration now-a-days as law and order.'

মেঘনাদ বিশ্বাস করতেন, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণার গুরু দায়িত্ব নিশ্চয় বিজ্ঞানীরা নেবেন। কিন্তু সেই গবেষণার সার্থক রূপায়নের দায়িত্বও তাঁরা এড়িয়ে যেতে পারেন না। অতএব গবেষণা ছাড়াও কল্যাণমূলক কাজকর্মেও তাঁদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা থাকা উচিত। সংগঠনমূলক কাজেও তাঁদের অংশ গ্রহণের প্রয়োজন আছে।

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই সংগঠনমূলক কাজে মেঘনাদ নিজেকেও সংযুক্ত রেখেছিলেন। তার প্রমাণ ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত কলকাতার ইনডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অভ্ সায়ান্স। তাঁরই চেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠানটি দেশের বিশিষ্টতম গবেষণাগারগুলির মধ্যে অন্যতমের মর্যাদা পেতে সমর্থ হয়েছে। ১৯৫২ সালের ১ জানুয়ারী তিনি এই প্রতিষ্ঠানের ডিরেকটরের পদে বৃত হন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই পদেই তিনি আসীন ছিলেন।

মৃত্যু, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৬।

মেঘনাদ জীবনে সম্মান পেয়েছেন প্রচুর। ১৯৩৪ : ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি; ১৯৪৯ : বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য। এ ছাড়া আমেরিকান অ্যাকাডেমি অভ্ আরটস অ্যাণ্ড সায়ান্স এবং আমেরিকা ও ফ্রান্সের অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির সদস্য। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে আছে : A Treatise on the Theory of Relativity, On a Physical Theory of the Solar Corona, A Treatise of Heat, A Treatise of Modern Physics, My Experience in Russia.

মেঘনাদ সাহা বহুবার সোভিয়েত দেশে সফর করেছেন। ওই সফর তাঁর অবদানের ব্যাপারে সোভিয়েত বিজ্ঞানী মহলে যথেষ্ট আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল। সেই অবদান সম্প্রতি তাঁর অন্যতম উত্তরসূরী এবং প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডোয়ার্ড কনোনোভিচের গবেষণায় প্রতিভাত হতে দেখা গেছে।

সম্প্রতি সোভিয়েত লেখক আলেকজাণ্ডার খারকফ্স্কির লেখা একটি প্রবন্ধ পড়লাম। সোভিয়েত বিজ্ঞানীমহলে মেঘনাদ সাহার আসন কতটা উঁচুতে ছিল, এবং তাঁদের কাছে এই ভারতীয় বিজ্ঞানী আজও যে কতটা শ্রদ্ধাভাজন, এই প্রবন্ধে লেখক তার কিছুটা পরিচয় দিয়েছেন। সেই সঙ্গে কিছু কিছু ঘটনারও উল্লেখ করেছেন তিনি।

খারকফস্কি লিখছেন : সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদেমির ক্রিমিয়ার মানমন্দির থেকে আকাডেমিসিয়ান আঁদ্রেই সেভেরনি একবার খবর পাঠালেন, সূর্যের পরিমণ্ডলে পর্যবেক্ষণ চালাতে গিয়ে তিনি নাকি অদ্ভুত একটি তথ্য আবিষ্কার করেছেন। এই তথ্যে বলা হলো, আমাদের নিকটতম এই নক্ষত্রটি প্রতি ১৬০ মিনিট অন্তর একবার প্রসারিত হয়, আবার সঙ্কুচিত হয়।

খবরটা পেয়ে বেশ চমকেই উঠেছিলেন তাত্ত্বিক বিজ্ঞানীরা। অদ্ভুত ব্যাপার! তাঁরা ভাবলেন, অপেক্ষাকৃত শীতল বস্তুর ক্ষেত্রেই তো এ ধরনের ঘটনা ঘটা সম্ভব। কিন্তু সূর্যকে তো ঠিক সেই পর্যায়ে ফেলা যায় না। সেভেরনি যা বলছেন, যদি তা সত্যি হয়, তা হলে বলতে হচ্ছে সূর্যের অভ্যন্তরে কোন তাপ-পারমাণবিক ঘটনার অস্তিত্ব নেই।

অনেকের মনেই ব্যাপারটা রীতিমত বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল। বিশ্বখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী আকাডেমিসিয়ান ভিকতর অ্যামবার্ত-সুমিয়ান তো মন্তব্যই করে বসলেন, 'অতএব এখন আমরা বলতে পারি সূর্য কেন আলো বিকীর্ণ করে, তার কারণ আমাদের জানা নেই'।

অধ্যাপক সাহার কয়েকজন ছাত্র বিষয়টি নিয়ে সোভিয়েত দেশে গবেষণা শুরু করলেন। মেঘনাদ সাহার তত্ত্বের সাহায্য নিয়ে মস্কোর জ্যোতি-পদার্থবিজ্ঞানী এডোয়ার্ড কনোনোভিচ্ প্রমাণ করলেন, সেভেরনি যা বলতে চেয়েছেন, সেটা ঠিক নয়। আসলে সূর্য নিজে সম্প্রসারিত হয় না। সম্প্রসারিত হচ্ছে বলে যা মনে হচ্ছে, সেটা আসলে সূর্যের বায়ুমণ্ডলের সম্প্রসারণ। এবং এতে করে এই সিদ্ধান্তই করা যায়, সূর্যের গভীরতম অঞ্চলেও নিয়মিত তাপ-পারমাণবিক প্রক্রিয়া

ঘটে চলেছে। এই ঘটনার পর সেভিয়েত দেশের তাবং সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় মেঘনাদ সাহা স্থান করে নিলেন।

খারকফস্কি লিখছেন : অক্টোবর বিপ্লবের পর সোভিয়েত দেশ সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন তরুণ বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা। ওই সময় তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল সোভিয়েত দেশের প্রথম সারির বিজ্ঞানী এ আইওফ্‌ফের। পরবর্তীকালে তাঁর সঙ্গে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান করতেন মেঘনাদ।

আইওফ্‌ফে তাঁর লেখা 'আমার দেখা পদার্থবিজ্ঞানী' নামক একটি গ্রন্থে লিখেছেন : সাহার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় বার্লিনে। ১৯২২ সালে। সাহা তখন বয়েসে খুবই তরুণ। প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন পদার্থবিজ্ঞানী। ভারতে তখন ব্রিটিশ শাসনের নামে নিপীড়ন চলছে। সাহা আমাকে তাঁর দেশের কথা বলতেন।'

ভারত স্বাধীনতা পাওয়ার পর মস্কোয় গিয়েছিলেন মেঘনাদ সাহা। আইওফ্‌ফের তখন পরিণত বয়েস। মেঘনাদ তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। বৃদ্ধ আইওফ্‌ফে ওই সময় তাঁর কাছে হিরোসিমা এবং নাগাসাকির পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সোভিয়েত দেশের বিশিষ্ট পরমাণুবিজ্ঞানী অধ্যাপক আই. কুরচাটভ্‌। আইওফ্‌ফের কথা শুনে কুরচাটভ্‌ মন্তব্য করেন : মানব কল্যাণে পারমাণবিক শক্তিকে কাজে লাগাতে হবে।

মেঘনাদ সাহা তাঁর কথা শুনে মন্তব্য করেন : স্বাধীন ভারতে পারমাণবিক শক্তি একটা বড় রকমের উপকারে লাগতে পারে। আর সে উপকার বলতে আমি বোঝাচ্ছি, পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে দেশের বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং শিল্পের উন্নতি।

ছাত্রদের ভালবাসতেন। কিন্তু সেই ভালবাসায় কোন প্রশ্রয় ছিল না।

জনৈক ছাত্র কথাপ্রসঙ্গে একদিন আমার কাছে মন্তব্য করলেন, স্যার ছিলেন অত্যন্ত রাশভারী মানুষ। নিয়মানুবর্তিতার এতটুকু অভাব হলে তিনি কাউকে ক্ষমা করতেন না। নিজেও যেমন ছিলেন অত্যন্ত পরিশ্রমী, তিনি চাইতেন তাঁর ছাত্ররাও পরিশ্রম করুক। তাঁর অধীনে তখন আমি গবেষণা করছি। সকাল ন'টার মধ্যেই বিজ্ঞান কলেজে হাজিরা দিতে হত। সেই ভোরেই শুরু

করতে হত কাজ। তারপরই কোন এক সময় স্যার এসে পেছনে দাঁড়াতেন। লক্ষ করতেন কী করছি। সেদিন কী করবো, সেটাও জেনে নিতেন। সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার সময় কতটা কাজ করতে পেরেছি জিজ্ঞেস করতেন। কম্‌তি হলে রক্ষা ছিল না। আমরা ভয়ে কাঁপতাম। আবার এটাও দেখেছি, গবেষণার পর যখন ডকটরেট হলাম, একদিন স্যার ডেকে পাঠালেন। হাতে একটি ঠিকানা। ঠিকানাটি দিয়ে বললেন, এখানে দরখাস্ত কর। শুধু গবেষণায় সাহায্যই নয়। জীবনে আমরা যাতে দাঁড়াতে পারি সেদিকেও তাঁর দৃষ্টি ছিল সজাগ। এখন এ ধরনের ঘটনা বিরল।

অধ্যাপক সাহার বিশিষ্ট ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই অধ্যাপকের মানসিকতার শরিক হয়েছেন। এই ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন ডঃ বি. ডি. নাগচৌধুরী, ডঃ ডি. এস. কোঠারী, ডঃ আউলাক, ডঃ আত্মারাম, ডঃ আর. সি. মজুমদার, ডঃ তোসনিওয়াল প্রমুখ।

স্বদেশপ্রীতি ছিল অধ্যাপক সাহার মূলমন্ত্র। যখনই যেখানে গেছেন গবেষণার স্কুল তৈরি করে তরুণ বিজ্ঞানীদের উদ্‌বুদ্ধ করেছেন তিনি। এলাহাবাদ, কলকাতা —সর্বত্র। তিনি চাইতেন, ভারতীয় ছাত্ররা ভারতভূমিতে বসেই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর আসন লাভ করুক। দেশে সেই পরিবেশ যাতে গড়ে ওঠে সব সময় সেদিকে তাঁর লক্ষ ছিল। বৈষয়িক উন্নতির জন্যে কারিগরি গবেষণাগারগুলির পরিকল্পনাও তিনি করেছেন। বিজ্ঞান দেশবাসীর জীবনে আশীর্বাদরূপে বিরাজ করুক, এটাই ছিল তাঁর কামনা। তাঁর রাজনীতি করার পেছনে এই মানসিকতাই সক্রিয় ছিল।

ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মধ্যে মেঘনাদ সাহা এক বিরল ব্যক্তিত্ব। বিজ্ঞান সাধনা এবং মানব-কল্যাণে আত্মনিয়োগ একই মানুষের মধ্যে এমন দ্বৈত ভূমিকা খুব কমই দেখা যায়।



সত্যেন্দ্রনাথ বসু

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

'বোস স্ট্যাটিসটিকস'-এর জনক সত্যেন বসু। আইনস্টাইন এবং সত্যেন বসু তাত্ত্বিক-পদার্থবিত্মায় যেন যুগ্মযৌগ। আমার কাছে মনে হয়েছে, তথাকথিত লোকায়ত নিয়ম নিষ্ঠার তিনি উর্ধ্বে। এটা যেমন তাঁর ব্যক্তিজীবনে প্রস্ফুটিত, বিজ্ঞানের গভীরতম তত্ত্বের অন্তর্দেশেও তা সমানভাবে সক্রিয়। বাইরে থেকে মনে হয় বুঝি সবকিছুই তাঁর 'ক্যাজুয়াল'। যেন ভেসে বেড়ান মেঘ। কিন্তু সে মেঘের ওপারে যাঁর চেয়ে দেখার ক্ষমতা আছে, তাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়বে পরিব্যাপ্ত অন্তহীন মহাকাশ—আসল সত্যেন বসু। একান্ত সাক্ষাৎকার? উত্তর জীবনে যিনি 'ইউনিফায়েড ফিল্ড থিওরি' বা একীকৃত ক্ষেত্র-তত্ত্ব নিয়ে পৃথিবীর প্রথম সারির বিজ্ঞানীদের সঙ্গে মাথা ঘামিয়েছেন তাঁর কাছে 'একান্ত' —এ কথাটির সত্যিই কি বিশেষ কোন মূল্য আছে? সে কথায় পরে আসছি।

সত্যেন্দ্রনাথ বসুই একমাত্র পদার্থবিজ্ঞানী, আইনস্টাইনের সঙ্গে যাঁর নাম সমসূত্রে গ্রথিত। পৃথিবীর যে কোন দেশের উচ্চতর পদার্থবিত্মার পাঠ্যপুস্তকে বসু-আইনস্টাইন—এই কথাটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ওঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন আইনস্টাইন। প্রথম মুহূর্তেই তিনি ওঁকে স্বীকৃতি দেন। সেই সঙ্গে বিশ্বের বিদগ্ধ বিজ্ঞানীমহলে পরিচিত হওয়ার সুযোগ। তবু বলা চলে, ওঁর সার্থক অবদান পদার্থবিজ্ঞানে যে কত বেশি সুদূরপ্রসারী হতে পারে সে ধারণা সম্ভবত আইনস্টাইন নিজেও করে উঠতে পারেননি। উত্তরকালে সত্যেন্দ্রনাথের নিজস্ব সংযোজন এবং ইতালির বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী এনরিকো ফার্মির প্রচেষ্টা নিউক্লিয়ার ফিজিকস বা পরমাণুকেন্দ্রিক পদার্থবিত্মায় মৌল-কণিকাদের সুনির্দিষ্টভাবে শ্রেণী বিভাগ করার ব্যাপারে সাহায্য করেছে। দুটি শ্রেণী। একটির নাম দেওয়া হয় সত্যেন্দ্রনাথেরই সম্মানে 'বোসনস'। অপরটি ফার্মির সম্মানে 'ফার্মিওনস।'

গোড়ার দিকে কাজ করছিলেন ম্যাকসওয়েল এবং বোলটজমান। সংখ্যায়নের

ভিত্তিতে ওঁরা দুজনেই গ্যাসের অণুর গতিপ্রকৃতি জানার ব্যাপারে কাজ করছিলেন। কিন্তু সে প্রচেষ্টা মুখ্যত মৌলিক পদার্থের অণুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরে আরও সূক্ষ্মতম কণা ইলেকট্রোন, ফোটন প্রভৃতির ক্ষেত্রেও ওঁদের পদ্ধতি কাজে লাগানো যায় কী না, সে নিয়ে চেষ্টা করা হয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, 'ফোটন' নিয়ে ইতিমধ্যেই তাত্ত্বিক বিজ্ঞানীরা নানাভাবে পর্যালোচনা করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। বিজ্ঞানীদের কল্পনার আলোক-রশ্মির স্বরূপ এতদিন তরঙ্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ওঁরা সেই তরঙ্গেরই ক্ষুদ্রতম একটি অংশকে ধরে নিলেন, 'অখণ্ড কণিকা'র মত করে। ধরে নিলেন, সেই অখণ্ড কণা যেন শক্তির এক একটি 'প্যাকেট'। অর্থাৎ প্রতিটি কণার মধ্যে থাকবে নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি এবং এই পরিমাণটি কত হবে সেটা নির্ভর করবে আলোর কম্পনাঙ্কের উপর। এই কণার নাম দেওয়া হল 'ফোটন'। যার কোন ভর নেই। কিন্তু দেখা গেল ম্যাকসওয়েল-বোলটজমান-এর তত্ত্ব সাধারণ গ্যাসীয় অণুর গতিপ্রকৃতির কার্যকারণ সম্পর্কে যথাযথ ব্যাখ্যা জোগাতে সমর্থ হলেও, ফোটন প্রভৃতির ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কেমন যেন গোলমেলেই থেকে গেল।

গোলমাল যে কোথায়, সেটা ধরা পড়ল ভারতীয় বিজ্ঞানী তরুণ সত্যেন্দ্র-নাথের চোখে। সত্যেন্দ্রনাথ তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান শাখার রীডার। ইতিমধ্যে মেঘনাদ সাহা এবং তিনি দুজন মিলে মূল জার্মান ভাষায় রচিত আইনস্টাইন এবং মিনকওস্কির আপেক্ষিকবাদের ওপর কয়েকটি মৌলিক নিবন্ধ, ইংরেজিতে অনুবাদ করে ফেলেছেন। সেগুলি ১৯২০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বই হিসেবে প্রকাশ করে। যার ভূমিকা লিখেছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের তৎকালীন অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ।

১৯০০ সালে প্রখ্যাত জার্মান পদার্থবিদ প্লাঙ্ক 'ব্ল্যাকবডি রেডিয়েশন' বা কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণের উপর একটি অভিনব সূত্র তৈরি করেন, যার নাম 'প্লাঙ্কের সূত্র'। এতে বলা হল, আলোক বিকিরণের সময় শক্তির পরিবর্তন কখনও নিরবচ্ছিন্নভাবে হয় না, হয় 'কোয়াণ্টা' বা শক্তিগুচ্ছের মাধ্যমে। প্লাঙ্কের এই কল্পনাকেই বলা হয় কোয়াণ্টাম শক্তিকণাবাদ। এখানে কণা বলতে ফোটনকে বোঝান হয়েছে। এর আগে নিউটনও ধরে নিয়েছিলেন, শক্তির পরিবর্তন নিরবচ্ছিন্নভাবেই ঘটে থাকে। প্লাঙ্কের ওই ধারণা যেন রীতিমত এক বিপ্লব।

কিন্তু মুশকিল হল, প্লাঙ্ক যেভাবে তাঁর সূত্রটি প্রমাণ করেন, তাতে বিজ্ঞানীরা সন্তুষ্ট হতে পারলেন না।

ব্যাপারটা ধরা পড়ল সত্যেন্দ্রনাথের চোখেও। প্লাঙ্ক তাঁর সূত্রে ফোটনকে অখণ্ড শক্তিকণা হিসেবে কল্পনা করেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ সেটিকে গ্রহণ করলেন সাধারণ বস্তুকণার মত। অতঃপর শুরু হল প্লাঙ্ক সূত্রের উপর নতুন ভাবনা, একেবারে অভিনব এক গণনাপদ্ধতিতে। এবং এরই সাহায্যে ম্যাকসওয়েল-বোলটজমানের সূত্রটিরও কিছু কিছু সংশোধন করা গেল, এবং সেই সঙ্গে দূর করা গেল প্লাঙ্ক সূত্রের অস্পষ্টতা।

সেটা ১৯২৪। প্রায় ছয় পৃষ্ঠার একটি নিবন্ধের আকারে গবেষণাপত্রটি তিনি পাঠিয়ে দিলেন লণ্ডনের বিশিষ্ট বিজ্ঞান পত্রিকা 'ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিন'-এর সম্পাদকের নামে। তার অনুলিপি গেল আইনস্টাইনের ঠিকানায়। উদ্দেশ্য, আইনস্টাইন কী বলেন, জানা।

পদার্থবিজ্ঞানীমাত্রই জানেন, নিউটনের গতিতত্ত্ব পদার্থবিজ্ঞানে এক অসামান্য সংযোজন। তিনি ধরে নিয়েছিলেন, এই বিশ্বের সমস্ত কিছুই ছোট বড় বস্তু কণা দিয়ে তৈরি। ওইসব কণাদের একে অন্যকে আকর্ষণ করছে। কেউবা তার চলার পথে যাকে সামনে পায় তাকে ধাক্কা মেরে চলে যায়, অথবা নিজেই প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে। কিংবা পাশ ফিরে ভিন্ন পথে এগিয়ে যায়। তারা কে, কখন এবং কোথায় কীভাবে বিচরণ করবে অথবা কোথায় অবস্থান করবে, বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে তাদের প্রত্যেকের শক্তির পরিমাণই বা কতটা হওয়া উচিত, নিউটনের গতিতত্ত্ব অনুসারে সে সবের ব্যাখ্যা জোগান সহজতর হয়েছিল।

ফ্যাসাদ বাধল বিকিরণ শক্তিকে নিয়ে। বিভিন্ন স্থূল বস্তুর মত নিউটন ধরে নিলেন, আলোও একধরনের বস্তু কণা। পার্থক্য এই, সাধারণ বস্তুর ভর আছে। আলোক কণার ভর নেই। ভরহীন এই কণা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার উৎস থেকে অসীম গতি নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণ বস্তু কণা যেমন আর একটি বস্তুর গায়ে গিয়ে আঘাত করে প্রতিহত হতে পারে, আলোক কণার বেলাতেও তেমনটি ঘটা সম্ভব। এমন অনেক কথাই বললেন নিউটন।

কিন্তু তত্ত্ব এক এবং ঘটনাপ্রবাহ আর এক ব্যাপার। আলোকে কণিকা

হিসেবে ধরে নিয়ে নিউটন প্রতিফলন, প্রতিসরণ প্রভৃতির সূত্র প্রমাণ করলেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে আরও অনেক ঘটনারই ব্যাখ্যা যোগান সম্ভব হল না। বলা বাহুল্য, উত্তরকালে 'আলো'কে কণা হিসেবে না ধরে ধরা হল তরঙ্গরূপে। বলা হল, আলোকরশ্মি ঠিক বুলেটের মত গতি নিয়ে চলে না। চলে কেঁপে কেঁপে, ঢেউ খেলিয়ে। যেন সমুদ্রের তরঙ্গ। এ ধরনের কল্পনার ফলে আলোক সম্পর্কিত আরও অনেক ঘটনার ব্যাখ্যা জোগান সহজতর হল।

তবু সমস্যা দেখা দিল আবার। অনেকেই জানেন সূর্যের উজ্জ্বল আলোক যখন একটি প্রিজম-এর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত করা হয়, উজ্জ্বল সেই আলোর গুচ্ছ ভেঙ্গে গিয়ে সৃষ্টি করে বিভিন্ন রঙের বর্ণালী। দেখা গেল, ওই বর্ণালীর এক এক রঙের আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যেমন এক এক রকম, তেমনি প্রতিটি রঙিন আলোর শক্তির মাত্রাও স্বতন্ত্র। উৎসের তাপমাত্রার উপর আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য নির্ভর করে। এবং দেখা গেল তাপমাত্রা যত বেশি হয় তরঙ্গের দৈর্ঘ্যও সেই অনুপাতে কমে আসে।

তা না হয় হল। কিন্তু তাত্ত্বিক বিজ্ঞানীমাত্রই চান, যা কিছু ভৌতিক ঘটনা, সেটা যেন সংক্ষিপ্ত একটি সূত্রের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করা যায়। তৈরি হল ভিনের (Wien) সূত্র। এবং অতঃপর র‍্যালির সূত্রও। দেখা গেল ভিনের সূত্র একমাত্র ক্ষুদ্র-তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিকিরণের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এবং র‍্যালির সূত্র প্রযোজ্য একমাত্র দীর্ঘ-তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে উভয়ের মধ্যে সমন্বয় ঘটালেন বিশিষ্ট জার্মান বিজ্ঞানী ম্যাকস প্লাঙ্ক। সম্পূর্ণ অভিনব একটি সূত্রের প্রবর্তন ঘটিয়ে শক্তি এবং বিকিরণ তরঙ্গের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রকাশে তিনি প্রয়াসী হলেন। এবং এর জন্যে শক্তির একটি নতুন এককও প্রবর্তন করলেন তিনি। যার নাম রাখা হল 'কোয়াণ্টাম'। আর ওই সূত্রই 'কোয়াণ্টাম' বা অখণ্ড তত্ত্বের গৌরচন্দ্রিকা।

সুদূর জার্মানিতে বসে প্লাঙ্ক যে সূত্রটি আবিষ্কার করলেন, ঢাকায় বসেই তরুণ সত্যেন্দ্রনাথ তার মর্মার্থটি উপলব্ধি করার চেষ্টা করলেন। তিনি দেখালেন, প্লাঙ্ক তাঁর সূত্রটি তৈরির সময় ধরে নিয়েছেন, যে কোন তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গের শক্তির একক 'লাইট কোয়েণ্টা' বা ফোটন। সত্যেন্দ্রনাথের চিন্তাধারার সঙ্গে প্লাঙ্কের মতবাদের মৌলিক পার্থক্য ঘটল এখানেই। তিনি দেখালেন, 'ফোটন'-এর ধারণাটি গ্রহণ না করেও প্লাঙ্কের সূত্র প্রমাণ করা যায়। বরং নিউটনের সেই

'কণিকা তত্ত্ব' বা 'করপাসক্যুলার থিওরি' দিয়েই তো কাজ সারা যেতে পারে।

হ্যাঁ। করলেনও তাই। তরুণ অধ্যাপক তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে প্লাঙ্ক যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, সেই সিদ্ধান্তে নিজেও উপনীত হলেন। এবং তার কয়েকদিনের মধ্যে রচনা করলেন তাঁর সেই ঐতিহাসিক প্রবন্ধ।

প্রবন্ধটির মূল কপিটি প্রকাশের জন্য পাঠান হল লণ্ডনের 'ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিন'-এ। উল্লেখ করা যেতে পারে, বিশিষ্ট এই গবেষণা-বিষয়ক পত্রিকায় এর আগেই ১৯১৮ সালে মেঘনাদ সাহার সঙ্গে যুক্তভাবে লেখা তাঁর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। নাম 'সাহা-বোস ইক্যুয়েশন অভ স্টেট'। পরে ১৯২০ সালে ওই পত্রিকায় তাঁর আরও একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। নাম 'অন দ্য হরপোলহোড।' কিন্তু তৃতীয় এই প্রবন্ধটি সম্পর্কে 'ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিন' নীরব রইল।

কিন্তু অদ্ভুত যোগাযোগ। ওই একই সময়ে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর নতুন এই প্রবন্ধের আর একটি কপি সন্তর্পণে পাঠিয়ে দিলেন বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের নামে। সেটা ১৯২৪। প্রবন্ধের সঙ্গে একটি চিঠিতে তিনি আইনস্টাইনকে লিখলেন :

Respected Sir, I have ventured to send you the accompanying article for your perusal and opinion. I am anxious to know what you think of it. You will see that I have tried to deduce the co-efficient in Planck's law independent of classical electrodynamics, only assuming that···I do not know sufficient German to translate the paper. If you think the paper worth publication I shall be grateful if you arrange for its publication in Zeitchrift fur Physik. Though a complete stranger to you, I do not feel any hesitation in making such a request. Because we are all your pupils though profiting only by your teaching through your writings···

সত্যেন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি পড়ে আইনস্টাইন মুগ্ধ হলেন। না। প্লাঙ্কের সত্যতা প্রমাণ করেছিলেন বলে নয়। যে অভূতপূর্ব পদ্ধতিতে সত্যেন্দ্রনাথ সেই

সত্যে উপনীত হয়েছিলেন, সেই পদ্ধতিটি তাঁকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল। প্রবন্ধটি তিনি নিজে অনুবাদ করে Zeitchrift fur Physik পত্রিকায় প্রকাশ করেন এবং তার নিচে নিজস্ব মন্তব্য জুড়ে দেন: 'প্লাঙ্কের সূত্রের উপর বোস-এর কাজ এক অভিনব সংযোজন। তাঁর পদ্ধতি আদর্শ-গ্যাসের কোয়াণ্টাম তত্ত্ব জোগাতে সাহায্য করেছে। এ ব্যাপারটি নিয়ে আমি অন্যত্র আলোচনা করব।' পরে এই পদ্ধতি তিনি সাফল্যের সঙ্গে এক-পরমাণু বিশিষ্ট গ্যাসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এর জন্যেই সত্যেন্দ্রনাথের পদ্ধতিটি 'বোস-আইনস্টাইন স্ট্যাটিসটিকস' বা বসু-আইনস্টাইন সংখ্যায়নরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এখন অবশ্য এর নাম রাখা হয়েছে শুধু 'বসু-সংখ্যায়ন'।

এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী মহলে সত্যেন্দ্রনাথের আসন প্রথম সারিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। উত্তরকালে অনুরূপ চিন্তাধারা নিয়ে কাজ করেছেন পাউলি, এনরিকো ফার্মি প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা। ফোটন, মেসন, গ্র্যাভিটন প্রভৃতি কণা, যারা বোস-স্ট্যাটিসটিকস মেনে চলে, তাদের বলা হল 'বোসনস'। আর ইলেকট্রন, মিউওন, মেসনস, নিউক্লিয়নস এবং বেরিওনস কণা, যারা ফার্মির সংখ্যায়ন মেনে চলে তাদের বলা হয় ফার্মি কণা। পদার্থের মৌল কণার বিভিন্ন রহস্য উদ্‌ঘাটনে এসব তত্ত্বের ভূমিকা এখন অপ্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে পরিগণিত।

উত্তরকালে সত্যেন্দ্রনাথ নিজের গবেষণার সীমাকে বিভিন্ন দিকে সম্প্রসারিত করেন। ১৯৩৬ সালে তিনি কাজ করেন মহলানবীশের ডি-স্কোয়ার সংখ্যায়নের উপর। ১৯৩৯ সালে লোরেঞ্জ গ্রুপ, ১৯৪৫-এ হাইড্রোজেন পরমাণু বিষয়ক সমস্যাবলী। ১৯৪৬ পর্যন্ত তাঁর উল্লেখযোগ্য গবেষণার বিষয়বস্তুর মধ্যে ছিল ডাই-ইলেকট্রিক কনস্টানট অভ্ আরটিফিসিয়াল আইওনোস্ফিয়ার, ক্লিন-গরডন ইক্যুয়েশন এবং তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রে ডিরাকের সমীকরণ।

দেশবিভাগের পর সত্যেন্দ্রনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে খয়রা অধ্যাপক পদে বৃত হন। এরই ফাঁকে তিনি ছাত্রদের নিয়ে ক্রিসট্যালোগ্রাফির উপর গবেষণা চালিয়েছেন, গবেষণা চালিয়েছেন এক্স-রে বর্ণালীর উপর। উল্লেখ্য, এই সময়ে তাঁর তত্ত্বাবধানে যে কয়টি উচ্চমানের এক্স-রে ক্যামেরা কলকাতায় তৈরি হয়েছিল তাদের সাহায্যেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম কেলাস-গঠনের উপর অনুসন্ধানের কাজ শুরু হয়েছিল। এবং অবসর মুহূর্তে কাজ চালিয়েছেন

'একীকৃত-ক্ষেত্রতত্ত্ব' বা ইউনিফায়েড ফিল্ড থিওরি নিয়ে।

উদাহরণ আরও আছে। যাঁরা অভিযোগ করেন, 'সত্যেন বোস, ওই তো কবে আইনস্টাইনের সঙ্গে কী যেন করেছিল না? তারপর তো শুয়ে বসেই উনি কাটালেন।' বলা বাহুল্য, এ মন্তব্য অজ্ঞতার। হয়ত বা এটা আমাদের জাতীয় চরিত্র। রামন নোবল পুরস্কার পেয়েছিলেন, তাই আমরা তাঁর নাম মনে করে রেখেছি, রামানুজনমকে নিয়ে রূপকথা তৈরি করেছি, অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা—এখন শুধু নাম। কিন্তু কেন তাঁরা খ্যাতির শীর্ষাসনে আরোহণ করেছিলেন, ক'জন তার আমরা খবর রাখি? ক'জন আমরা জানি, পৃথিবীর বিজ্ঞানে এঁরা সবাই শিরোনাম? এই অজ্ঞতাই হয়ত আমাদের আত্মবিশ্বাস জন্মাতে প্রচণ্ড প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছে সর্বক্ষণ। যার প্রত্যক্ষ ফল, জাতীয় জীবনে সার্বিক এক নিরুৎসাহবোধ।

ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিন থেকে কোন উৎসাহ এল না। কিন্তু অপ্রত্যাশিত সংবাদ পাঠালেন আইনস্টাইন। অপরিচিত সত্যেন্দ্রনাথের গবেষণাপত্র তাঁকে গভীরভাবে আকর্ষণ করে। এবং আগেই বলেছি, নিজে থেকেই অযাচিতভাবে তিনি সেটি জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে প্রখ্যাত বিজ্ঞান পত্রিকা 'ৎসাইটশ্রিফট ফ্যুর ফিজিকস' (Zeitschrift fur Physik)-এ সেটি প্রকাশ করলেন। প্রবন্ধটির নাম দিলেন Plancks Gesetz und Lichtquanten hypothese বা প্লাঙ্কের সূত্র ও আলোক কোয়াণ্টাম প্রকল্প।

জন্ম জানুয়ারী ১, ১৮৯৪। আর এ ঘটনা ঘটল ১৯২৫-২৬ নাগাদ। অর্থাৎ সত্যেন্দ্রনাথ তখন মাত্র তিরিশ একত্রিশের তরুণ। তাঁর আত্মবিশ্বাস ছিল প্রচণ্ড, কিন্তু আত্মসন্তুষ্টির অভাব ঠিক ততখানিই প্রবল। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমরা এটা লক্ষ করেছি।

১৯১১। প্রেসিডেন্সি কলেজে সত্যেন্দ্রনাথ তখন দ্বিতীয় বার্ষিক কলা বিভাগের ছাত্র। সেবার চূড়ান্ত পরীক্ষায় ইংরেজি সাহিত্যের পরীক্ষকের দায়িত্ব নিলেন স্বনামধন্য অধ্যাপক এইচ এম পার্সিভাল। সত্যেন্দ্রনাথ কলা বিভাগের পরীক্ষায় প্রথম হলেন। ইংরেজিতে ওঁকে সর্বোচ্চ নম্বর দেওয়া হল ষাট। পার্সিভাল ঐ ষাটের পাশে অতিরিক্ত আরও দশ নম্বর যোগ করে দিয়ে সানন্দে মন্তব্য করেছিলেন, 'এ ছাত্রটি অসাধারণ। এর নিজস্বতা আছে।'

গৌরচন্দ্রিকা।

সেটা যে শুধু সাহিত্যে নয়, ভাষাতেও এবং বিশেষ করে বিজ্ঞানে তার পরিচয় পাওয়া গেল ১৯২৬ সালে আইনস্টাইনের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সাক্ষাতের পর। ভারতের এই তরুণ বিজ্ঞানী সম্পর্কে আইনস্টাইন মন্তব্য করেন, 'We have been benefited by his presence.'

কলকাতার গোয়াবাগানের ২২ ঈশ্বর মিল লেনের বাড়িতে তাঁর জন্ম। বাবা সুরেন্দ্রনাথ বসু রেল দপ্তরে হিসাবরক্ষকের কাজ করতেন। মা আমোদিনী দেবীর উপর দায়িত্ব ছিল বড় সংসারের সমস্ত কিছু দেখাশুনার। শিক্ষা কলকাতার হিন্দু স্কুলে। এনট্রান্স পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান অধিকার। প্রেসিডেন্সি কলেজে মাধ্যমিক শ্রেণীতে পড়ার সময় সতীর্থ হিসেবে পেলেন জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নিখিলরঞ্জন সেন, পুলিনবিহারী সরকার, মানিকলাল দে প্রভৃতিকে। স্নাতক শ্রেণীতে যোগ দেবার পর এলেন মেঘনাদ সাহা। ওঁদের কৃতী শিক্ষকদের মধ্যে তখন পার্সিভাল, মনোমোহন ঘোষ, আচার্য জগদীশচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্ল রায়। মেঘনাদ এবং সত্যেন্দ্র দু'জনেরই ছিল মিশ্র গণিতে অনার্স। মাধ্যমিক, বি এ এবং এম এ পরীক্ষায় সত্যেন্দ্রের স্থান সব সময় প্রথমে ছিল। গণিতে অভূতপূর্ব পারদর্শিতায় পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল তাঁর স্কুল-জীবন থেকেই।

কৌতূহল ওঁর ছিল মজ্জাগত চরিত্র, শুধু লেখাপড়ায় নয়, সব ক্ষেত্রেই। একটা উদাহরণ দিই। তখন তিনি এফ এ ক্লাশের ছাত্র। পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক বলবিদ্যা পড়াতে এসে বললেন, বলের সঙ্গে দূরত্ব গুণ করলে আমরা কাজের পরিমাণ পাই। যেন বুঝতে পারেননি এমন ভাণ করে সত্যেন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করলেন, 'স্যার, একটা ভারী পাথর ঠেলে ঠেলে ঘর্মাক্ত হয়েও যদি আমি সেটাকে এক চুল না নড়াতে পারি, তা হলে কি ওয়ার্ক হল না?' সেদিন কুটিল এই প্রশ্নে মাস্টারমশাই অসন্তুষ্ট হননি, বরং খুশীই হয়েছিলেন।

আবার দুষ্টুমিতেও কম যেতেন না তিনি। আর একদিন পদার্থবিদ্যার প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে শিক্ষকমশাই তাঁকে দূরবীণ নিয়ে ইনফিনিটি বা অসীমে ফোকাস করতে বললেন। তখন প্রেসিডেন্সির বেকার ল্যাবোরেটারির কিছু দূরে একটি বাড়িতে দুপুরের দিকে কয়েকজন ভদ্রমহিলা বসে তাস খেলতেন। সত্যেন্দ্রনাথ দুষ্টুমি করে দূরবীণটি সেদিকে ফোকাস করে শিক্ষক মশাইকে ডেকে বললেন, স্যার, দেখুন তো ইনফিনিটিতে ফোকাস করা ঠিক হয়েছে কি না?

দূরবীণে চোখ রেখে গম্ভীর হলেন শিক্ষক। বললেন, 'না, না। ও দিকে নয়, অন্য দিকে ফোকাস কর।' সুযোগ পেলে দুষ্টুমি করতে পরিণত বয়েসেও পিছুপা হননি তিনি।

তবে চরিত্রের এই সরলতার মধ্যে কোন আত্মপ্রশ্রয়ের সুযোগ কোন দিন ছিল কী না সন্দেহ। শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং অনাবিল ভালবাসার মধ্যেও আত্মপ্রত্যয়কে প্রকাশ করার ব্যাপারে কোন দিন তিনি নতি স্বীকার করেননি।

একটা উদাহরণ দিই।

স্যার আশুতোষের আহ্বানে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে লেকচারার রূপে যোগ দিয়েছেন। কর্মক্ষেত্রে দৈনন্দিন কার্য পরিচালনায় আশুতোষের কোন ত্রুটি চোখে পড়লেই তিনি তাদের সমালোচনা না করে ছাড়তেন না। জবরদস্ত লোক আশুতোষ। চট করে ওঁর মুখের ওপর কথা বলার সাহস কারুর নেই। কেউ কেউ তাঁকে সামলে দিয়ে বললেন, কাজটা ভাল হচ্ছে না। কর্তা চটে যাবেন। কিন্তু কে কার কথা শোনে? এম এস-সি পরীক্ষায় একবার একটি প্রশ্ন পর পর তিন বছর রিপিট করা হল। কিন্তু তিন বছরই ছাত্ররা প্রশ্নটিকে এড়িয়ে গেল। পরীক্ষকদের সভায় কথাটা উল্লেখ করে আশুতোষ বললেন, 'তোরা কী পড়াচ্ছিস? পর পর তিন বছর একই অঙ্ক দিলুম, কোন ছেলেই কষতে পারলে না?'

সত্যেন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'অঙ্কটাই যে ভুল!'

কে ভুল বললে? আশুতোষের প্রশ্ন।

আমরা কষে দেখেছি। অধ্যাপক ডি এন মল্লিক কষে দেখেছেন। বললেন সত্যেন্দ্রনাথ। পরে অনুসন্ধান করে ব্যাপারটা যে সত্যি সেটা বুঝতে পেরে আশুতোষ প্রসন্নই হয়েছিলেন।

১৯১৮ সালে মেঘনাদ সাহার সঙ্গে যুগপৎ কাজ করে গ্যাসীয় পদার্থের অবস্থা সম্পর্কে একটি মূল্যবান নিবন্ধ তৈরি করলেন। নাম 'সাহা-বোস অবস্থা সমীকরণ'। বিখ্যাত ইংরেজি পত্রিকা 'ফিলোজফিক্যাল ম্যাগাজিন'-এ এটি প্রকাশিত হয়। অতঃপর বোস-স্ট্যাটিসটিকস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থানুকূল্যে ১৯২৪ সালে সত্যেন্দ্রনাথ ইউরোপে যান গবেষণার কাজে। ফ্রান্সে গিয়ে পরিচিত হলেন, আচার্য জগদীশচন্দ্রের ভাগনে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী দেবেন্দ্রমোহন বসুর সঙ্গে। এই সূত্র ধরে অবশেষে প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ অধ্যাপক সিলভাঁ লেভির সঙ্গেও।

লেভির পরিচয়পত্র নিয়ে বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী মাদাম কুরীর গবেষণাগারে এসে কাজ করার সুযোগ পান সত্যেন্দ্রনাথ। কুরী তখন বৃদ্ধা। প্রথম পরিচয়ের পর কুরী জিজ্ঞেস করলেন, তিনি ফরাসী ভাষা জানেন কি না? জানালেন, ওই ভাষাটি না জানলে তাঁর সঙ্গে কাজ করায় অসুবিধে হবে। সত্যেন্দ্রর উত্তর: 'Mais oui, Madame, je eomprends francais ässez bien'। অর্থাৎ, 'নিশ্চয়, মাদাম, ফরাসী ভাষাটা আমার জানা।' তরুণ বিজ্ঞানীর কাজ দেখে অত্যন্ত খুশী হয়েছিলেন কুরী। কাজ করেছিলেন জটিল পিয়েজে-ইলেকট্রিক এফেক্ট-এর উপর। বিষয়: বিশেষভাবে কাটা কোয়ার্টজ-এর স্ফটিক পরিবর্তী বিদ্যুৎ-এর প্রভাবে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া করে, সেটা দেখা। পরে ১৯২৫-২৬-এ গুরু আইনস্টাইনের সঙ্গে যুগ্মভাবে গবেষণা। এই সময়ে হাইজেনবার্গের মত অনেক বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। এর আগে মাদাম কুরীর সঙ্গে সমকর্মী হিসেবে তেজস্ক্রিয়তার উপরও গবেষণা চালান।

তবে কোন কোন ক্ষেত্রে আইনস্টাইনের সঙ্গে মতবিরোধও ঘটেছিল তাঁর। যেমন, গোড়ায় যে গবেষণাপত্রটি আইনস্টাইনকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছিল, তার কিছুকাল পর আরও বিস্তৃতভাবে একটি নিবন্ধ তাঁর কাছে তিনি পাঠান। এটিও আইনস্টাইন নিজে অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। তবে নিবন্ধটির বক্তব্য সম্পর্কে সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি একমত হতে পারেননি। সত্যেন্দ্রনাথ মনে করেন দ্বিতীয় এই নিবন্ধটি আগের চেয়েও মূল্যবান।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সত্যেন্দ্রনাথ বোস ইনসটিটিউটের অধ্যাপক মহাদেব দত্ত সত্যেন্দ্রনাথ সম্পর্কে কথা প্রসঙ্গে বর্তমান লেখককে একবার বলেছিলেন, 'মাস্টারমশাই-এর সবচাইতে বড় বৈশিষ্ট্য, আমরা যখনই কোন তাত্ত্বিক সমাধানের পথে বাধা পাই, তা গণিতের যে কোন বিষয়ই হোক না কেন, গভীর মনোযোগ দিয়ে তিনি তাদের শোনেন তারপর তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে মীমাংসার জন্যে আমাদের দেন। কাজের গভীরতা এবং উৎকর্ষ সম্পর্কে উনি অত্যন্ত সতর্ক। সত্যিকারের ভাল কাজ না হলে সেই কাজ প্রকাশের ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ ছিল অত্যন্ত কম। একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি। তখন আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াচ্ছি। একবার বললাম, 'অটোমারফিক ও মড্যুলার ফাংশনস'-এর উপর এখন ভাল কাজ হচ্ছে। ইচ্ছে আছে এ নিয়ে একটু ভালভাবে পড়াশুনা করে ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা করব।' কথাটা শুনে অধ্যাপক বসুও

ব্যাপারটা নিয়ে একদিন আলোচনা করার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। বললেন, 'এ বিষয়ে কি হচ্ছে, কে কী করছে, শোনা যাবে।' কয়েকদিন পর আলোচনা করতে গিয়ে দেখা গেল এই বিষয়ে তিনি এমন কিছু কিছু তথ্য উল্লেখ করলেন, ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত প্রামাণ্য বইগুলিতেও সচরাচর চোখে পড়ে না।'

বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী এনরিকো ফার্মির 'নোটস অভ কোয়াণ্টাম মেকানিকস' বই-এর মুখবন্ধে বলা হয়েছে, ফার্মি তাঁর জীবনের শেষ দশ পনের বছর পদার্থ বিদ্যা সম্পর্কে কোন বই পড়েননি। গবেষণার ফলাফল শুনে এবং নিজের মত করে তাদের প্রমাণ করে সমসাময়িক বিজ্ঞান প্রগতির সঙ্গে তিনি তাল রেখে চলতেন। অধ্যাপক বসু সম্পর্কেও এ কথা বলা চলে। গাণিতিক তত্ত্ব, তা সে বিশুদ্ধ গণিতই হোক অথবা পদার্থবিদ্যা—নতুন কিছু জানার ইচ্ছে হলে ঘনিষ্ঠ মহলের অথবা কাউকে না পাওয়া গেলে বইপত্র ঘেঁটে ব্যাপারটা কী ভাবে হয়েছে জেনে নিতেন তিনি, তারপর নিজস্ব পদ্ধতিতে তাদের মূল সমাধানগুলি বের করতেন। নতুন নতুন তত্ত্ব শেখার এই হল তাঁর পদ্ধতি। ওই সমস্ত তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানও গভীর ছিল। আর এই কারণেই তাঁর ছাত্ররা পাঠ্য বস্তুর বাইরেও বিচরণ করার সুযোগ পেতেন, যা ভবিষ্যতে গবেষণার কাজে তাঁদের প্রচণ্ড সাহায্য করত। দেখেছি, পরিণত বয়েসেও অধ্যাপক বসু গাণিতিক তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করার সময় তরুণের মতই সজীব। প্রাণবন্ত।

হ্যাঁ, তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানে তাঁর অবদান চিরদিনই ভাস্বর থাকবে। প্রথম চমকের তিরিশ বছর পর তিনি ইউনিফায়েড ফিল্ড থিওরি নিয়ে নিবন্ধ তৈরি করেন। তাঁর যুক্তি অত্যন্ত শক্ত কাঠামোর উপর তৈরি। এ নিয়ে আইনস্টাইন থেকে শুরু করে আরও অনেকেই কাজ করেছেন। উদ্দেশ্য—তড়িৎ, চুম্বক এবং মহাকর্ষ ক্ষেত্রের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে এদের মৌল উৎসকে আবিষ্কার করা। ১৯৪৫ সালে আইনস্টাইন যে নতুন ক্ষেত্র তত্ত্বের অবতারণা করেন, তার দুটি সোপানের মধ্যে একটিকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত কেউই সম্পূর্ণ করতে পারেন নি। এর শুরুতেই বাধা ৬৪টি সহ সমীকরণ। শ্রোডিনজার প্রমুখ বিজ্ঞানীরা দীর্ঘ সাত বছর ধরে চেষ্টা করেও সম্পূর্ণ সফল হতে পারলেন না। ১৯৫২ সালে সত্যেন্দ্রনাথ অনেক সহজভাবে তাদের সম্পূর্ণ এবং সঠিক সমাধান বের করে ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন।

শুধু পদার্থবিজ্ঞান নয়, রসায়নেও তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। বিশিষ্ট উদ্ভিদ

বিজ্ঞানী অধ্যাপক সহায়রাম বসু একবার মন্তব্য করেছিলেন, অনেক সময় ছত্রাক সম্বন্ধে সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে কথা বলে অনেক নতুন বিষয়ে আলোকপাত করা গেছে। কেলাস বিজ্ঞানের উপর তাঁর অবদান অনবদ্য। সঙ্গীত তিনি ভালবাসেন। এস্রাজ তাঁর প্রিয় বাজনা। নিজেও বাজাতেন। পশু পাখির উপর অগাধ ভালবাসা। মৃত্যুর মাত্র এক মাস আগে দেখা করতে গিয়েছিলাম। দেখলাম, তাঁর মাথার কাছে তাঁর প্রিয় বেড়ালটি ঘুরঘুর করছে। সাম্প্রতিক বিজ্ঞান গবেষণা, সমাজ, শিক্ষা এবং রাজনীতি সম্পর্কে তিনি সমান সজাগ। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের জন্যে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ এবং সেই সঙ্গে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার প্রকাশ। এ নিয়ে নিয়তই তিনি ভেবেছেন। সেই সঙ্গে চালিয়েছেন জাতীয় অধ্যাপকরূপে বিজ্ঞানীদের গবেষণায় সক্রিয় সাহায্যের কাজ।

কর্মজীবন : ১৯২৬-৪৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক, ১৯৪৫-৫৬ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের খয়রা অধ্যাপক, ১৯৫৬-৫৮ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, ১৯৫৮ জাতীয় অধ্যাপক।

সম্মান : ১৯৪৪-এ ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি, ভারতের ন্যাশনাল ইনসটিটিউট অব সায়েন্সেস-এর সভাপতি, রয়েল সোসাইটির ফেলো (১৯৫৮)। ১৯৫৪ সালে ভারত সরকার 'পদ্মবিভূষণ' সম্মানে তাঁকে ভূষিত করেন।

মানুষ হিসেবে কেমন ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ?

প্রশ্নটি মাথায় আসতেই একবার ঠিক করলাম ওঁর সাক্ষাৎকার নেব। কথাটি পেড়েছিলাম কয়েক সপ্তাহ পরে। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদে 'বাংলাদেশ'-এর ব্যাপারে বিজ্ঞানীদের একটি সভা সেরে বাড়ি ফিরছেন তখন। সেই একই ক্যাজুয়াল ভাব। পা-জামা, গায়ে লম্বা হাতা অদ্ভুত জামা। আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'কী আর নতুন কথা বলব, বাবা ? আসিস দেখা যাবে।' বললাম, তাহলে, আগামী রবিবার খুব সকাল সকাল যাব। শুনেছি, তখন আপনার মন মেজাজ ভাল থাকে।

হাসলেন জাতীয় অধ্যাপক। বললেন, কী করে জানলি ?

জনৈক বিজ্ঞানী বললেন, হ্যাঁ, যদি না আঁক কষতে বসেন। তখন গেলে কিন্তু তাড়া খেতে হবে।

যাঃ! সত্যেন্দ্রনাথের উত্তর। একেবারে বৈঠকী মেজাজ।

না, অসুবিধে হয়নি। রবিবার ভোর সাতটায় ২২ ঈশ্বর মিলের বাড়িতে গিয়ে দেখলাম অধ্যাপক একা, কী যেন পড়ছেন খাটের উপর হুমড়ি খেয়ে। মাথার কাছে বেড়াল আড়মোড়া ভেঙে পাশ ফিরে শুলো। ঘরে ঢুকতেই অধ্যাপক কথা বললেন। কে রে, কে এলি? উদাত্ত, শিশুসুলভ আন্তরিকতা তাঁর কণ্ঠে। পরিচয় দিলাম।

সমরজিৎ? বোস্। কী ব্যাপার, বাবা?

বুঝলাম খোস মেজাজে রয়েছেন অধ্যাপক।

শুরু হল বৈঠকী চালে কথাবার্তা। ফাঁকে ফাঁকে প্রশ্নোত্তর। সাবধানে কথা বলতে হচ্ছিল। কারণ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল কথাবার্তা চালচলনে ক্যাজুয়েল হলেও, অত্যন্ত সতর্ক এবং স্পর্শকাতর তিনি। নিজের কনভিকশনে ঘা পড়লে কাউকে রেহাই দেবেন না।

চারপাশে বই ছড়ান। দি ভার্টিব্রেট স্টোরি, Petit Larauses, ননীমাধব চৌধুরীর 'আবির্ভাব'। মাথার কাছে দেয়ালে টাঙান রবীন্দ্রনাথ, পেছনে গুরু আইনস্টাইন। মনে হলো অনেক আগেই ঘুম থেকে উঠেছেন তিনি। রীতিমত ফ্রেশ। ওঁর সঙ্গে ধারাবাহিক আলোচনা ওই পরিবেশে করা শক্ত। তবু তারই ফাঁকে প্রশ্ন করেছি। উত্তরও বৈঠকী ঢংএর।

প্রশ্ন: আইনস্টাইনের সঙ্গে আপনার কী ভাবে যোগাযোগ হয়, অধ্যাপক বসু?

অধ্যাপক: চিঠি লিখে যোগাযোগ করেছিলাম। নিজেই। পরে ১৯২৫-এ বার্লিনে ওঁর সঙ্গে দেখা হয়। ৫ নম্বর 'হারল্যাণ্ড স্ট্রাসে'র বাড়িতে একাধিকবার বৈজ্ঞানিক বিষয়ের উপর ওঁর সঙ্গে আলোচনা করেছি।

প্রশ্ন: ওঁর সম্পর্কে কিছু বলুন।

অধ্যাপক: কী বলব, বল্? আইনস্টাইন খুব নৌকো চালাতে ভালবাসতেন। মাঝে মাঝে হল্যাণ্ডে বেড়াতে যেতেন। তখন ক্লাস ছিল না। যুদ্ধের সময়। নিজে সোসিয়ালিস্ট ছিলেন। ওঁর বিরুদ্ধে ছেলেরা আন্দোলনও করেছিল। আমি যখন গেছি, ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপক হিসেবে নাম আছে, পড়াতেন না। মাইনে পেতেন কাইজার উইলহেলম ইনস্টিটিউট থেকে। নিজে ইহুদী ছিলেন। মনে বেশ ক্ষোভও ছিল। হিটলারের অভ্যুত্থানের পর হল্যাণ্ডে চলে যান। পরে প্যারিসে আসেন। নিউটনের

তখন ত্রি-শতবার্ষিকী উৎসব চলছে।

প্রশ্ন : অধ্যাপক বসু, উনি কি ভারতের মধ্যে দিয়ে দেশের বাইরে যান? এ সম্পর্কে আপনি কী বলেন?

অধ্যাপক : উনি প্রিন্সটনে যান হল্যাণ্ড বেলজিয়াম হয়ে।

প্রশ্ন : বোস-স্টাটিস্টিকসের ব্যাপারে কিছু বলুন।

অধ্যাপক : আমি তখনও থিওরি অভ রেডিয়েশন পড়াতাম। এ ব্যাপারে পুরনো একটা দ্বন্দ্ব ছিল। সকলেই বলছে নতুন তত্ত্ব নিয়ে কাজ করছি। তবে বেশির ভাগ ফরমুলা নিউটনের নিয়মেই চলত। পরে প্লাঙ্ক ব্যাপারটা নিয়ে নতুন ভাবে মাথা ঘামান। আমি ওঁদের কাজ সংখ্যায়ন ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি।

প্রশ্ন : তখনকার দিনে বিজ্ঞানীদের কাজ করার উৎসাহ এবং এখনকার দিনের উৎসাহের মধ্যে কি মৌলিক কোন পার্থক্য আপনি দেখেছেন, অধ্যাপক বসু?

অধ্যাপক : তখন তো কাজের স্কোপ কম ছিল, গোলমালও ছিল। কর্মীর সংখ্যা কম ছিল, বাধাও কম ছিল। এখন উৎসাহ বেড়েছে, তবে বাধা বেশি।

প্রশ্ন : অধ্যাপক বসু, যেমন ধরুন আজকের মহাকাশ অভিযান অথবা মলেক্যুলার বাইওলজিতে ডি এন এ, আর এন এ-এর উপর মৌলিক অনুসন্ধান চলছে—নিশ্চয় তারা জ্ঞানের উন্মেষ ঘটাচ্ছে। কিন্তু মানব সভ্যতার উপর তাদের প্রতিক্রিয়াকে অনেকেই সন্দেহের চোখে দেখছেন। এ ব্যাপারে আপনি কী বলেন? শুধু বিজ্ঞানী নন, আপনি একজন মানব প্রেমিক এবং দার্শনিক—এটা ভেবেই আপনার কাছে আমার এই প্রশ্ন।

অধ্যাপক : মহাকাশ বিজ্ঞানের ব্যাপারটা তো কোন নতুন চিন্তা নয়। আমরা তার অ্যাপ্লিকেশন দেখছি। তবে ডি এন এ, আর এন এ-টাই বড় কাজ। যুদ্ধের পর জীববিজ্ঞানে আমাদের জ্ঞান অনেক তাড়াতাড়ি বেড়েছে। মহাকাশ প্রযুক্তিবিদ্যা একটা বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। কিন্তু মলেক্যুলার বাইওলজির উদ্ভাবনা জীবনের অর্থ টাই হয়ত পালটে দিতে পারে।

প্রশ্ন : পদার্থ বিজ্ঞানে মৌলিক গবেষণার ব্যাপারে আমরা কতটা কাজ করতে পেরেছি?

অধ্যাপক : বেসিক রিসার্চে তেমন কোন কাজ হয় নি, বাবা। বাইরের দেশে যা হয়েছে, এখানে তা রিপিট করছি। ও ধরনের কাজে খরচও বেশি।

প্রশ্ন : কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান কারিগরি গবেষণা এবং ন্যাশনাল ফিজিকেল ল্যাবোরেটারির কাজ সম্পর্কে আপনি কী বলেন ? সৌরশক্তি গবেষণার কী হল ?

অধ্যাপক : কী বলব। একটির আমি সভ্য, আর একটির সভাপতি। ওদের আমি কেন বিরূপ সমালোচনা করব ? আসল কাজ কী আর তেমন হচ্ছে, বাবা ? সৌরশক্তির প্রচারের কাজ হচ্ছে। কৃষ্ণান যখন ছিল, হয়েছিল। এখন কাজ কিছু নেই।

প্রশ্ন : অধ্যাপক বসু, ধরা যাক, এই মুহূর্তে ভারতের যাবতীয় বিজ্ঞান এবং কারিগরি বিষয়ের দায়িত্ব আপনার উপর এসে পড়ল, আপনার পরিকল্পনাটি তখন কেমন হবে ?

অধ্যাপক : এখন আমাকে দিলেও পারব না, আশী বছরের কাছাকাছি এসে ও কাজ হয় না। যে সরষে দিয়ে ভূত ছাড়াবে তাতেই যে এখন ঘুন ধরে গেছে ! ষাট বছরে দিলে কথা ছিল। আসল কথা, দেশের ছাত্রদের গড়ে তুলতে হবে, উৎসাহ দিতে হবে, কথায় কথায় বিদেশী কোঅপারেশনের উপর নির্ভর করলে চলবে না। পুঁথিগত পাঠ হঠাও।

সত্যেন্দ্রনাথের কথা বলার ঢংটি ছিল খুবই বৈঠকী। বিশেষ করে শেষ জীবনে। কথা বলতে বলতে প্রায়ই তিনি প্রসঙ্গ পালটাতেন। হঠাৎ জনৈক বন্ধুর কথা টেনে আনলেন সত্যেন্দ্রনাথ। বললেন, বটকৃষ্ণ আমাদের ছেলেবেলার বন্ধু। দারুণ ভাল ছেলে। অরবিন্দ ঘোষের সময় স্বদেশী মন নিয়ে কাজে নেমেছিল। বললে, বিদেশীদের গোলামী করব না। ব্রিলিয়েন্ট ছেলে। অত্যন্ত আদর্শবাদী। এক সময় এখানে এসে ন্যাশনাল কাউন্সিলে চাকরি নিয়েছিল। তখনকার দিনে শুধু আদর্শের জন্যেই কত ছেলে দুঃখ-কষ্ট হাসিমুখে স্বীকার করে নিয়েছে। তেমন ত্যাগ আজকাল দেখি না।

প্রশ্ন : আপনি কি বলতে চান, আপনাদের সময় যাঁরা শিক্ষকতা করতে আসতেন, তাঁদের সকলেই ওই ত্যাগের অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন ?

অধ্যাপক : সকলে বললে ভুল হবে। আমাদের এক মাস্টার ছিল ছেলেবেলায়। ক্লাশে এসেই সে ঘুমিয়ে নিত। তার বাইরের কাজ ছিল বড় বেশি। প্রচুর ট্যুইশনি করত। তবে অনেকেই ছিলেন, যাঁরা লেখাপড়া ছাড়াও অনেক ভাল ভাল ব্যাপারে মনে ছাপ আঁকতে পারতেন।

প্রশ্ন : এখনকার শিক্ষক সমাজ সম্পর্কে আপনি কী বলবেন ?

আচার্য : কী আর বলব, বাবা। মনে হয় শিক্ষকদের নিজেদের পাওনাগণ্ডা সম্পর্কে এখন উৎসাহ সব চাইতে বেশি। বলছিনে, সেটা দরকারী নয়। তাঁদের বাঁচার জন্যে যতটুকু দরকার অব্যবস্থার দরুন অনেক কিছুই তার হয়নি। শুধু মাঝে মাঝে খোলনলচে পাল্টানো হচ্ছে। কী সরকার কী শিক্ষক সমাজ মাঝে মাঝে শুধু পরিকল্পনা করছে। কাজ করছে না।

প্রশ্ন : অধ্যাপক বসু, সম্প্রতি কথা উঠেছে, আমাদের স্কুলের পাঠক্রম নাকি বয়েসের তুলনায় অনেকটা বেশি। অথচ আন্তর্জাতিক সমীক্ষা অনুযায়ী ঠিক এই বয়সের ছেলেমেয়েদের মনের মান যা, তাতে করে এটাকে ঠিক চাপ বলা চলে না। তা যদি হয়, তাহলে গোলমালটা কোথায় দাঁড়াচ্ছে ?

অধ্যাপক : ও সব ছেড়ে দে না। আমাদের ছেলেদের বিদ্যাবুদ্ধি কম নয়। দুষ্টুমির বুদ্ধি বেড়েছে। আসলে ঠিকমত যদি পড়ান হয়, মাতৃভাষায় শেখান হয়, ভাষার ওপর জ্ঞান থাকে, ওসব চাপ-টাপ বাজে কথা। আসলে পড়ালিই নে, ছেলেরা ফল ভাল করবে কী করে ?

হ্যাঁ, অত্যন্ত 'ক্যাজুয়াল'ভাবেই অত্যন্ত স্পষ্ট কথায় যেন আঘাত হানলেন সত্যেন্দ্রনাথ। আসলে যেকথা তাঁকে জিগ্যেস করতে চেয়েছিলাম সেটা হল, স্বাধীনতার পর দুই দশকেরও বেশি কেটে গেছে। এবং ক্রমে শিক্ষা জগতে অস্থিরতা বরং বেড়েছে। কারণ, যে শিক্ষা জীবনে আত্মবিশ্বাস জাগায়, বেঁচে থাকতে সাহায্য করে, পারস্পরিক সহমর্মিতা উদ্বুদ্ধ করে, তেমন কোন শিক্ষার কাঠামো এখনও পর্যন্ত কি আমরা রূপায়িত করতে পেরেছি ?

সত্যেন্দ্রনাথের বক্তব্য, নিচের থেকে কত রকম পড়ার ছিল, কেউ তা পড়তে পেলে না। দরকার গোড়া থেকে জল ঢালার। প্রাথমিক শিক্ষা আজ সব চাইতে বিপর্যস্ত। সেদিন একজন বললে ডিগ্রির পাশ কোর্সে কী হবে ? আমি বললাম, গোল্লায় যাবে। কেন ? পাশ কোর্সে কী কিছুই নেই ? যেটুকু আছে, তাই শেখ না। তাতেই অনেক কিছু জানা যায়। আসল কথা, শুধু মতলব ভাঁজলেই হবে না। মতলব হাশিল করার জন্যে যা দরকার সেটা আগে চাই। একটা প্ল্যানিং করা হল। কিছুদিন চলার পর যখন দেখা গেল সেটায় কাজ ভাল হল না, তৈরি কর আর একটা প্ল্যানিং। এমনি করে শুধু প্ল্যানিংই চলছে।

কিন্তু সিনসিয়ারলি কেউ কাজ না করায় যে সেটা ফেল করল, প্ল্যানিং-এর জন্যে নয়, একথাটা কেউ দেখলে না। পাঠক্রম যাই হোক না কেন, 'মেথোড'টা ঠিক থাকলে, আর মন দিয়ে সেই মত কাজ করলে শিক্ষায় গোলমাল হওয়ার কারণ নেই। অবশ্য 'মেথোড' মত কাজ করার উপযুক্ত লোক চাই। সুযোগ চাই।

সত্যেন্দ্রনাথ বলে চললেন, আজকের দিনে সকলেরই সব বিষয়ে একটা সাধারণ জ্ঞান থাকা দরকার। স্কুল-কলেজের পড়ার শেষে শুধু চাকরী খুঁজলে চলবে কেন? স্বাধীন বৃত্তির কথাও ভাবা দরকার। একজন 'জেন্টলম্যান' ফার্মার তো হওয়া যেতে পারে?

প্রশ্ন : সর্বসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রসার ঘটাতে গেলে মাতৃভাষায় বই লেখার জন্যে আরও অভিযান চালান দরকার। এ সম্পর্কে আপনি কী বলেন?

অধ্যাপক : অভিযান-টভিযান ও সব বড় বড় কথা ছাড়্। আমাদের বাংলা ভাষায় প্রচুর বই যেমন লিখতে হবে, সেই সঙ্গে আরও একটা কথা বেশি করে ভাবা দরকার। কী লিখব। তুই তো মহাকাশ নিয়ে লিখেছিস। চাষবাস নিয়ে লিখেছিস কিছু?

তাঁর হঠাৎ এই প্রশ্নে বিব্রত বোধ করেছিলাম, বলাই বাহুল্য। কিন্তু পরক্ষণেই এ প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজেই দিলেন। বই লেখা দরকার এমন এমন বিষয়ের ওপর সাধারণের যাতে আগ্রহ আছে। যার প্রয়োজন সাধারণ মানুষ অনুভব করছে। আসল কথা, পাঠকদের ধাত বুঝে কাজ করতে হবে তো?

আর বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কে কী হবে? মাতৃভাষায় উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষার?

আচার্যের তাৎক্ষণিক উত্তর : ১৯০৫ সাল থেকে বিজ্ঞান শেখান হচ্ছে। যদি কেউ ইচ্ছে করে, মাতৃভাষায় কি সত্যিই পাঠ্যপুস্তক লেখা বা উচ্চতর বিজ্ঞান পড়ান যায় না? সেদিন কে একজন, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ায়, বললে, বাংলায় পড়াতে হলে মাস্টারি ছেড়ে দেব। দেখ ব্যাপার। ইংরেজি জানার দরকার নেই। শুধু মুখস্থ বলে গেলেই হল। আমাদের ছেলেরাও বোঝে না। তাদের কাছে অমন মাস্টারের পড়ানটা, 'আমি যাহা বলি, তাহা বক্তৃতা, যাহা লিখি তাহা কাব্য।' বাংলা ভাষায় টেক্‌সট বুক কমিটি হয়েছে। তাদের

কেউ কেউ ভাবছে, ইংরেজি বই অনুবাদ করে মেরে দেবে। বাবা, ভাল অনুবাদ করা আরও শক্ত। না করতে পারলে বই-এর ওরিজিন্যালিটি নষ্ট হয়। তাছাড়া খানিকটা অবাস্তবও হয়ে পড়ে।

জীববিজ্ঞানের কথাই ভাবা যাক। আমাদের দেশে কত গাছপালা আছে; পথেঘাটে চলতে গেলেই তাদের দেখা পাওয়া যায়। তাদের দিয়ে কি জীববিজ্ঞান বোঝান চলে না? বিলেতী বই যখন অনুবাদ করা হয়, তখন সমস্ত প্রাণী বা উদ্ভিদের উদাহরণ দেওয়া হয় ইংরেজি নামে। তাদের কাউকে আমরা চিনি নে; তাদের বাস বিলেতে বলে। এটাই অবাস্তব। এ ধরনের অভিজ্ঞতা বিজ্ঞান পড়াশুনায় অসুবিধের কারণ হয়।

কেন্দ্রীয় সরকার হিন্দির জন্যে কমিটি করেছেন। ওঁরা বলছেন, ওঁরা যে পরিভাষা করেছেন, সেগুলি আঞ্চলিক ভাষায় নিতে হবে।

প্রশ্ন: কিন্তু উপযুক্ত পরিভাষা তৈরি করা খুবই জটিল ব্যাপার। এর জন্যে বিজ্ঞানী এবং ভাষাতত্ত্ববিদদের মিলিতভাবে কাজ করা দরকার। তাছাড়া এমন অনেক ইংরেজি শব্দ আছে, যারা এখন বাংলা ভাষা বনে গেছে। বিজ্ঞানের বহু শব্দ চলতে চলতে বাংলা ভাষায় ঠাঁই করে নেবে।

অধ্যাপক: পার, এলোপাথারি বাংলা প্রতিশব্দ তৈরি কর। বিষয়টা যারা বোঝে, তারা ওই ফাঁকে কিছু কিছু ভাল পরিভাষা হয়ত তৈরি করে ফেলবে। যতক্ষণ তা না হচ্ছে বিদেশী শব্দ বাংলা কথায় ব্যবহার কর। বক্তব্যটা বলা হোক বাংলায়। এটা না করতে পারলে বিজ্ঞান শিক্ষা কখনই হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়।

তিনি বললেন, যে যা পরিভাষা তৈরি করেছেন তাদের একত্রিত করে পাঁচ বছর অন্তর একটি কমিটির উচিত তাদের পরীক্ষা করা। তারপর উপযুক্ত পরিভাষার একটি সংকলন প্রকাশ করা দরকার। আর দরকার বাংলা ভাষায় একটি ভাল শব্দটিকার বই। উপযুক্ত লেখকদের দিয়ে বিদেশী-বৈজ্ঞানিক শব্দের টিকা লেখাতে হবে।

সত্যেন্দ্রনাথ একের পর এক বিক্ষিপ্তভাবে দেশের বিজ্ঞান চর্চা এবং বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি উদ্যোগের ওপরও মাঝে মাঝে মন্তব্য করছিলেন। দেশকে বৈষয়িক ক্ষেত্রে স্বয়ংভর করার ব্যাপারে আমাদের বিজ্ঞানীদের তিনি প্রশংসা করলেন। দেশের বহুমুখী গবেষণার সাফল্যে তিনি আনন্দিত। আবার মাঝে

মাঝে রসিকতার সঙ্গে মন্তব্য করলেন, সরকারী গবেষণাগারগুলি মাঝে মাঝে বাড়িয়েও বলে।

প্রশ্ন : বিজ্ঞানে বাঙ্গালী ছাত্ররা কেমন করছে?

অধ্যাপক : খুবই দুরবস্থা, বাবা। আগে প্রাচুর্য ছিল। এখন কমে গেছে। ভাইভা নিতে গিয়েই দেখছি। এরকম টোকাটুকি হলে, চলে?

অভিযোগ?

অভিযোগ নিশ্চয়। কিন্তু তাঁর প্রত্যেকটি অভিযোগের মধ্যে ছিল অদ্ভুত আন্তরিকতা। প্রগাঢ় আত্মবিশ্লেষণ। যেটা তিনি চাইতেন, তা হল, বিজ্ঞান-শিক্ষা, বিজ্ঞান-প্রসার এবং বৈজ্ঞানিক কাজকর্মের ব্যাপারে একটা সম্যক উপলব্ধি নিয়ে এগোনো দরকার। আর তাদের বাস্তবায়িত করার জন্যে প্রয়োজন আন্তরিকতা এবং বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এই শেষের ব্যাপারেই যত ফাঁকিবাজি চলছে।

মনে হল এই হল আসল সত্যেন বসু। গণ্ডীহীন মন তাঁর চিন্তা ভাবনার প্রধান আকর।

অন্তর্লোকের ডাক এসেছিল হয়ত। অন্তর্মুখী মন হয়ত সে কারণেই মুহূর্তের জন্যে সরব হয়ে উঠেছিল সে দিন।

এর মাত্র কয়েকদিন পর, ৮ জানুয়ারি ১৯৭৪, কলকাতার বসু বিজ্ঞান মন্দিরে বোস-সংখ্যায়নের পঞ্চাশ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রের উদ্বোধন হল। বক্তৃতাকক্ষ দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানীদের কৌতূহলী ভিড়ে ঠাসা। বক্তার আসনে সত্যেন্দ্রনাথের বাঁ পাশে অগ্রজ বিজ্ঞানী অধ্যাপক দেবেন্দ্রমোহন বসু। দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানীরা বোস-সংখ্যায়নের জনককে সম্বর্ধনা জানালেন।

কিন্তু যাঁকে নিয়ে সম্বর্ধনা তিনি শিশুর মত নির্লিপ্ত।

সম্বর্ধনার উত্তরে বললেন, তখন আমাদের সামনে আদর্শ ছিল মাত্র দুটো। দেশকে কীভাবে স্বাধীন করা যায়। আর এমনভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করতে হবে যাতে করে আমরা প্রমাণ করতে পারি যে, ইউরোপের বিজ্ঞানীদের মত এদেশের বিজ্ঞানীরাও ভাল কাজ করতে পারেন। মেঘনাদ, জ্ঞান ঘোষ—এই আদর্শ নিয়েই আমরা বিজ্ঞান করতে নেমেছিলাম। …পুরস্কার, সম্বর্ধনা, এ সব যে বয়েসে পেলে নতুন উৎসাহ নিয়ে কাজ করা যায়, যখন পাওয়ার কথা, তখন

পাইনি। আশি বছর বয়েসে এসে এমন বিপুল সম্বর্ধনা পেলাম— মনে হয়, এবার মরলে কোন ক্ষোভ থাকবে না।

হ্যাঁ, সেই বিদগ্ধ বিজ্ঞানীদের সমাবেশেও কতকটা এমন স্বরেই যেন কথা বলেছিলেন তিনি।

উদ্বোধনী সভার পর বেশ জোর পায়ে এগিয়ে গেলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোডের উপর দাঁড় করান গাড়ির দিকে।

ওঁর অনুগমন করতে করতে জিজ্ঞেস করলাম, বোস-স্ট্যাটিসটিকস-এর পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে যে সব বিষয়ের উপর আলোচনা হওয়ার কথা, সে ব্যাপারে আপনি কিছু মন্তব্য করবেন না?

তোরা করগে যা। আমি করব না। বললেন তিনি। মুখের ওপর আত্মভোলা হাসি।

প্রশ্ন করলাম, আর একটা কথা জিজ্ঞেস করব।

আমার পিঠের ওপর একটা মৃদু করাঘাত করে বললেন, এখন থাম দিকি? খিদে পেয়েছে। বাড়ি যাব। তুই কি আমার পাবলিসিটি অফিসার হয়ে দাঁড়ালি?

রাস্তার ওপর এসে পড়েছিলাম। সামনে তিনি। পেছনে অনেকে।

গাড়ির পেছনের দরজা খুলে বললাম, উঠুন, স্যার।

তিনি বললেন, পেছনে কি রে? সামনে। আমি সামনের মানুষ। সব সময় সামনেই বসি। বলেই, গাড়ির সামনের আসনে গিয়ে তিনি বসে পড়লেন।

গাড়ি চলে যেতেই প্রবীণ বিজ্ঞানী অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ির সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। বললাম, স্যারকে যেন আজ অনেক তরুণ বলে মনে হল। ইদানীংকালে এত প্রাণখোলা, এত চঞ্চল ওঁকে আর কখনও দেখিনি। খুব ভাল লাগছে। কিন্তু আজকের বক্তৃতায় ওঁর শেষের মন্তব্যটি মন খারাপ করে দিয়েছে।

অধ্যাপক ভাদুড়ি বললেন, যা বলেছ, হঠাৎ অমন কথা উনি বলবেন, ভাবতে পারিনি।

৮ জানুয়ারির পর কয়েকদিন সকাল, দুপুর, বিকেল—চলল সভাসমিতি। কখনও বিজ্ঞান কলেজে। অথবা অন্যত্র। মাঝে একদিন হাওড়ায় একটি বিজ্ঞান-সমিতিতে গিয়েও সভা করে এলেন। মনে হল, আশি বছরের প্রবীণ বিজ্ঞানী যেন ষোল বছরের তরুণে রূপান্তরিত হয়ে গেছেন। দুই একজনকে মন্তব্য

করতে শুনেছি, এটা কিন্তু বাড়াবাড়ি হচ্ছে। যে ডাকছে তিনি না হয় তার ডাকে সাড়া দিচ্ছেন। কিন্তু যে ডাকছে, তারও তো একবার ভাবা দরকার! এ বয়েসে এমন ধকল, এ সব কি ভাল? বাড়াবাড়িরও একটা সীমা আছে।

বাড়াবাড়ি কী না, জানি না। কারণ তিনিও কাউকে ক্ষুণ্ণ করতে চাননি হয়ত।

তবু কেউ কেউ যে আশঙ্কাটি করেছিলেন, তাই ঘটে গেল।

৮ জানুয়ারি। তারপর মাঝে মাত্র ছাব্বিশটি দিন। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ৪ ফেব্রুয়ারি সকাল পাঁচটা বেজে চল্লিশ মিনিটে বোস-সংখ্যায়নের জনক আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাপ্রস্থানের পথে চলে গেলেন। জন্ম-জয়ন্তী রূপ পরিগ্রহ করল মৃত্যু-বার্ষিকীতে।

১ জানুয়ারি, ১৯৭৪ তিনি ৮০ বছরে পদার্পণ করেছিলেন।

ইন্দ্র পতন?

তা ছাড়া আর কী হতে পারে? জীবনের শেষ প্রান্তে যখন তিনি উপনীত, তাঁর অসামান্য কৃতিত্বের স্মরণে ঠিক তখনই জাতীয় পর্যায়ে পালন করার ব্যবস্থা হল বোস-সংখ্যায়নের পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে বর্ষব্যাপী উৎসব। ভারতীয় বিজ্ঞানে এ ধরনের ঘটনা এই প্রথম। কার্যসূচী অনুযায়ী ১৯৭৪ এবং ১৯৭৫-এর কিছু সময় ধরে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের বোস-সংখ্যায়নের পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের বিস্তৃত আঙ্গিক নিয়ে আলোচনা করার কথা। ওই সব আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবেন তরুণ এবং প্রবীণ ভারতীয় বিজ্ঞানী। অংশ গ্রহণ করবেন বেশ কিছু সংখ্যক স্বনামধন্য বিদেশী বিজ্ঞানীও। যাঁদের মধ্যে নোবেল বিজ্ঞানীরাও আছেন। উদ্দেশ্য, মৌল গবেষণায় ভারতের তরুণ বিজ্ঞানীদের উদ্বুদ্ধ করা। অনেকেই আশা করেছিলেন ওই সব আলোচনা সভায় অধ্যাপক বসু স্বয়ং উপস্থিত থেকে অনুপ্রেরণা যোগাবেন। দুর্ভাগ্য, সেটা আর সম্ভব হল না।

মনে পড়ে, মৃত্যুর কয়েকদিন আগে কথা প্রসঙ্গে একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আমাদের বিজ্ঞানীরা কি ভাল কাজ করতে পারেন না? তাঁদের সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?

উত্তরে আচার্য বলেছিলেন, ভাল কাজটাজ ছেড়ে দে না? আমাদের বিজ্ঞানীরা কেউ খারাপ নয়। ফাঁকিবাজিটা কম করলেই ভাল কাজ করতে পারে।



দেবেন্দ্রমোহন বসু

দেবেন্দ্রমোহন বসু

বর্তমান দশকের বিজ্ঞান সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?

প্রথম দর্শনের পর ওঁর কাছে এটিই আমার প্রথম প্রশ্ন। কিন্তু প্রশ্ন করার পর নিজেই আমি সপ্রশ্ন হয়ে উঠেছিলাম। ওঁকে বিব্রত করলাম না তো? তখন উনি পরিণত বয়স্ক। দীর্ঘকাল বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ আঙ্গিনা থেকে বিদায় নিয়েছেন। এই বিদায় সমসাময়িক-বিজ্ঞানের পরিমণ্ডল থেকে হয়ত ওঁকে বিচ্ছিন্নও করে দিয়ে থাকবে। তেমন কিছু ঘটাটা অস্বাভাবিকও নয়। মনে মনে ভাবলাম, যদি তাই হয়, আমার প্রশ্নে উনি বিরক্ত হলেন না তো?

প্রশ্ন শুনে মুহূর্তের জন্যে স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। স্থির এবং গম্ভীর সে দৃষ্টি। অনুসন্ধিৎসুও মনে হল যেন। পরমুহূর্তে ওঁর সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল আত্মসমাহিতের স্নিগ্ধতা। ঠোঁটের কোণে স্নেহকোমল হাসি।

বললেন, সুললিত সাহিত্য এবং কলার মত বিজ্ঞানের বিকাশেও একটা ধারাবাহিকতা থাকা দরকার। পারম্পর্যের প্রয়োজন। সমসাময়িকতাকে অস্বীকার করে সে জাগতে পারে কি? চাই, মানবিকতার সঙ্গে বিজ্ঞানের নিবিড় সম্পর্কও। আজকের বিজ্ঞান সেদিক দিয়ে অসম্পূর্ণ।

বলেই মৃদু হাসলেন আর একবার। তারপর আবার শুরু করলেন, বসু বিজ্ঞান মন্দিরে আচার্য জগদীশচন্দ্র এই বিশ্বাস নিয়েই একদিন গবেষণার কাজকর্মের সূচনা করেছিলেন। আমরা তাঁর উত্তরসূরী। তাঁরই অনুগমন করেছি।

আমার ভুল ভাঙ্গল।

উনি আধুনিক বিজ্ঞান প্রসঙ্গে সরাসরি আমাকেই প্রশ্ন করে বসলেন: তুমি তো মহাকাশ বিজ্ঞান নিয়ে লেখ। চাঁদের মাটি পরীক্ষা করে কী কী জানা গেল?

চাঁদের মাটি সম্পর্কিত ফলাফলের কিছু খবর ওঁকে জানালাম।

পুরো আবহাওয়াটাই পালটে গেল। সমসাময়িক বিজ্ঞানে নতুন যে সব

ঘটনা ঘটেছে সে সব ব্যাপারে উনি আলোচনা করলেন। কখনও ডি এন এ, আর এন এ নিয়ে, কখনও মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে অথবা কসমোলজি।

কিছুক্ষণ কথা বলার পর বললেন, আজকাল সব কথা এক সঙ্গে মনে পড়ে না। এক জায়গায় বসে বেশিক্ষণ কথাও বলতে পারি না।

তবু মনে হয়েছে, ওঁর কৌতূহলের যেন শেষ নেই। শুধু বিজ্ঞানে নয়, পৃথিবীর যা কিছু ঘটনা, সব কিছুতেই তখনও ওঁর সমান আগ্রহ।

বসু বিজ্ঞান মন্দিরের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডঃ তারিণী ভদ্র পরে কথা প্রসঙ্গে আমার কাছে একবার মন্তব্য করেছিলেনঃ আমরা ছাত্র অবস্থা থেকেই দেখে আসছি, স্যারের সব কিছুতেই জানার আগ্রহ সমান। এখনও তাঁর কাছে গিয়ে বসলে বর্তমান বিজ্ঞান এবং আরও সব নানা বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমরা কথা বলি। এখনকার ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে আমাদেরও নানা রকম প্রশ্ন করেন তিনি।

হ্যাঁ, ইনিই অধ্যাপক দেবেন্দ্রমোহন বসু। জন্ম ২৬ নভেম্বর, ১৮৮৫। যখন সাক্ষাৎকার নিই তখন তাঁর বয়েস ৮৮। এ বয়েস দৈহিক ভারাক্রান্তের যে হবে, বলাই বাহুল্য। কিন্তু নতুন কিছু জানার ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ তখনও তরুণ।

কলকাতায় বসু বিজ্ঞান মন্দিরের পাশে ওঁর নিজের বাড়িতে একান্ত এক পরিবেশে কথা বলছিলাম। কথার ফাঁকে এক সময়ে বললেন, আমি এমন কিছু বড় কাজ করিনি যে আমার নাম হবে। আমার তো কোন আউটস্ট্যাণ্ডিং কনট্রিবিউশন নেই। এক সময়ে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের দায়িত্ব পড়েছিল আমার ওপর। কী ভাবে আচার্যের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী কাজ করা যায় শুধু সে দিকেই আমার একমাত্র নজর ছিল।

বলা বাহুল্য, অধ্যাপক বসুর হয়ত এটা বিনয়। রবীন্দ্রনাথ, আচার্য জগদীশচন্দ্র অথবা ভগিনী নিবেদিতার সমসাময়িক যুগে ভদ্রতার যে প্রতীক একদিন বাঙালীর জীবনকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিয়েছিল, দেবেন্দ্রমোহন সেই প্রতীকেরই ধারক বলে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের ব্যাপারে তিনি অত বেশি সযত্ন। এবং সংযত! আজকের দিনে যা একান্তই বিরল ঘটনা।

অধ্যাপক বসু বললেন, যখন বসু বিজ্ঞান মন্দিরে পরিচালক হয়ে এলাম, তখন উদ্ভিদ বিদ্যা, রসায়ন, পদার্থ বিজ্ঞান এ সব বিষয়ের ওপর সুষ্ঠু এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ

গবেষণার ধারা সেখানে ছিল না। কিন্তু এ কথা তো ঠিক, আজকের দিনে কোন প্রবলেমই কোন একটি বিশেষ দিক থেকে সমাধান করা যায় না? আচার্যই অবশ্য এই বিশ্বাস এখানে প্রোথিত করার চেষ্টা করেন। বসু বিজ্ঞান মন্দিরের উদ্দেশ্য ছিল 'লাইফ সায়ান্স' অর্থাৎ জীবন বিজ্ঞানের উপর গবেষণা। কিন্তু সে গবেষণা করতে গেলে রসায়ন, পদার্থ বিজ্ঞান সব কিছুরই তো সাহায্য চাই। এখানে কাজে যোগ দিয়ে পারস্পরিক সম্পর্ক রেখে প্রাণী বিজ্ঞান এবং উদ্ভিদ বিজ্ঞানের সঙ্গে এই সব দিকগুলিও গড়ে তোলার চেষ্টা করি যাতে করে প্রাণী এবং উদ্ভিদ বিজ্ঞানের যে কোন সমস্যার সমাধান বা তাদের ওপর নতুন কোন গবেষণা চালাতে গেলে রসায়ন বা পদার্থ বিজ্ঞানের যে সব সাহায্যের প্রয়োজন এই বিজ্ঞান মন্দিরেই সে সব পাওয়া যায়। এর ফলে পদার্থ বিজ্ঞান এবং রসায়নের ওপরও একটা সুষ্ঠু গবেষক দল এখানে গড়ে ওঠে।

ভারতে ঠিক এইভাবে গবেষণা পরিচালনার ব্যাপারে অধ্যাপক দেবেন্দ্রমোহন বসু অন্যতম এক পথিকৃৎ। মন্তব্য করেছেন জনৈক বিজ্ঞানী।

জন্ম বাংলা দেশের ময়মনসিং জেলার জোসিদি গ্রামে। পিতা মোহিনীমোহন বসু ভারতীয় হিসেবে যিনি প্রথম মার্কিন দেশে পাড়ি দিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় শিক্ষালাভ করে এ দেশে ফিরে চিকিৎসার ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করেন। কাকা আনন্দমোহন বসু প্রথম ভারতীয় র‍্যাংলার এবং গণিতে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাইপস। মা আচার্য জগদীশ বসুর কনিষ্ঠা ভগিনী। শৈশবে পিতৃবিয়োগ ঘটে। আচার্যেরও কোন সন্তানাদি ছিল না। ফলে ছেলেবেলা থেকেই দেবেন্দ্রমোহন আচার্যের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পান।

প্রাথমিক শিক্ষার শুরু ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে। এবং ছেলে বয়েসেই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রবীন্দ্রনাথ, লোকেন পালিত, সরলা দেবী, চারুচন্দ্র দত্ত, ভগিনী নিবেদিতার মত মনস্বীর সাহচর্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন। এই সময়ে আরও একটি ব্যক্তিত্ব তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। তিনি সুইডিস পণ্ডিত এম হ্যামারগ্রেন। হ্যামারগ্রেন রাজা রামমোহন রায় এবং ব্রাহ্ম সমাজের উপর তথ্য সংগ্রহের জন্যে কলকাতায় এসেছিলেন। তিনিই দেবেন্দ্র-মোহনকে ইউরোপীয় মনীষী গ্যেটে, শিলার, ইবসেন প্রভৃতির ব্যাপারে

আগ্রহান্বিত করে তুলেছিলেন। ছেলে বয়েস থেকে শরীরচর্চার ওপরও তাঁর আগ্রহ বড় কম ছিল না। উত্তরকালে কলকাতার বিশিষ্ট ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে ভূমিকা এবং ওই ক্লাবের ক্রিকেট টিমের অধিনায়কত্ব তারই নিদর্শন।

কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে বি এস-সি শ্রেণীতে ভর্তি হলেন ভূবিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে। তার আগে এনট্রান্স পরীক্ষার পালা চুকিয়েছিলেন সিটি স্কুল থেকে। এই বি এস-সি পড়ার সময়ই আচার্য জগদীশচন্দ্রের 'প্রাণ এবং নিষ্প্রাণ'-এর অস্তিত্ব সম্পর্কিত সাড়া-জাগান গবেষণা তাঁকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল। এর পর থেকেই দেবেন্দ্রমোহন মনে-প্রাণে একজন পদার্থ বিজ্ঞানীতে রূপান্তরিত হয়ে যান।

১৯০৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থ বিজ্ঞানে এম এ পাশ করে মামা জগদীশচন্দ্র বসুর কাছে এক বছর গবেষণার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। অতঃপর ১৯০৭ সালে কেমব্রিজের ক্রাইসট কলেজে যোগদান। এখানে বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার জে জে টমসনের সঙ্গে কাজ করার তিনি সৌভাগ্য অর্জন করেন। ১৯১২ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের রয়েল কলেজ অব সায়ান্স থেকে পদার্থ বিজ্ঞানে অনার্স সহ বি এস-সি ডিগ্রি লাভ।

১৯১৪ সালে উচ্চ শিক্ষার জন্যে দেবেন্দ্রমোহন জার্মানিতে যান। জার্মানিতে থাকার সময় প্লাঙ্ক, আইনস্টাইন প্রমুখ বিশ্ববিজ্ঞানীদের বক্তৃতা তাঁকে পদার্থ-বিজ্ঞানের নতুন চিন্তাধারায় বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ১৯১৯ সালে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডি ডিগ্রি লাভ, এবং ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগে ঘোষ-অধ্যাপকের পদ গ্রহণ। ১৯৩৫ সালে নোবেল বিজ্ঞানী সি ভি রামন কলকাতা ছেড়ে চলে গেলে তিনি পালিত অধ্যাপক পদে বৃত হন। ১৯২৭ সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস এবং পদার্থবিজ্ঞান শাখার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। এবং এই ভাবে বিজ্ঞান সংগঠক হিসেবে দেবেন্দ্রমোহনের ভূমিকা ক্রমে প্রবৃদ্ধ হতে শুরু করে। উল্লেখ্য, অধ্যাপক বসু স্বর্গত ডঃ শিশিরকুমার মিত্রের ডক্টরেট-গবেষণা পত্রের অন্যতম পরীক্ষক।

স্যার নীলরতন সরকারের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী নলিনী সরকারের সঙ্গে তিনি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন তাঁর প্রথম ইউরোপ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর। সেটা ১৯১৯।

'কিন্তু গবেষক হিসেবে অধ্যাপক দেবেন্দ্রমোহন বসুর ভূমিকা অনেক বেশি ব্যাপক', মন্তব্য করেছেন তাঁর জনৈক ছাত্র। 'তিনি মুখ্যত পদার্থ বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল সবজায়গাতেই যেন তাঁর অবাধগতি।'

যেমন ?

অধ্যাপক বসুর বিজ্ঞানী জীবনকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। এক, উইলসন ক্লাউড চেম্বারের সাহায্যে পরমাণু কণার পারস্পরিক সংঘর্ষ এবং বিভাজন জনিত ঘটনাবলী। এবং নিজস্ব পদ্ধতিতে ফটোগ্রাফিক ইমালশন বা প্রলেপের সাহায্যে মিউ-মেসন কণার ভর নির্ণয়। দুই, প্যারাম্যাগনেটিক এবং রেয়ার-আর্থ অয়নের সরল এবং জটিল যৌগের ধর্মাবলম্বি নির্ণয়ে অনুসন্ধান, বোহর-এর ম্যাগনেটনের পরিপ্রেক্ষিতে ম্যাগনেটিক মোমেণ্টের ব্যাখ্যা, ফটোম্যাগনেটিক এফেকট্ বা আলোক চৌম্বকীয় ক্রিয়া, প্রভৃতি। তিন, আচার্য জগদীশচন্দ্রের উদ্ভিদ-শারীর বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণার উপর কাজকর্ম।

ক্যাভেনডিস গবেষণাগারের ছাত্র হিসেবে সি টি আর উইলসনকে তিনি ক্লাউড চেম্বার তৈরি করে অয়নকারী কণার গতিপথ নির্ণয়ে পরীক্ষা করতে দেখেছিলেন। পরে বার্লিনে থাকার সময় অধ্যাপক রেগেনার (Regener) তাঁকে নতুন ধরনের উইলসন চেম্বার তৈরি করার কাজে মনোনিবেশ করতে বলেন। এই চেম্বারের সাহায্যে অধ্যাপক বসু হাইড্রোজেন পরমাণুর গায়ে আলফা-কণা সংঘর্ষ করার পর যে সব প্রোটোন কণা সৃষ্টি হয় তাদের ছবি তুলতে সমর্থ হন। ওই সময়ে ডেলটা কণার উপরও তিনি গবেষণা চালিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, বিশেষ ধরনের এই কণার আবিষ্কার তখন সাম্প্রতিকতম ঘটনা। আবিষ্কারক বুমস্টেড। কলকাতায় ফিরে এসে তিনি ডঃ এস কে ঘোষের সঙ্গে তেজস্ক্রিয় পরমাণুকেন্দ্র নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এ সময়ে তাঁর প্রকাশিত একটি গবেষণা পত্র প্রখ্যাত বিজ্ঞানী লর্ড রাদারফোর্ড কর্তৃক উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পেয়েছিল।

১৯৩৮ সালে ভারতে ফটোগ্রাফিক ইমালশনের সাহায্যে মেসন কণার ভর নির্ণয়ের জন্যে দেবেন্দ্রমোহনই প্রথম পরীক্ষামূলক গবেষণায় হাত দেন।

'ঠিক পদ্ধতিতেই কাজ করছিলেন তিনি', আর একজন ছাত্রের মন্তব্য, 'মেসনের যা ভর বের করেছিলেন মোটামুটিভাবে তা নিখুঁতও হয়েছিল। আরও নিখুঁত করা যেত। কিন্তু গেল না। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। এদেশে

নিখুঁত ফটোগ্রাফিক প্লেট তৈরি হয় না। আনতে হয় বিলেত থেকে। যুদ্ধের দরুণ আনান গেল না। অতএব কাজ অসমাপ্তই থেকে গেল। পরে ওই একই পদ্ধতিতে কাজ করে ওই একই কাজের ওপর পাওয়েল নোবেল প্রাইজ পেলেন।' পাওয়েল অবশ্য অধ্যাপক বসুর কাজের স্বীকৃতি দিয়েছেন।

মিউ মেসনের কথা তুলতেই হাসলেন ৮৮ বছরের প্রবীণ বিজ্ঞানী। সেই একই মৃদু হাসি। হতাশার? জানি না। সে হাসি এতই নির্বিকল্প যার অর্থ করা শক্ত। তারপর সহজ সুরে মন্তব্য করলেন: 'গবেষণার যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম নিজেরা তৈরি না করতে পারলে কোন দেশই গবেষণার কাজে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে না। পরের দিকে চেয়ে থাকলে পথ চলবে কী করে।'

এর জন্যেই বসু বিজ্ঞান মন্দিরে একটি ট্র্যাডিশন তিনি গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। সেটা হল নিজের যন্ত্র নিজে তৈরি করতে হবে। সে ব্যাপারে বসু বিজ্ঞান মন্দির ভারতে অনেকগুলি 'প্রথম দৃষ্টান্ত' স্থাপনের গৌরব অর্জন করেছিল। ভারতে প্রথম ককক্রফট ওয়ালটন যন্ত্র তৈরি করেছিলেন বসু বিজ্ঞান মন্দিরের বিজ্ঞানীরা। উইলসন চেম্বারও তৈরি করেছিলেন তাঁরাই।

বিখ্যাত 'বোস-স্টোনারল' তাঁর কাজের এক আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি।

বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ডাইরেকটরের পদ গ্রহণ করার পর এই গবেষণাগার যাতে তাত্ত্বিক এবং ফলিত উদ্ভিদ বিজ্ঞানে দেশের শ্রেষ্ঠতমের আসন লাভ করে সেই ভাবেই এর বিভিন্ন বিভাগের পুনর্বিন্যাস করেন তিনি। শুধু করা নয় এখানকার প্রতিটি কাজের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িতও হন। ওই সময়ে শুধু এ দেশে নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও বসু বিজ্ঞান মন্দিরের গবেষণা বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছিল। এবং সবচাইতে বড় কথা যে, কোন গবেষণায় হাত দেবার আগে কয়েকটি ব্যাপারের ওপর তিনি ভীষণ নজর রাখতেন। এক, যে গবেষণাটি করা হবে, তার প্রয়োজনীয়তা কতখানি। দুই, গবেষণা কাজ চালানর মত ক্ষমতা কতখানি আছে। তিন, গবেষণালব্ধ ফলাফল শুধু গবেষণাগারের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বৃহত্তর জনস্বার্থে তা কাজে লাগুক।

'তিনি যে সব যন্ত্রপাতি তৈরি করাতেন তাদের মধ্যে যেগুলি সাফল্যমণ্ডিত হত, তিনি চাইতেন দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি এগিয়ে এসে সেগুলি তৈরি করুক। বসু বিজ্ঞান মন্দিরে তৈরি অনেক যন্ত্রপাতি কোন কোন প্রতিষ্ঠান বাণিজ্যিক পদ্ধতিতে উৎপাদনও করেছেন বা করছেন। তবে এ কাজ আরও ব্যাপক

হোক। এতে গবেষণার যন্ত্রপাতির ব্যাপারে দেশ অন্তত স্বাবলম্বী হতে পারে!' আর একজন ছাত্রের মন্তব্য।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর মৃত্যুর পর দেবেন্দ্রমোহন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালিত অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ডাইরেকটারের পদ গ্রহণ করেন। এখানে আসার পর তৈরি করেন 'উইলসন ক্লাউড চেম্বার'। বলা বাহুল্য, তিনিই প্রথম ভারতীয় বিজ্ঞানী যিনি পরমাণু বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণায় ভারতে প্রথম 'উইলসন চেম্বার' ব্যবহারের গৌরব অর্জন করেছিলেন।

বিজ্ঞানী এবং প্রশাসক হিসেবে অধ্যাপক দেবেন্দ্রমোহন বসু তাঁর ছাত্র মহলে কতখানি রেখাপাত করতে পেরেছেন? সরাসরি এই প্রশ্নটিই তুলে ধরেছিলাম অধ্যাপক বসুর কৃতি ছাত্র অধ্যাপক আনন্দমোহন ঘোষের সামনে। অধ্যাপক ঘোষ বসু বিজ্ঞান মন্দিরের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের তখন প্রধান।

আমার প্রশ্নে অধ্যাপক ঘোষেরও সরাসরি উত্তর:

আমি তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্-স্নাতক শ্রেণীর ছাত্র, অধ্যাপক দেবেন্দ্রমোহন বসু আমার পরীক্ষক। আমাদের ব্যক্তিগত পরিচয়ের সে-ই সূচনা। তিনি পাঠ্যসূচীর নানান খুঁটিনাটি প্রশ্ন করলেন সন্তর্পণে। সযত্নে। বুঝলাম ফাঁকি দেবার কোন সুযোগ এখানে নেই। তবু বলব, সেদিন ওঁর প্রশ্নগুলি আমার মনে বরং আত্মবিশ্বাসই জাগিয়ে তুলেছিল। ফলে আমার মনে নিজেকে উন্মুক্ত করার ব্যাপারে কোন কুণ্ঠা বা ভয় জাগে নি। তিনি প্রশ্ন করলেন আমার পাঠ্য বিষয়ের উপর। তারপরই জিজ্ঞাসা, পরীক্ষার পর আমি কি করতে চাই? অথবা তখনই গবেষণার ব্যাপারে আমি কৌতূহলী কী না? ছাত্রকে পরীক্ষা করতে এসে তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এত সচেতনতা এবং তার জন্যে ব্যক্তিগত সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসা, অধ্যাপক বসুর চরিত্রের এই বিশেষ দিকটির সঙ্গে এই প্রথম পরিচয় ঘটল।

পরে বসু বিজ্ঞান মন্দিরে যোগ দিয়ে দেখলাম তাঁর প্রত্যেক কাজকর্মের মধ্যে একটা অদ্ভুত শৃঙ্খলতা এবং সংযম সর্বত্র। দেশ বিদেশের যত রকম বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা পত্র তাঁর হাতে আসত সেগুলি তিনি খুঁটিয়ে পড়ে নিতেন, সেই সব পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের সারবস্তু নোট করে রাখতেন, তারপর ছাত্র এবং গবেষকদের যাকে কাছে পেতেন পড়তে দিতেন। ফলে গবেষণার নতুন প্রবলেম সম্পর্কে সবাই অনায়াসে সচেতন হয়ে উঠত। এ ছাড়া প্রত্যেক দিন

গবেষণাগারে কম করেও তু'বার এসে ঘুরে দেখতেন, কে কী কাজ করছেন, কারোর কোন অসুবিধে হচ্ছে কী না। বাইরের কোন ছাত্র বা বিজ্ঞানী এলে জিজ্ঞেস করতেন, তোমরা কী ধরনের কাজ করছ? অপরের কাজের ব্যাপারে তাঁর এমনই কৌতূহল ছিল।

আর ছাত্রদের সঙ্গে সম্পর্ক? সেটা সব সময়ই ছিল অকপট। কখনও কখনও গবেষণার কোন প্রবলেম-এর ব্যাপারে ছাত্রদের তিনি খোলাখুলি জিগ্যেস করতেন। দেখ তো, এ জায়গাটা বুঝতে পার কি না? পরীক্ষা করা নয়। নিজের মনে কোন প্রশ্ন জাগলে ছাত্রদের সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করে তিনি মীমাংসায় পৌঁছনর চেষ্টা করতেন। এই উন্মুক্ত মনোভাব আজকের দিনে বিরল।

প্রশাসক হিসেবে তিনি প্রচণ্ড নিয়মানুবর্তিতার পক্ষপাতী। এর জন্যে কখনও কখনও মতভেদ ঘটেছে। কিন্তু সে সব ব্যাপার কখনই তিনি ব্যক্তিপর্যায়ে টেনে আনেন নি। আমরা দেখেছি, বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ইলেকট্রিক বিল থেকে শুরু করে ডক্টরেটের থিসিস, সব কিছুর ওপর তাঁর দৃষ্টি সজাগ। অত কাজের ফাঁকেও তাঁর ছাত্র বা গবেষকরা কে কোথায় কী ধরনের কাজ করছেন, তার সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যাপারে তিনি খোঁজ রাখতেন। গবেষকরা স্বাবলম্বী হোক, নিজের যন্ত্র নিজে তৈরি করুক, আচার্য জগদীশচন্দ্রের এই আদর্শের উত্তরসূরী হিসেবে অধ্যাপক বসুর ভূমিকার দৃষ্টান্ত খুবই বিরল।

তাঁর আরও একটি মস্ত গুণ, যে কোন আলোচনা চক্রের সারমর্ম বা 'সাম-আপ' করার অপূর্ব দক্ষতা।

২ জুন, ১৯৭৫। সকাল প্রায় ছয়টায় অধ্যাপক দেবেন্দ্রমোহন বসু তাঁর কলকাতার বাসভবনে পরলোকগমন করলেন। কয়েক বছর ধরেই তাঁর শরীরের অবস্থা ভাল যাচ্ছিল না। ১৯৭৪-এর মার্চ মাসে মৃদু হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার দরুন মাঝে বেশ খানিকটা দুর্বলও হয়ে পড়েছিলেন। তবু তারই মাঝে নিয়মিত পড়াশুনাও চলছিল। ওঁর বড় ছেলে শ্রীদেবব্রত বসু বললেন, শরীরের দিক দিয়ে আমার মা যেমন চিরদিনই সবল, তুলনায় বাবা অনেক বেশি দুর্বল। মা'র শরীরের জোর ছিল। বাবার জোর ছিল মনের। এই তো মাত্র মাস তিন চার আগে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের পদার্থবিজ্ঞানী ডঃ তারিণী ভদ্র ইংলণ্ডে আলট্রাসোনিকস-এর ওপর একটি আলোচনাচক্রে যোগ দিতে যাওয়ার আগে

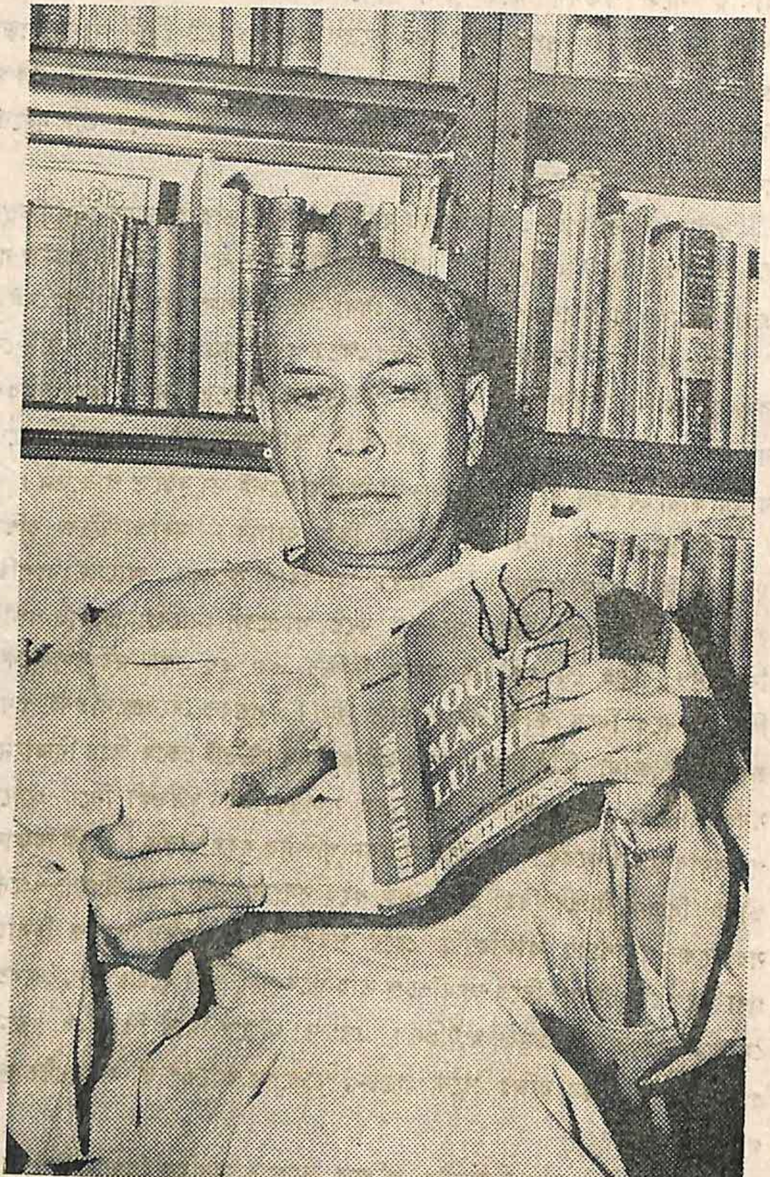
বাবার সঙ্গে কতক্ষণ ধরে কথা বললেন, সে তো আমি দেখেছি। আলট্রাসোনিকস-এর ওপর লেখা ডঃ ভদ্রের গবেষণাপত্রটি তিনি আগাগোড়া শুনলেন। বিশদ আলোচনা করলেন। শরীর তখনও ওঁর দুর্বল। কিন্তু বিজ্ঞানের ওপর আলোচনার সুযোগ পেলেই মনের দিক দিয়ে উনি মুহূর্তে যেন তরুণ হয়ে উঠতেন।

প্রবীণ দেবেন্দ্রমোহন যেন সমাধিস্থ ব্যক্তিত্ব। কিন্তু তার আড়ালে ছিল ভিসুভিয়াসের মত একটি নিশ্চুপ মন। বড় বিজ্ঞানী কাকে বলে? দশটা প্রাইজ বা একটি নোবেল পুরস্কারের প্রাপককে? সেখানেও তো পক্ষপাতিত্বের শেষ নেই!

না, অধ্যাপক দেবেন্দ্রমোহন বসুর ক্ষেত্রে এসব কথা খাটে না। তিনি যে কতবড় বিজ্ঞানী তাঁর সান্নিধ্যে না এলে কেউ বুঝতে পারতেন না। এবং আরও বড় কথা, তিনি মানবিকতারও এক প্রতীক। 'ফাইননেস অভ এ ম্যান' বলতে যা বোঝায়, যে কেউ তাঁর কাছে কিছুক্ষণ বসে থাকলেই তা বুঝতে পারতেন।

দেবেন্দ্রমোহনের গবেষণার বিস্তৃতি ছিল ব্যাপক। মহাজাগতিক রশ্মির মধ্যে তিনিই প্রথম মেসনকণার অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। আগেই বলেছি, উত্তরকালে এর ওপর বিশদ গবেষণা করে পাওয়েল নোবেল পুরস্কার পান। বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রকে এক সময়ে বিচ্ছিন্ন এবং এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে ধরে নিয়ে কাজ করার রীতি ছিল। সম্ভবত দেবেন্দ্রমোহনই প্রথম ভারতীয় বিজ্ঞানী যিনি ব্যাপকভাবে এই প্রচলিত রীতিটি ভেঙ্গে দিয়ে বিজ্ঞানের সমস্ত ক্ষেত্রই যে পারস্পরিক যুক্ত এবং সম্পূরক, এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এদেশে গবেষণার সূচনা করেন। এই দৃষ্টিভঙ্গী এখন পৃথিবীর সর্বত্র স্বীকৃত। প্রাণী বিজ্ঞান, জীবাণু বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিদ্যা থেকে শুরু করে রসায়ন এবং পদার্থবিদ্যা—এদের সবাইকে পরস্পরের কাছাকাছি রেখে পরস্পরকে পরস্পরের সম্পূরক হিসাবে গণ্য করে যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে জগদীশচন্দ্র তাঁর গবেষণায় ব্রতী হয়েছিলেন, দেবেন্দ্রমোহনের হাতে তার উত্তরণ ঘটেছিল। এবং তা ঘটাতে গিয়ে তিনি যে ধরনের প্রশাসনিক দৃষ্টান্তের নজির রেখে গেছেন, অনেকের কাছেই তা অনুকরণীয় হয়ে থাকবে।

মুষ্টিমেয় যে কয়জন বিজ্ঞানীর কৃতিত্বে ভারতে আধুনিক বিজ্ঞান চিন্তা এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার সূত্রপাত, বলা বাহুল্য, দেবেন্দ্রমোহন ছিলেন তাঁদের 'শেষ জন'।



নির্মলকুমার বসু

নির্মলকুমার বস্থ

একটি পূর্ণ পরিচ্ছেদের পরিসমাপ্তি।

শেষের দিকে ওঁর শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না। অবশেষে শুনলাম ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছেন। এবং এই কালব্যাধিই শেষ পর্যন্ত একটি পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বের পরিসমাপ্তি ঘটাল। রবিবার ১৫ অকটোবর, ১৯৭২ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এবং আধুনিক ভারতীয় নৃবিজ্ঞানের জনক অধ্যাপক নির্মলকুমার বস্থর মহাপ্রয়াণ!

মনে পড়ে, বছর দেড় আগে কলকাতায় তাঁর বাগবাজারের বাড়িতে বসে আমার সঙ্গে এক একান্ত সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে যখন কথা বলছিলেন, তাঁকে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ মনে হয়েছিল। রাজনৈতিক এবং নানা কারণে শহর কলকাতা তখন অস্থির। প্রচণ্ড হতাশায় নগরজীবন তখন প্রায় ভেঙ্গে পড়েছে। কিন্তু অদ্ভুত দূরদর্শী এবং অনুসন্ধিৎস্থ অধ্যাপক নির্মলকুমারকে এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে বললে তিনি বললেন, আমাদের তরুণ সমাজ সম্পর্কে হতাশ হওয়ার কারণ নেই। আমি দেখেছি অনুপ্রেরণার মত অবস্থা হলেই ওরা যথেষ্ট সাড়া দেয়। আমাদের সমাজে প্রচুর সমস্যা রয়েছে, যাদের অনুসন্ধানের দায়িত্ব সমাজবিজ্ঞানীর। তার জন্যে প্রয়োজন যথাযথ 'টেকনিকেল কমপিটেন্স'। এদেশে তার বড়ই অভাব। আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার সত্যিকারের বিবর্তনের ধারাটি বুঝতে পারলে তবেই সম্ভব সার্বিক মঙ্গলের উদ্দেশ্যে স্থষ্ঠু জাতীয় পরিকল্পনার রূপায়ন। অথচ যে দেশে চুয়ান্ন কোটি লোকের বাস সে দেশে চুয়ান্ন জন প্রথম শ্রেণীর সমাজ-বিজ্ঞানী খুঁজে বের করা শক্ত। অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে এ ধরনের মন্তব্য করেছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রবীণ সমাজ-বিজ্ঞানী এবং নৃতত্ত্ববিদ অধ্যাপক নির্মলকুমার বস্থ। ওঁর বক্তব্য, দৈনন্দিন কার্যসূচীর মধ্যে, সেটা যত সামান্যই হোক, একটা বৈজ্ঞানিক মনোভাব থাকা দরকার। আমাদের মস্ত বড় অভাব এখানেই।

প্রসঙ্গক্রমে অধ্যাপক বস্থ ১৯৫২ সালের জানুয়ারি মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত সায়েন্স কংগ্রেসে জীববিদ্যার উপর অধ্যাপক জে. বি. এস. হলডেনের বক্তৃতার একটি অংশ উল্লেখ করলেন। ওই বক্তৃতায় হলডেন মন্তব্য করেছিলেন, প্রত্যেক

দেশের বিজ্ঞানীদের বিশেষ একটি দায়িত্ব আছে। সেই দেশের বা মানব-সমাজের কল্যাণ সম্পর্কে তাঁদের অবহিত থাকতে হবে। প্রয়োজনে গবেষণার ধারা কতকাংশে তারই প্রয়োজনের নিমিত্তে নিয়ন্ত্রিত হবে।

প্রশ্ন করেছিলাম, অনুগ্রহ করে ব্যাপারটা একটু বিশ্লেষণ করুন, অধ্যাপক বসু।

ওঁর উত্তর: তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মধ্যে আমি যাচ্ছি না। হলডেনের কাছ থেকেই ঠিক যেভাবে জেনেছিলাম, সেইভাবেই বলছি। সেটা ১৯৫৮। তখন আমি 'অ্যানথ্রোপোলজিকেল সারভে'-র অধ্যক্ষ। অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ এবং তাঁর সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা নির্মলকুমারীর সহযোগিতায় হলডেনের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটার সুযোগ হল। কথা প্রসঙ্গে হলডেন মন্তব্য করলেন, জীববিজ্ঞানের কথাই ধরুন। এদেশে এর উপর তো অনেক রকম গবেষণাই করা যায়। প্রচুর সমস্যা আশেপাশে পড়ে রয়েছে। কিন্তু কার্যত দেখতে পাচ্ছি, আপনারা যা নিয়ে গবেষণা করছেন, তারা জীবন থেকে আসে নি। এসেছে বই থেকে। হলডেন তখন চারটে জিনিসের 'জেনেটিকস' বা প্রজনন বিজ্ঞানের উপর কাজ করছিলেন— ধান, নারকেল, হাঁস এবং তসরের গুটি। বললেন, তসরের গুটির ব্যাপারটা জানার জন্যে মানভূমে যাব। সেখানকার সাঁওতাল অধিবাসীদের মধ্যে তসরের চল অনেক বেশি। ওদের মধ্যে এর উপর একটা শিল্পও গড়ে উঠেছে অনেককাল থেকে। দেখব, তসর খারাপ হয়ে গেলে অর্থাৎ তসরের গুটি থেকে যে সুতো হয় তার উৎকর্ষ যখন কমে যায়, সাঁওতালরা কী করে। মানভূমের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে ওদের সঙ্গে কথা বললেন হলডেন। ওরা জানাল, সুতো খারাপ হতে শুরু করলেই কিছু কিছু গুটি ওরা দূরের কোন জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আসে। একটা নির্দিষ্ট সময় পর সেখান থেকেই তারা সংগ্রহ করে নতুন গুটি পোকা। অর্থাৎ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, যে সমস্ত গুটি পোকার ওরা চাষ করে, তাদের উর্বরাশক্তি কমে গেলে, যখন তাদের তারা দূরের কোন জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আসে, পোকাগুলি বড় হওয়ার পর ঐ অঞ্চলে বসবাসকারী উচ্চ-উর্বরাশক্তির পোকার সঙ্গে তারা মিলিত হয়। ফলে তখন তাদের যে সমস্ত বাচ্চা হয় তাদের গুটি তৈরির ক্ষমতা আবার বেড়ে যায়। অথচ প্রজননগত এই যে সমস্যা, সাঁওতালরা তার সমাধান না জেনেই করে থাকে। বিজ্ঞানীদের উচিত ওদের ওই জ্ঞানটাকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুশীলন করে আরও উন্নত করে তোলা। ধান, নারকেল প্রভৃতির ব্যাপারেও একথা খাটে। আমার বক্তব্য, আমাদের

পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে বিজ্ঞানের একটা একাত্ম সংযোগ রাখা প্রয়োজন। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার রীতিনীতিগুলি এবং তাদের কার্যকারণ সম্পর্কে যথাযথ তথ্য সংগ্রহ করে বিজ্ঞানসম্মতভাবে তাদের উন্নতি সাধনে ব্রতী হওয়া দরকার।

কথা হচ্ছিল ওঁর ঘরে বসেই। খুবই ব্যস্ত মানুষ। রবিবার দুপুর বারোটা থেকে তিনটে পর্যন্ত। এর মধ্যে এক সময়ে দেখা করার সুযোগ পাওয়া গেল। সময়টা শুনে একটু দমেই গিয়েছিলাম। এক, দুপুর বারোটা থেকে তিনটে। দুই, রবিবার। তিন, তাঁর নিজের বাড়িতে। ছুটির দিনে ঠিক ঐ সময়ে বিশ্রাম না করে কারুর পক্ষে কথাবার্তা চালান কি সম্ভব হবে?

নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্যে আগের দিন অর্থাৎ শনিবার টেলিফোনে কথা বললাম। উনি জানালেন, কোন অসুবিধে হবে না। বারোটার সময় আমি বাড়িতে থাকব।

অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর জন্ম কলকাতায়, জানুয়ারী ২২, ১৯০১। শিক্ষা-ক্ষেত্র পাটনার অ্যাংলো-স্যান্সক্রিট স্কুল, কামারহাটির সাগরদত্ত ফ্রী হাইস্কুল, রাঁচি জেলা স্কুল, পুরী জেলা স্কুল, স্কটিশ চার্চ কলেজ, কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯১৯ সালে বি এস-সিতে ভূ-তত্ত্বের উপর প্রথম শ্রেণীর অনার্স এবং ১৯২৫ সালে নৃতত্ত্বে প্রথম শ্রেণীর এম এস-সি ডিগ্রী লাভ। ১৯৩০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব শাখার ফেলো হিসেবে কাজ করার সময় তিনি লবণ-সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৩৮ সালে উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আমন্ত্রণে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগে সহকারী অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। ১৯৪৫-এ কলকাতা বিজ্ঞান কলেজে মানব-বিজ্ঞানের রিডার, ১৯৫৯-৬৪ অ্যানথ্রোপলজিকেল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার অধ্যক্ষ। ১৯৬৪তে আসামের পার্বত্য অঞ্চল পর্যবেক্ষক দলের তিনি অন্যতম সদস্য ছিলেন। ১৯৬৭ সালে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলের শিক্ষাসমস্যা সম্পর্কিত তাঁর প্রতিবেদনটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৮ সালে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং প্রফেসর, ১৯৫৯-এ শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগে। পরে উইসকনসিন এবং মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় সমাজ ও কৃষ্টির বিবর্তনের উপর বক্তৃতা দেন। এছাড়াও মেক্সিকো বিশ্ববিদ্যালয়, জাপানের হিরোশিমা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতিতেও সমাজ বিজ্ঞানের উপর বক্তৃতা

দেবার জন্যে তিনি আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। ভারতীয় তথা সারা এশিয়ার সমাজ এবং কৃষ্টির উপর অনন্যসাধারণ গবেষণা এবং পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্যে অগণিত দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক সম্মানে ভূষিত হয়েছেন তিনি।

১৯১৬ সালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সংস্পর্শে এসে নানারকম সামাজিক কাজকর্মের সঙ্গে অধ্যাপক বসুর প্রত্যক্ষ সংযোগ গড়ে উঠেছিল। সম্ভবত তখন থেকেই ছিন্নমূল মানব সমাজের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় সম্পর্কের সূচনা। ১৯১৮ সালে তিনি দ্বিতীয় সেণ্ট জনস অ্যাম্বুলেন্স ব্রিগেডের সঙ্গে জড়িত হন এবং এইচ. এস. সোরাবর্দি ও ডঃ কে. এস. রায়-এর সঙ্গে কাজ করেন। ১৯২০ সালে ফিজি, দেমেরারা, ত্রিনিদাদ, মরিসাস এবং দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকে যে সমস্ত ভারতীয় মজুর স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন, তাঁদের যথাযথ পুনর্বাসনের ব্যাপারেও তিনি কাজ করেন। তাঁদের ত্রাণ-শিবিরের যাবতীয় দায়িত্বই ছিল তাঁর উপর। ১৯৩০-এ স্থানীয় মুচী, হাড়ী এবং বাউরি সম্প্রদায়ের লোক নিয়ে বোলপুরে খাদি সংঘ প্রতিষ্ঠা, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পল্লী-সংগঠন বিভাগের সভ্য, ১৯৪৬ সালে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ত্রাণকার্য চালান এবং ঐ বছরেই মহাত্মা গান্ধীর আমন্ত্রণে তাঁর দোভাষী এবং সচিবরূপে নোয়াখালির দাঙ্গাবিধ্বস্ত এলাকা ভ্রমণ মানব সমাজের এক ব্যাপক এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতা যোগাতে তাঁকে সাহায্য করেছিল। সমাজকল্যাণমূলক কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৬৬ সালে তাঁকে 'পদ্মশ্রী' সম্মানে ভূষিত করা হয়।

উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধাবলী: কালচারেল অ্যানথ্রপোলজি ক্যান্যান অব ওড়িশান আর্কিটেকচার, একস্‌কাভেসন ইন ময়ূরভঞ্জ, কালচার অ্যাণ্ড সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া, মডার্ন বেঙ্গল, প্রবলেমস অন ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেসন, সিলেকশনস ফ্রম গান্ধী, স্টাডিজ ইন গান্ধিজম, গান্ধী ইন ইণ্ডিয়ান পলিটিকস, গান্ধিজম অ্যাণ্ড মডার্ন ইণ্ডিয়া। ওঁর বাংলা ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলী: হিন্দু সমাজের গড়ন, নবীন ও প্রবীণ গান্ধীচরিত, স্বরাজ ও গান্ধীবাদ, পরিব্রাজকের ডায়েরি, ভারতের গ্রাম্যজীবন এবং গণতন্ত্রের সংকট। এছাড়াও ১৯৫১ সাল থেকে তিনি 'ম্যান ইন ইণ্ডিয়া' পত্রিকার সম্পাদকরূপে কাজ করছেন।

হ্যাঁ, অভিজ্ঞতা অনেক। মানুষকে তিনি দেখেছেন, জেনেছেন কখনও

একক মানুষরূপে। কখনও গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মানুষরূপে। অঞ্চল বিশেষে তাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। রীতি-নীতির স্বাতন্ত্র্য আছে। তবু তারই মাঝে মানুষের ব্যক্তিক দিকটিকে অস্বীকার করা যায় না। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় বৃত্তির সঙ্গে জাতিপ্রথার সম্পর্ক খোঁজার যাঁরা চেষ্টা করেন আংশিক ভাবে হয়ত তাঁরা ব্যর্থ। অন্তত স্বাধীনতার পর এ ব্যাপারটি নিয়ে আরও সুষ্ঠুভাবে গবেষণা হওয়ার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু হয়নি। পরিণত বয়েসেও এই নিয়ে ভেবেছেন তিনি। ভেবেছেন আঞ্চলিক সমাজব্যবস্থার উপর, সমাজব্যবস্থার সঙ্গে অর্থনৈতিক পরিস্ফুটনের সম্পর্কের উপর, কোন পথে এবং কীভাবে ভারতীয় বিজ্ঞান গবেষণা পরিচালিত হওয়া উচিত, লোকশিক্ষা এবং আরও অনেক অনেক বিষয়ের উপরই তাঁর ভাবনাচিন্তা। বয়েসে প্রবীণ হয়েও দৈহিক এবং মানসিকতার দিক দিয়ে তাঁর তারুণ্যের তুলনা মেলা ভার।

ভারতীয় নৃবিজ্ঞান বিভাগ গত কুড়ি দশক থেকে দেশের সুপ্রাচীন নরকঙ্কাল এবং বিশেষ করে মানুষের মাথার খুলি সংগ্রহ করে এসেছিল, কিন্তু তাদের উপর যথাযথ কোন নৃতাত্ত্বিক গবেষণাই হয়নি। ১৯৬১ সনে অধ্যাপক বসুর প্রচেষ্টায় সেই গবেষণারই বাস্তব সূচনা। ওই বছর নৃতত্ত্ব বিভাগের তিনজন গবেষক শ্রীপবিত্র গুপ্ত, শ্রীপ্রতাপ দত্ত এবং শ্রীঅরবিন্দ বসু তাঁরই উদ্যম এবং পরিচালনায় প্রাচীন হরাপ্পা সভ্যতার নরকঙ্কালের উপর মৌলিক গবেষণা শুরু করেন এবং মাত্র এক বছর পর ১৯৬২ সালে তার ফলাফল প্রকাশ করা হয়। বলা হল, সাড়ে চার হাজার বছরের পুরনো মানুষের চেহারার সঙ্গে সিন্ধু এবং পাঞ্জাব অঞ্চলের বর্তমান অধিবাসীদের তুলনামূলক বিচার করে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখা যায়নি। এ থেকে অনুমান করা হয়েছে, প্রাচীন হরাপ্পা সভ্যতার বিকাশ এবং বিস্তারের পেছনে বহির্দেশীয় প্রভাব তেমন কাজ করেনি। যদি তার উপর বাইরে থেকে কোন আক্রমণ ঘটেও থাকে, তাতে এমন কোন কিছু ঘটেনি যা হরাপ্পার মানুষের মধ্যে সত্যিকারের কোন পরিবর্তন সাধন করতে পারে।

অধ্যাপক বসুই সর্বপ্রথম সারা ভারতে ব্যাপকভাবে সমীক্ষা চালিয়ে ভারত-বাসীর দৈহিক আকৃতিগত বৈচিত্র্যগুলি বিশ্লেষণের কাজে হাত দেন। পরে সারা ভারতের প্রতিটি জেলায় অনুরূপ অনুসন্ধান শুরু করা হয়। বরানগরে অবস্থিত ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকেল ইনসটিটিউটের সহযোগিতায় তাঁর অনুসন্ধানলব্ধ

ফলাফলগুলি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এত বড় নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধান এর আগে আর কখনও করা হয়নি। এই অনুসন্ধানের মূল লক্ষ্য ছিল, কোথায় কী ধরনের মানুষ বাস করে তা জানা, অঞ্চল বিশেষে ভারতীয়দের চেহারার ব্যতিক্রম, একই জাতের (যেমন ব্রাহ্মণ প্রভৃতি) মানুষের মধ্যে অঞ্চল বিশেষে চেহারা বা আচার অনুষ্ঠানে কী ধরনের প্রভেদ রয়েছে তা নির্ণয় করা, বিভিন্ন জাতের মানুষের পারস্পরিক, সামাজিক এবং পারিবারিক সংমিশ্রণের (বিবাহ) প্রভাব সম্পর্কে অবহিত হওয়া।

বস্তুত ভারতের সমাজব্যবস্থার মিশ্ররূপ, তার শতধা বৈচিত্র্য এবং স্বকীয়তা সমাজ-বিজ্ঞানীদের কাছে শুধু বিস্ময় নয়, বড় রকমের একটি সমস্যা। প্রগতি অর্থে যদি বিজ্ঞান, কারিগরি প্রভৃতির উন্নততর প্রকল্প বুঝি, তাহলে ব্যাপারটা বুঝে উঠতে নিশ্চয় অসুবিধে হবে। বরং ওই বিজ্ঞান, কারিগরি, রাজনীতি অথবা অর্থনীতি এদের উপর যত রকমের পরিকল্পনাই আমরা নিয়ে থাকি না কেন, ভারতের সার্বিক সমাজব্যবস্থা এবং প্রতিটি মানুষের উপর তাদের প্রভাব কতটা, সেই প্রভাব জনজীবনের সুখ, শান্তি এবং সমৃদ্ধির জন্যে কতটা কাজ করেছে, এদের খুঁটিয়ে দেখাই তো সমাজ-বিজ্ঞানীদের কাজ। অস্থিরতা সমাজে আজকে আছে, চিরদিনই ছিল এবং থাকবে। কারণ মানব-জীবনের একটি ধারা আছে, নিজস্ব অভিব্যক্তি আছে এবং স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ আছে। অতএব মানুষের কল্যাণ করব বলে যত রকমের তত্ত্বই তার উপর প্রয়োগ করি না কেন, দেখে নেওয়া দরকার সেই তত্ত্ব প্রচলিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কতটা কার্যকর হতে পারে। দুঃখের বিষয়, দীর্ঘকাল দেশ স্বাধীন হয়েছে, এর মাঝখানে অর্থনৈতিক উন্নতির জন্যে কয়েকটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাও প্রায় শেষ হয়ে এল, দেশে বড় বড় কলকারখানা হল, রকমারি স্কুল-কলেজ তৈরি হল, ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ নিয়ে প্রচুর রাজনৈতিক দলও জন্মলাভ করল। কিন্তু যে কারণে এ সমস্ত হয়ে গেল, নিশ্চয় সেটা মানুষেরই কল্যাণে এবং ভারতের মানুষের কল্যাণে। মানুষের আচার আচরণ, তার সংস্কার এবং সংস্কৃতি এদের মধ্যে যথাযথ ভারসাম্য-প্রগতি সৃষ্টির ব্যাপারে ওদের প্রভাব কতটা প্রতিফলিত হয়েছে, সে পরিমাপ এখনও আমরা করে দেখিনি। ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'তোতাপাখীর মত'। পাখী রইল গৌণ বস্তু, খাঁচাই শেষ পর্যন্ত হল প্রধান। ভারতের সমাজ-বিজ্ঞানও এ ব্যাপারে অনেক অনেক পিছিয়ে রয়েছে।

হ্যাঁ, এই হল প্রশ্ন। অধ্যাপক বসুর পড়ার ঘরে গিয়ে হাজির হলাম ঠিক বারোটারই কাছাকাছি। উনিও প্রস্তুত হয়ে ছিলেন। বললেন, একটু বসুন, আমি আসছি। উনি চলে যেতেই একটি মেয়ে ওঁর লেখা কিছু কাগজপত্র দিয়ে গেল। ওগুলি সঙ্গে সঙ্গে মোটামুটিভাবে দেখে নিলাম। ছিল কয়েক খণ্ড 'ম্যান ইন ইণ্ডিয়া'র 'জাতি এবং অস্পৃশ্যতার' উপর প্রবন্ধ, পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থার উপর কারিগরি প্রকল্পের প্রভাব প্রভৃতির উপর তাঁর লেখা। মুশকিল হল, প্রত্যেকটি বিষয়ই মানব-বিজ্ঞানেরই পর্যায়ভুক্ত, কিন্তু এত বেশি ব্যাপক এবং বিস্তৃত যে সীমিত সময় এবং পরিসরের মধ্যে তাদের ন্যূনতমভাবে উপস্থিত করাও শক্ত। তবু তারই মধ্যে থেকে অধ্যাপক বসুর সঙ্গে মোটামুটিভাবে যে সমস্ত বিষয় আলোচনা করেছিলাম এখানে তা উদ্ধৃত করছি।

অধ্যাপক বসু বললেন, প্রতিদিনের কার্যাবলীর সঙ্গে বিজ্ঞানের সংযোগ চাই। এই বিজ্ঞান বলতে আমি ফিজিক্স, কেমিস্ট্রির আবিষ্কারের কথা বলছি না, বলছি মানুষের কথা। একটা বিজ্ঞানসম্মত প্রবণতা না থাকলে কোন সমস্যার সমাধানের দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব কি? গান্ধীজির মধ্যে এটা ছিল। কিছু মনে করবেন না, আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি। একবার পশ্চিম ভারতের এক জায়গায় কোন কারখানার কর্মীরা ধর্মঘট করলেন। পরে মধ্যস্থতার জন্যে তাঁরা হাজির হলেন গান্ধীজির কাছে। গান্ধীজি তাঁর একান্ত সচিবকে বললেন, পুরো ব্যাপারটা জেনে নিয়ে যেন তিনি তাঁকে জানান। কিন্তু উভয় পক্ষের কথাবার্তা শুনে তিনি দেখলেন, ধর্মঘটীরা তাঁকে যে সমস্ত তথ্য সরবরাহ করেছিলেন তার মধ্যে আংশিক সততার সাক্ষ্য মিলল। ওঁরা ঠিক সেই সব তথ্যই তাঁর কাছে বলেছিলেন যেগুলি ওঁদের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারেই শুধু কাজ করতে পারে। কিন্তু প্রতিপক্ষ এবং নিজেদের ত্রুটি সম্পর্কে যেটুকু বক্তব্য ছিল তা আর প্রকাশ করেননি। এখানেই সমাজ-বিজ্ঞানীর দায়িত্ব। গবেষণাগারের সীমিত গণ্ডীর মধ্যে সততা সম্পর্কে আমরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করব, অথচ সাধারণের ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ করার ব্যাপারে আমরা কোন 'ভেরিফাই' করি না। দেখুন, যাকে আমরা 'সত্য' আখ্যা দিই সেটা আসলে বাস্তব ঘটনাবলীকে খুঁজে বের করার ক্ষমতা। তবে এই প্রসঙ্গে এটাও বলব, প্রচলিত ঐতিহ্য বা ট্রাডিশনকে শ্রদ্ধা করতেই হবে। আজকের দিনে যখন একশ রকমের পথ আছে তখন তাদের যাচাই করব না কেন?

এই প্রসঙ্গেই অধ্যাপক বসু বিজ্ঞান-গবেষণার ব্যাপারে প্রচলিত ধারাকে কীভাবে ব্যবহার করা যায় তার উল্লেখ করতে গিয়ে গোড়ার দিকে তসরের গুটি সম্পর্কে হলডেনের প্রয়াসের কথা উল্লেখ করেন। উনি বোঝাতে চান, প্রায়োগিক বিজ্ঞানচর্চার ব্যাপারেও প্রচলিত পদ্ধতিগুলি আবিষ্কার করার চেষ্টা করা উচিত। এর সবচাইতে বড় দিক হল, এতে করে মানুষকে প্রত্যক্ষভাবে বিজ্ঞানের সঙ্গে জড়িত করা যায়। তাছাড়া অর্থনৈতিক লাভ তো আছেই।

প্রশ্ন : অধ্যাপক বসু, আপনি কি মনে করেন সমাজ ব্যবস্থার নবীকরণের ফলে আমাদের দেশে সমাজ এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে তেমন কোন পরিবর্তন আসেনি ?

অধ্যাপক : বলার মত তেমন কিছু তো দেখছি না। আমাদের দেশে একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে, আমাদের পুরনো অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ভিত্তি এখনও সম্পূর্ণ ভাঙ্গেনি। যেমন ধরুন, বর্তমানে সারা ভারতে বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে শতকরা ৪·২ জন, ছোট শিল্পে, কুটিরশিল্পে—নতুন এবং পুরনো মিলিয়ে কাজ করছেন ৬·২ জন। দেখা যাচ্ছে এখনও পর্যন্ত শতকরা ৯০ জন তাঁদের জাতিভিত্তিক পেশাতেই নিযুক্ত রয়েছেন। যাকে আমরা 'মডারনাইজেশন' বা আধুনিকীকরণ বলে থাকি, আমাদের দেশে খুব কম সংখ্যক লোকের উপরই তা বর্তেছে। আমাদের 'প্রোডাকটিভ অর্গানাইজনসনস' যা দুশ বছরের মত জাতিভিত্তিক অবস্থায় এদেশে আঁকড়ে বসে আছে এবং দেশের বেশির ভাগ মানুষ যাদের উপর নির্ভর করে বেঁচে রয়েছেন, তাদের পরীক্ষা করা দরকার। 'ওল্ড প্রোডাকটিভ অর্গানাইজেসনস'-এর সঙ্গে বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার পারস্পরিক নির্ভরশীলতা কতখানি, সমাজবিজ্ঞানীদের সেটা গবেষণা করে বের করতে হবে। কত লোক পুরনো প্রথা ধরে জীবন ধারণ করছেন, পুরনো সামাজিক প্রথার উপর তাঁদের আনুগত্য কতটা এবং তার কারণই বা কী, সেটা বুঝে নেওয়া দরকার।

প্রশ্ন : এ ব্যাপারে আপনি কী বলতে চান ?

অধ্যাপক : পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, দেশের বেশির ভাগ মানুষই 'আধুনিকীকরণের' সুযোগ থেকে বঞ্চিত। পুরনো প্রথায় পেশাকে বংশগত বৈশিষ্ট্য বলে মনে করা হত। ওই ভাবেই এতকাল চলে আসছে। দেখা দরকার, ব্যক্তিগত গুণাগুণ অনুসারে সকলেই সুযোগ পাচ্ছে কিনা। শিক্ষার ধারাও ওই পথে

সঞ্চারিত হওয়া উচিত। শিক্ষার দায়িত্ব, ব্যক্তিগত গুণগুলি বিকশিত করার ব্যাপারে সাহায্য করা এবং সামাজিক স্বীকৃতি পেয়ে যাতে সকলে বেঁচে থাকতে পারে তার স্থযোগ করে দেওয়া। এগুলি করতে গিয়ে কোথায় আমাদের আটকাচ্ছে, কিভাবে আটকাচ্ছে তার অনুসন্ধান করা দরকার।

প্রশ্ন: একটা ব্যাপারে কিন্তু বেশ খানিকটা ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে, অধ্যাপক বসু। ভারতে পেশার সঙ্গে বংশ বা শ্রেণীর সম্পর্ক হয়ত এক সময়ে নিকটের ছিল, এখন কিন্তু কেমন উল্টো বলে কি মনে হচ্ছে না?

অধ্যাপক: কথাটা সত্যি। যেখানেই স্থযোগ স্থবিধে এসেছে সেখানেই ব্যতিক্রম ঘটেছে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ১৯২১ সালের বাংলার কথাই ধরুন। সেনসাস-এর প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, ঐ সময়ে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁরা রোজগার করতেন, তাঁদের শতকরা চৌদ্দ ভাগই সংস্কৃত শিক্ষা, শিক্ষণ, যজমানি কাজ কর্মে লিপ্ত ছিলেন। অবশিষ্ট শতকরা ছিয়াশি ভাগ ব্রাহ্মণ আধুনিকতার স্থযোগ পেয়ে বংশগত বৃত্তি ত্যাগ করেছিলেন। ওঁদের বেশির ভাগই ছিলেন আইন-ব্যবসায়ী, বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার, সরকারী পদস্থ কর্মী, জমিদার, ব্যাঙ্কার প্রভৃতি। ঠিক এইভাবে বিহার এবং অন্ধ্র প্রদেশে দেখা গেছে কিছু কিছু ব্রাহ্মণ যজমানি বা ধর্মসংক্রান্ত কাজকর্ম ছেড়ে চাষ-আবাদে আত্মনিয়োগ করেছেন। বিহারে ওঁদের বলা হয় ভুঁইহার ব্রাহ্মণ। আবার ওড়িশার গঞ্জাম জেলায় ব্রাহ্মণদের তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। এক, শিক্ষিত এবং যাজক সম্প্রদায়। এঁরা শিষ্যবর্গের উপঢৌকন প্রভৃতির উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করেন। দুই, দ্বিতীয় গোষ্ঠী, যাঁরা লাঙ্গল স্পর্শ করেন না, তবে ভিন্নতর পদ্ধতিতে চাষ আবাদ করেন। তিন, তৃতীয় গোষ্ঠী, সাধারণ চাষীশ্রেণীর মতই লাঙ্গলের সাহায্যে কৃষি জমিতে কাজ করে থাকে তারা। অর্থাৎ আমি যেটা বলতে চাই তা হল, আমাদের পবিত্র গ্রন্থাদিতে ব্রাহ্মণদের জীবিকা নির্বাহের ব্যাপারে ঠিক যে ধরনের উপদেশ দেওয়া হয়েছিল প্রয়োজন এবং স্থযোগের দরুণ তাঁরা সেগুলি থেকে দূরে সরে এসেছেন। এবং সাম্প্রতিক কালে এই ব্যতিক্রম যে কতখানি কিছুদিন আগে কলকাতার কাছাকাছি দেশের বৃহত্তম একটি জুতোর কারখানায় আমরা যে সমীক্ষা চালিয়েছিলাম তাতেই তা ধরা পড়বে।

দেখা গেছে দক্ষ এবং অদক্ষ কর্মীদের মধ্যে ঐ কারখানায় যে সমস্ত হিন্দু কাজ করছেন তাঁদের শতকরা ৪৩ ভাগই ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং বৈদ্য। কোন কোন জায়গায় ব্রাহ্মণকে আমি ক্ষৌর-কর্ম ব্যবসায়েও লেগে থাকতে দেখেছি। আমাদের বক্তব্য, শহর এবং কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলেও বর্ণভিত্তিক পেশা যে বেঁচে থাকার ব্যাপারে মোটেই সহায়ক নয়, এটা যাঁরা বুঝেছেন তাঁরা পেশার পরিবর্তন করেছেন অথবা করার চেষ্টা করেছেন।

প্রশ্ন : কিন্তু একটা জিনিস সম্প্রতি আমরা লক্ষ করছি, অধ্যাপক বসু। দেশের একটা বড় রকমের অংশ আজ 'জমি দাও' বলে চিৎকার করছেন। ওঁদের বেশির ভাগই কিন্তু বংশগতভাবে চাষী। আপনি কি বলতে চান তাঁদের এই আকাঙ্ক্ষার পেছনে বংশগত কোন প্রবণতা কাজ করছে না?

অধ্যাপক : সঙ্গত প্রশ্ন। না। আমি বলব, এর পেছনে বংশগত প্রবণতার চেয়ে আত্মরক্ষার প্রবণতাই অনেক বেশি সোচ্চার। একটা উদাহরণ দিই। তখন আমি দিল্লীতে নিম্ন বর্ণ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার উপর কাজ করছি। দেখলাম, ওদের মধ্যে যাদেরই চাকরী যাচ্ছে তারাই জমি চায়। অথচ সব সময় সুষ্ঠুভাবে চাষ আবাদ করার মত অভিজ্ঞতাও যে তাদের আছে অথবা বংশগতভাবে তারা চাষী সে কথাও বলব না। বর্তমানে অনেক অঞ্চলে সাধারণ গরীব লোক, আদিবাসী অথবা উদ্বাস্তু, ওঁদেরও জমি সংগ্রহের ব্যাপারে আকাঙ্ক্ষা বেড়ে গেছে। ব্যাপারটাকে প্রচলিত সরকারী ব্যবস্থার উপর তাদের পুরোপুরি অনাস্থা বলেই আমার কাছে মনে হয়েছে। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ওরা বুঝে নিয়েছে সরকার কোন মতেই কর্মসংস্থান যোগাতে পারবে না। অতএব তাদের বক্তব্য, জমি দাও, তোমাদের আর কাজ দিতে হবে না। ফলে জমির চাহিদা দারুণভাবে বেড়ে গেছে। রাজনৈতিক দলও ব্যাপারটাকে কাজে লাগাচ্ছেন। আমি বলি, জমি দেবে কেন? অন্য কাজ দাও। কারণ তুমি জান, এদেশে জনসংখ্যার তুলনায় চাষের জমি কম। দারিদ্র্য মোচন করার জন্যে যারা খণ্ড খণ্ড জমি চাইছে, আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে উৎপাদন করার ব্যাপারে তাদের অনেকেই অক্ষম। চাষ করার মত দক্ষতাও হয়ত অনেকের নেই। এটা নিশ্চয় বড় রকমের অপচয়। তাছাড়া বর্তমান অবস্থায় যেখানে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রামীণ জীবনের মধ্যেও আধুনিকীকরণের চেষ্টা প্রাধান্য

পেয়েছে, সেখানে এইভাবে এগোনোটা যুক্তিসঙ্গত হবে বলে আমি মনে করি না। সমাজবিজ্ঞানীদের উচিত এই সমস্যাটির উপর অনুসন্ধান চালান। দেখা দরকার, সম্প্রদায় অথবা ব্যক্তিগতভাবে যারা যে যে বৃত্তি বা পেশা নিয়ে আজ জীবন ধারণ করছে তাদের কতটা সংস্কারগত, কতটা নিজস্ব উদ্যোগের প্রতিশ্রুতি। কারণ সাংস্কৃতিক অথবা অর্থনৈতিক যে ক্ষেত্রেই পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা হোক না কেন সেটা শুধু কতকগুলি তত্ত্ব খাড়া করে তাদের উপর চাপিয়ে না দিয়ে, তাদের প্রবণতা এবং নিজস্ব যোগ্যতার পরিপ্রেক্ষিতেই রচনা করা দরকার। এর জন্যে ভারতের কোন অঞ্চলে কী রকমের এবং কতটা সামাজিক পরিবর্তন ঘটেছে এবং কেন, তার উপর আমাদের অনুসন্ধান করা দরকার। যেখানে ভাল চাষ আবাদ হচ্ছে, যাঁরা তা করছেন তাঁদের উৎসাহ দিন, উন্নত করার চেষ্টা করুন। যেখানে শিল্পের উপযোগী ব্যবস্থা আছে, যেখানে কাজ করার মত যোগ্য মানুষ আছে, সেখানে অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা গ্রহণ করুন। এটা তো সমাজবিজ্ঞানীদেরই দেখার কথা।

প্রশ্ন : অধ্যাপক বসু, এ প্রসঙ্গে চীনের সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে আপনি কি বলতে চান?

অধ্যাপক : দেখুন, ওদেরও শ্রেণীভিত্তিক সমাজ ছিল। তবে আমাদের দেশে পেশা বা বৃত্তির ব্যাপারে বংশগত ধারা যতটা প্রভাব বিস্তার করেছে, ওদের তা করে নি। ওদের শ্রেণীভিত্তিক সমাজে কনফুসিয়াসের পর থেকেই দেখা যায়, জীবনে যে যে-বৃত্তি গ্রহণ করবে তার জন্যে তাকে নিজস্ব গুণগত যোগ্যতার উপর নির্ভর করতে হত। অর্থাৎ মৎস্য শিকারীর ছেলেকে সব সময় যে মাছ ধরার ব্যবসায় করতেই হবে, এমন কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। ব্যক্তিগত অনুশীলনের মাধ্যমে যে যে-রকম দক্ষতা অর্জন করত, সে সেই রকম কাজ করার অধিকারী হত। এমন কি উচ্চ পর্যায়ের সরকারী চাকরী পাবার ব্যাপারেও বংশ মর্যাদার কথা তেমন স্বীকার করা হত না। ওই ধরনের কাজ কে পাবে সেটা নির্ভর করত তার যোগ্যতার উপর এবং পরীক্ষার মাধ্যমে তার সেই গুণগত যোগ্যতা নির্ধারণ করা হত। ১৯৬০ সালেও এটা দেখা গেছে। বলা চলে সামাজিকতার দিক দিয়ে আধুনিকতার চল অনেক আগে থেকেই সেখানে শেকড় গেড়ে বসেছিল।

প্রশ্ন : বর্ণগত বৈষম্য সম্পর্কে আপনার অভিমত কী ?

অধ্যাপক : জটিল প্রশ্ন। পৃথিবীর সর্বত্র এটা আজ বড় রকমের সমস্যা। এ শুধু মানুষের কালো-সাদার প্রশ্ন নয়, ইতর প্রাণীজগতেও এর উপস্থিতি দেখা যায়। যেমন ধরুন, আমাদের দেশে টোডা নামে এক ধরনের পার্বত্য জাত আছে। ওরা মুখ্যত মোষ প্রতিপালন করে জীবিকা নির্বাহ করে। ওরা লক্ষ করেছে, সমতল ভূমির মোষ ওদের মোষের সঙ্গে কখনই মিলিত হতে চায় না। প্রাণী জগতের এই যে নির্বাচন—এর মূলে কী ধরনের কারণ কাজ করছে এখনও পর্যন্ত তা জানা যায় নি। মানুষের মধ্যে বর্ণভেদের কারণ কতটা সাংস্কৃতিক, কতটা সামাজিক অথবা অন্য কিছু সেটা জানার জন্যে সমাজবিজ্ঞানীরা যথেষ্ট অনুসন্ধান চালাচ্ছেন।

ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন দিক এবং তার কার্যকারণের উপর যথেষ্ট অনুসন্ধান চালান দরকার এবং সেটা ব্যাপকভাবেই করতে হবে এটাই অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর মূল বক্তব্য। তাঁর বক্তব্য, সামাজিক বিবর্তনের সময় প্রতিটি গোষ্ঠীর উপর শুধু পারিপার্শ্বিকতাই যে প্রভাব বিস্তার করে তা নয়, তার পেছনে থাকে তাদের অন্তর্নিহিত আশা আকাঙ্ক্ষা এবং বিশেষ বিশেষ আদর্শের প্রতি আনুগত্য। সমাজবিজ্ঞানের যে কোন অনুসন্ধানের সময় এ কথাটি মনে রাখা দরকার। এর জন্যে জনসাধারণকে যথাযথভাবে শিক্ষিত করে তুলতে হবে এবং যাঁরা সামাজিক কল্যাণে বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা রূপায়নে হাত দিয়েছেন তাঁদের সাহায্য করতে হবে। অতঃপর তারই প্রভাবে সমাজ-জীবনে যে পরিবর্তন আসবে, সেই পরিবর্তনের মধ্যেই ধরা পড়বে মানুষ এবং মানসিকতার সত্যিকারের সম্পর্ক এবং তাৎপর্যও। আর এ ধরনের অনুসন্ধানের সময় গুরুত্ব দেওয়া দরকার ভিন্ন ভিন্ন ভৌগোলিক, পারিপার্শ্বিক স্থানীয় বৈশিষ্ট্য, অর্থনৈতিক কাঠামো, সাংস্কৃতিক এবং ব্যক্তি-মানসের ধ্যান-ধারণার উপর। দেশের বিজ্ঞান, শিল্প, কৃষি ব্যবস্থা—যে কথাই আজ বলা হোক না কেন তাদের যথাযথ সমৃদ্ধি এবং সমাজ জীবনে তাদের ভারসাম্যতা সৃষ্টির জন্যে আমাদের সমাজ বিজ্ঞানীদের আরও তৎপর এবং ব্যাপকতর কার্যসূচী গ্রহণ করা দরকার।

অ্যানথ্রপোলজিকেল সার্ভে অভ্ ইণ্ডিয়ার (কলকাতা) প্রাক্তন পরিচালক এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য বিশিষ্ট নৃবিজ্ঞানী ডঃ সুরজিৎ সিংহ অধ্যাপক বসু সম্পর্কে আমাকে বলেছিলেন : ওঁর মধ্যে এমন কতকগুলি মৌলিক

বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে যা সাধারণ একজন নৃবিজ্ঞানীর মধ্যে একান্তই অভাব। নিছক কতকগুলি বিমূর্ত বৈজ্ঞানিক সমস্যা অবলম্বন করে প্রবন্ধ লেখার জন্যে উনি কোন গবেষণা করেন না। ওঁর প্রধান আকর্ষণ, ভারতের সমাজ এবং সংস্কৃতির পরিবর্তনের ধারাকে নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণ করা, যার উপর নির্ভর করে ভারতের সমাজ জীবনকে পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব হয়, এর জন্যে নৃতত্ত্বের সাধারণ গবেষণা পদ্ধতির সঙ্গে তিনি হিউম্যান জিওগ্রাফি বা মানব-প্রকৃতিবিজ্ঞান, সামাজিক ইতিহাস এবং প্রত্নতত্ত্বের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। ওঁর গবেষণার একটি প্রধান বিষয় ভারতের জাতি-প্রথা এবং তার গঠন। ভারতের ইতিহাসে শত শত বৎসর জাতিপ্রথাগুলি কী ভাবে টিঁকে থাকতে পারল? ওঁর অভিমত, জাতিপ্রথা আসলে প্রতিযোগিতাবিহীন অর্থনৈতিক কাঠামো এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর, সংস্কৃতির বিষয়ে সহনশীলতাই এই কাঠামোকে এতদিন ধরে চালু রেখেছে। উনি মনে করেন, ভারতে শিল্পসভ্যতা আরও সম্প্রসারিত হলে তবেই জাতিপ্রথার বনিয়াদ দুর্বল হয়ে যাবে। এখনও পর্যন্ত শিল্প প্রচেষ্টাগুলি সার্বিকভাবে জীবিকার পথ সুগম করতে পারেনি বলে মানুষ এখনও দু নৌকোয় পা দিয়ে রেখেছে।...প্রথম দিকে ইউরোপীয় নৃতত্ত্ববিদরা গবেষণা করতে গিয়ে প্রধানত এদেশের উপজাতিদেরই জীবনযাত্রার বিবরণ সংগ্রহ করেছিলেন। অধ্যাপক বসু ভারতের নৃতত্ত্বকে সেই কূপমণ্ডুকতার হাত থেকে অনেকখানি মুক্ত করেছেন। ভারতীয় নৃতত্ত্ব শাখার অধ্যক্ষ থাকা কালে তিনি উপজাতির গণ্ডী অতিক্রম করে, সর্বসম্প্রদায়, সাধারণ পল্লী অঞ্চল, মন্দির, পীঠস্থান, প্রাচীন এবং আধুনিক নগর-জীবন, সর্বত্র গবেষণার দিগন্ত বিস্তৃত করেন। কুড়ি জন তরুণ বিজ্ঞানী নিয়ে তৈরি একটি দল গঠন করে ভারতের ৪৫০টি গ্রামের উপর তিনি অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য, ভারতের গ্রাম্যজীবন সম্পর্কে একটি বাস্তব ধারণা জন্মানো। এরই ফলশ্রুতি তাঁর সম্পাদিত 'পিজেন্ট লাইফ ইন ইণ্ডিয়া'। ওঁর ইচ্ছে, এই বই ভারতের সমস্ত ভাষায় অনূদিত হয়ে স্কুলপাঠ্যরূপে অন্তর্ভুক্ত করা। ওঁর ধারণা, নৃতত্ত্বের বুনিয়াদ সুদৃঢ় করতে হলে তার চর্চা গবেষণার ধারা সমাজ জীবনের চাহিদার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। ছাত্র জীবনে উনি বোয়াস, ক্রোবার এবং ম্যালিনস্কির মত খ্যাতিমান নৃতত্ত্ববিদদের দ্বারা প্রভাবিত হন। ফ্রয়েড, মার্কস, ক্রপেটকিন তাঁর চিন্তাধারাকে যথেষ্ট পুষ্ট করেছিল। উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্তের আদিবাসী, কলকাতার নাগরিক জীবনের গোষ্ঠীগত রূপ,

সেই সঙ্গে বিশ্লেষণী যুক্তি দিয়ে গান্ধীবাদ ও গান্ধীর সামাজিক পরীক্ষার উপর আলোচনা—সর্বত্রই সমানগতিতে তাঁর কৌতূহল কাজ করছে। প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ব, মন্দির-স্থাপত্য, মানব-প্রকৃতিবিজ্ঞান, সামাজিক নৃবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের উপর যে সমস্ত কাজ করেছেন গুণগতভাবে তাদের তুলনা মেলা ভার। নৃতত্ত্বে অধ্যাপক বসুর মত বহুমুখী প্রতিভার দৃষ্টান্ত বিরল।

সমাজে ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক বাতাবরণ কী ভাবে ঘটে? সাক্ষাৎকারের সময় সন্তর্পণে এই প্রশ্নটিও তুলে ধরেছিলাম অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর কাছে।

প্রশ্নটি শুনে গম্ভীর হয়েছিলেন তিনি। বললেন, তা হলে একটি অভিজ্ঞতার কথা বলি, শুনুন। একবার ওড়িশার একটি অঞ্চলে গেছি। জুয়াঙ্গ নামে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা। আমি অতিথি। আমাকে পেয়ে তারা খুব খুশি হয়েছে বুঝতে পারলাম। ওদের মোড়ল বললো, তোকে আমাদের ভাষা শিখতে হবে। বললাম, ঠিক আছে, শিখবো তোদের ভাষা।

সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো প্রস্তুতির কাজ। মোড়ল নদীতে গিয়ে স্নান করলো। পরিষ্কার কাপড় পরলো। দুপুর রোদে প্রদীপ জেলে বসলো উপাসনায়। সামনে নানা রকম দেবদেবীর মূর্তি। তাদের আলো দেখিয়ে নিজেদের ভাষায় বলতে লাগলো, সত্যের নামে; পায়ের নিচে যে পৃথিবী, তার নামে; মাথার উপর যে ধর্ম দেবতা, তার নামে—হে ঠাকুর, এই নতুন মানুষটির মুখে ভাষা দাও। লক্ষ করলাম, ওদের পুজোয় হিন্দুর প্রাধান্য বেশী। অথচ কোন ব্রাহ্মণ অথবা বৈষ্ণব ওদের ঘরে পুজো করে না। নিজেদের যাবতীয় ধর্মীয় কাজকর্ম নিজেরাই করে। দেখলাম, জুয়াঙ্গরা নিজেদের সংস্কৃতির উপর আস্থা হারিয়েছে। পরিবর্তে গ্রহণ করছে হিন্দু সংস্কৃতি। এ ব্যাপারটা ছোটনাগপুরের মুণ্ডা এবং ওঁরাওদের মধ্যেও লক্ষ করেছি।

ব্যাপার কি জানেন? ওই ব্রিটিশদের কথাই ধরুন না? ব্রিটিশ অর্থনীতি দিয়ে ভারতের উপর শাসন করেছে। গড়ে তুলেছিল বৃহত্তর উৎপাদন ব্যবস্থা নিজেদের ধনতন্ত্রবাদেরই স্বার্থে। তার কাছে ভারতীয় উৎপাদন ব্যবস্থা ছিল অকিঞ্চিৎকর। অর্থনৈতিক এই হীনতা জাতীয় আত্মমর্যাদার মূলে কুঠারাঘাত করেছিল। এর ফলে ইউরোপীয় সভ্যতাকেই এ দেশের বেশির ভাগ মানুষ শ্রদ্ধা করতে এবং অনুকরণ করতে শুরু করে। পদার্থবিদ্যা থেকে যেমন আমরা জেনে থাকি, বিদ্যুৎ শক্তি নিম্ন থেকে উচ্চ বিভবের দিকে প্রবাহিত হয়, মানব সভ্যতায়

সাংস্কৃতিক প্রবাহের ধারাও ঠিক তেমনি। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে যারা ক্ষমতাবান তাদের সংস্কৃতিই দরিদ্র জাতির মধ্যে বর্তায়। বিশেষ করে উভয়গোষ্ঠী ঘটনাচক্রে যখন একই বৃহত্তর উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে বিরাজ করে। রাজনৈতিক দিক দিয়ে যারা বলবান, রাজনৈতিক চেতনা দুর্বল গোষ্ঠীর মধ্যেও বর্তায়। কী ভাবে তা ঘটে, মানব সমাজে তার প্রতিক্রিয়ায় বা শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়ায় সে দিকেও আমাদের লক্ষ রাখা দরকার। নইলে মুখেই শুধু হবে সমাজতন্ত্র, বাস্তবে কিছুই হবে না।

পরিব্রাজক হয়ে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন সারা ভারত। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলেও। মানুষকে তিনি জেনেছেন, দেখেছেন কখনও এককরূপে, কখনও গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হিসেবে। প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ব, মন্দির স্থাপত্য, মানব প্রকৃতি, সামাজিক নৃবিজ্ঞান—সেই অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে এদের তাৎপর্য যে ভাবে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন তার তুলনা মেলা ভার। পৃথিবীর নৃতত্ত্বে তাঁর মত বহুমুখী প্রতিভার দৃষ্টান্ত বিরল।



প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ

২৯ জুন, ১৯৭২। বরানগরের সেই ঐতিহাসিক বাড়ি 'আম্রপালী' থেকে ফিরে এলাম। সেখানে অগণিত মানুষের ভিড়ে একটিমাত্র মুখই যেন অচঞ্চল। কী বলব? সমাধি? হয়ত তাই। কারণ ও মুখ যখন কথা বলত, যখন কোন কিছু ভাবত, নিঃসঙ্গ নিভৃতে অথবা সমভিব্যাহারে—যখন দেখেছি, ওই ভাবেই দেখেছি। কিন্তু এবারকার দেখা শেষ দেখা। পূর্ণসমাপ্তির পর মহাপ্রস্থানের পথে চলেছেন। এখানেও একটি প্রশ্ন, বিজ্ঞানী? এটি তাঁর আংশিক পরিচয়ই বলব। কারণ কাছে থেকে ওঁকে যাঁরা দেখেছেন, ঘটনার প্রান্তিক মুহূর্তে ওঁকে যাঁরা উপলব্ধি করেছেন, তাঁরা জানেন, ওঁর সদা অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞানী মনের মধ্যে সব সময়ই মিশে থাকত আর এক মন। সেটা শিল্পী মন, দার্শনিক মন, কবির মন। যদি তার পরও কিছু বলি, বলব ভালবাসার মন।

সেই মনটি চলে গেল। ২৮ জুন, ১৯৭২। বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী এবং রবীন্দ্র চিন্তার উত্তরসাধক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ মহাপ্রস্থানে চলে গেলেন। বেশ কিছুকাল ধরেই তিনি অসুস্থ ছিলেন। কয়েকদিন আগে অবস্থা খারাপের দিকে যায়। তখন ওঁকে কলকাতার একটি নার্সিং হোমে ভর্তি করা হয়েছিল। সেখানেই টিউমার অপারেশনের পর পরিসমাপ্তি ঘটল।

২৯ জুন ওঁর জন্মদিন। এ দিনটি সেবার উৎসবের মধ্যে দিয়ে যাপন করার আয়োজন চলছিল। আর তখনই:

> বৃথা বাক্য থাক্। তব দেহলিতে শুনি ঘণ্টা বাজে
> শেষ প্রহরের ঘণ্টা; সেই সঙ্গে ক্লান্ত বক্ষ মাঝে
> শুনি বিদায়ের দ্বার খুলিবার শব্দ সে অদূরে
> ধ্বনিতেছে সূর্যাস্তের রঙে রাঙা পূরবীর সুরে।

অ্যাপয়েন্টমেন্ট? বিজ্ঞানী কি সত্যিই শেষ প্রহরের ঘণ্টা শুনতে পেয়েছিলেন? হয়ত পেয়েছিলেন। নইলে কী করে বললেন শেষ মুহূর্তের ঠিক আগে, এ জন্মদিন আর পালন করা হবে না? এ যেন সব কিছুই ঠিক করা ছিল।

শুধু সময়ের অপেক্ষা। কারণ প্রশান্তচন্দ্র অ্যাপয়েন্টমেন্ট না করে কোন কিছু করা ভালবাসতেন না।

হ্যাঁ, মনে পড়ে, ঠিক এক বছর আগে এই 'অ্যাপয়েন্টমেন্ট' ব্যাপারটা বোঝানর জন্যে তিনি আমার সঙ্গে চল্লিশ মিনিটেরও বেশি কথা বলেছিলেন। টেলিফোনে। আমি তাঁর 'আম্রপালী'র দোতলায়। উনি তিন তলায় স্টাডিতে। 'দেশ'-এ ওঁর সাক্ষাৎকারের অনুমতির জন্যে গিয়েছিলাম।

জনৈকা সেক্রেটারি শুনে বললেন, অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আসেননি? উনি কি দেখা করবেন? তবু আমার অনুরোধে ভদ্রমহিলা খুবই সন্তর্পণে টেলিফোনে অধ্যাপকের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। সামনে বসে ওঁর সংলাপ শুনে মনে হল সত্যিই আমি ব্যর্থ হতে চলেছি। অনেক পীড়াপীড়ি করার পর অধ্যাপক আমার সঙ্গে এক মিনিট কথা বলতে রাজী হলেন। আমি দোতলায়। উনি তিন তলায়। কথা বললাম টেলিফোনে।

প্রণাম জানালাম। উনি উত্তরে আশীর্বাদ জানিয়ে বললেন, অ্যাপয়েন্টমেন্ট না করে আসাটা কেমন হল না? মিছিমিছি এই রোদে কষ্ট করে ফিরে যাওয়া? উত্তরে আমি বললাম, না। একটু যোগাযোগ করতে এসেছিলাম। আপনি তো খুবই ব্যস্ত সব সময়? ভাবলাম একেবারে এখানে এসে পরিস্থিতি বুঝে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা যাবে।

অধ্যাপক উত্তরে বললেন, ব্যস্ত আমি সব সময়ই। কাজ তো থাকবেই। তোমার সঙ্গে কথা বলাটাও একটা কাজ। কিন্তু বিজ্ঞানের কৃপায় টেলিফোন নামে যে যন্ত্রটি আমরা পেয়েছি, তার তো সাহায্য নেয়া যেত? যেত কী না, বল? তাহলে এই কষ্টটা আর করতে হত না। ভাবছ, টেলিফোনে কথা বললে, কিছু মনে করব? কারোর কারোর বেলায় রেওয়াজটা তাই বটে। কেউ কেউ অসম্মানিত বোধ করেন। আমি করিনে। এতে এক তরফের কষ্টও কমল কাজটাও সহজ হল।

আমি বললাম, ভেবেছিলাম টেলিফোনে কথা বলব, কিন্তু— ?

ভেবেছিলে? তা ভাবলে, কিন্তু ভাবনার মত তো কাজ করলে না?

এরপর প্রায় চল্লিশ মিনিট তারের মাধ্যমেই কথা চলল। বললেন, কেন অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া কারোর সঙ্গে তিনি দেখা করেন না। কারণ অ্যাপয়েন্টমেন্ট

মানে তাঁর কাছে কাজের প্রতিশ্রুতি। এটা না করতে পারলে সবই ক্যাজুয়াল। নিয়মগুলি মেনে চলতে হবে বইকি? নিষ্ঠার সঙ্গে। ব্যক্তিজীবন থেকে সব কিছুতেই আমরা এত বেশি ক্যাজুয়াল যে, কোন কাজই শেষ পর্যন্ত আমাদের মধ্যে আর দানা বাঁধতে পারে না।

জীবনের শেষ মুহূর্তেও প্রশান্তচন্দ্র তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন করেছেন।

শুধু ভারতে নয়, সারা বিশ্বে স্ট্যাটিসটিকস বা সংখ্যায়ন-বিজ্ঞানে মহালানবীশ শিরোনাম। সংখ্যায়নের বিশেষ দিগন্তের তিনি স্রষ্টা, শুধু এটাই তাঁর বড় পরিচয় নয়, তার বহুমুখী সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার ব্যাপারে তাঁর বলিষ্ঠ উদ্যোগ ভারতের মর্যাদা আজ পৃথিবীতে প্রথম সারিতে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই মানুষটি পরিণত বয়েসেও ব্যস্ত। অসম্ভব রকমের ব্যস্ত। ওঁর সান্নিধ্যে গিয়ে নিমেষেই মনে হয়েছিল, যৌবনে যে দুর্বার গতিবেগ বিজ্ঞান সাধনায় একদিন ওঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, সেদিনও সেই মুহূর্তেও তার মধ্যে কোন ছেদ পড়েনি। মন্থরতা সমাপ্তির সূচনা রচনা করেনি। ওঁর সঙ্গে কথা বলে আমার মনে হয়েছে মানসিকতার দিক দিয়ে উনি প্রচণ্ড রকমের সতর্ক, ওঁর অনুসন্ধিৎসু মন সব সময়ই প্রবহমান। অভিযোগ, বিজ্ঞানীরা কাজ করেন আত্মমগ্নভাবে, কাজের সাফল্যেই তাঁদের সিদ্ধি। সমস্ত ব্যক্তিত্ব শুধু তারই মধ্যে নিবদ্ধ থাকে। অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহালানবীশ এর ব্যতিক্রম। তিনি নিজে কাজ করেন এবং করান। ভারতে এ ধরনের নজির খুব কম।

ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার? মহলানবীশের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা খুবই শক্ত। প্রথমত কলকাতার ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে তাঁর বাড়ি আম্রপালীতে ঠিক কোন্ দিন এবং কোন্ সময়ে যে তাঁকে পাওয়া যাবে আগে থেকে বলা শক্ত। বছরের বেশির ভাগ দিন তাঁর কাটে ভারতের বিভিন্ন শহরে এবং বিদেশে। যেটুকু সময় বাড়িতে থাকেন তখন দৈনিক কর্মসূচী অসম্ভব রকমে ঠাসা। কখনও কোন পরিকল্পনার কাগজপত্র পরীক্ষা করছেন, কখনও তাঁর নিজের হাতে গড়া ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনসটিটিউটের কাজকর্ম বা তার সমস্যার ব্যাপারে প্রশাসনিক কথাবার্তা চালাচ্ছেন। অথবা ব্যস্ত রয়েছেন দেশী এবং বিদেশী বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনায়। অন্তত আমার অভিজ্ঞতায় কম করেও পাঁচবার ওঁর সঙ্গে

অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে গিয়ে আমি ব্যর্থ হয়েছি। অবশেষে অপ্রত্যাশিত সুযোগ করে দিলেন অধ্যাপকের স্ত্রী শ্রদ্ধেয়া নির্মলকুমারী মহলানবীশ। সম্ভবত আমার অনুরোধ এড়াতে না পেরেই নির্মলকুমারী বললেন, 'এসো তুমি, দেখা যাক কী হয়। এ মাসের মাঝামাঝি অধ্যাপকের মস্কো, ইউরোপের কয়েকটি দেশ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি জায়গায় বক্তৃতা দেবার কথা আছে। খুবই ব্যস্ত রয়েছেন।' এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ভারতের অনেকেই জানেন না, অধ্যাপক মহলানবীশই তখনও পর্যন্ত একমাত্র ভারতীয় বিজ্ঞানী যিনি ১৯৫৮ সালে সোভিয়েত দেশের অ্যাকাডেমি অভ সায়েন্সের সদস্য পদে মনোনীত হন।

ওঁর অবদান সম্পর্কে ধারাবাহিক এবং পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেওয়া ঠিক এই মুহূর্তে এবং সীমিত পরিসরে অসম্ভব। আপাতত মোটামুটিভাবে ওঁর পরিচিতি আমি চারটে পৃথক পর্যায়ে ব্যক্ত করব। এক, সংক্ষিপ্ত পরিচয়; দুই, আমার সঙ্গে ওঁর সাক্ষাৎকার; তিন, অবদান এবং চার, প্রসঙ্গ কথা—স্বয়ং নির্মলকুমারীর ভাষায়।

টু থাউজেণ্ড মেন অভ্ অ্যাচিভমেণ্ট, প্রকাশক মেলরোজ প্রেস লিমিটেড, আরটিলারি ম্যানসন, ভিকটোরিয়া স্ট্রীট, লণ্ডন, এস ডব্লু-১। এই বইটির ১৯৭০ সালের সংস্করণে বলা হয়েছে: প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের জন্ম ২৯ জুন, ১৮৯৩। কলকাতায়। পেশায় সংখ্যায়নবিদ্। বিবাহ কলকাতায়, ফেব্রুয়ারী ২৭, ১৯২৩-এ। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি এস-সি পাশ করেন। ১৯১২-তে কেমব্রিজের ম্যাথেমেটিকেল ট্রাইপস, প্রথম খণ্ড ১৯১৪, ন্যাশনাল সায়েন্স ট্রাইপস, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯১৫। ১৯২২-৪৫ প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপকের পদে আসীন। ১৯৪৫-৪৮ সালে তাঁকে এমেরিটাস অধ্যাপকের সম্মানে ভূষিত করা হয়। অতঃপর কলকাতাতেই আবহাওয়া বিশারদের কাজ ১৯২২-২৬, ১৯২১-৩১ বিশ্বভারতীর কর্মসচিব, ১৯৪১-৪৫ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যায়ন বিভাগের প্রধান, ১৯৪৫-৪৮ বাংলাদেশ (ভারত তখনও পরাধীন) সরকারের সংখ্যায়ন বিষয়ক পরামর্শদাতা, ১৯৪৯ ভারত সরকারের অবৈতনিক সংখ্যায়ন বিষয়ক পরামর্শদাতা, ১৯৫৫-৬৭ ভারত সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য, ১৯৩১-এ ইনডিয়ান স্ট্যাটিসটিকেল ইনসটিটিউটের

কর্মসচিব এবং তার পরিচালক ১৯৩৩-এ। অধ্যাপক মহলানবীশ মনে করেন এ দেশের ছাত্রদের বিজ্ঞান এবং কারিগরিতে উচ্চতর পারদর্শিতা অর্জনের জন্যে যখন বিদেশে পাঠান হবে, তখন তাঁদের পরীক্ষার ফলাফলের চেয়ে নিজস্ব প্রবণতার উপরই বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত। আর একটা ব্যাপার লক্ষ রাখতে হবে। যে যে বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে তাঁরা কাজ করবেন সেখানকার শিক্ষক বা পরামর্শ-দাতাদের এদেশে এনে দু-এক বছর রেখে এ দেশের পরিবেশ এবং কাজ করার সুযোগ সুবিধে সম্পর্কে তাঁদের অবহিত করা কর্তব্য; ফলে আমাদের ছাত্ররা তাঁদের দেশে গিয়ে যখন কাজ শিখবেন তখন একদিকে যেমন তাঁরা উচ্চতর সুযোগ সুবিধের সঙ্গে পরিচিত হবেন, সেই সঙ্গে ওই শিক্ষকরা বোঝাতে পারবেন কীভাবে ঐ সুবিধে দেশে ফিরে এসেও সীমিত সংস্থানের মধ্যেও কাজে লাগান যেতে পারে। এ না করলে বিদেশে অধিগত বিদ্যা যত উঁচু মানেরই হোক না কেন জাতীয় স্বার্থে কোন কাজে লাগবে না।

সংখ্যায়ন বিষয়ক পত্রিকা 'সংখ্যা'র তিনি প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। সংখ্যায়নের উপর ওঁর প্রকাশনার সংখ্যা প্রায় ১৯২।

প্রখ্যাত সংখ্যায়নবিদ্ হিসেবে যে সমস্ত সম্মান তিনি পেয়েছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: রয়েল সোসাইটি অভ্ লণ্ডনের ফেলো, ১৯৪৭-এ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের স্ট্যাটিসটিকেল কমিশনের ভাইস-চেয়ারম্যান, ১৯৪৫-৫৮ পর্যন্ত চেয়ারম্যান। ওই একই প্রতিষ্ঠানের আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক-পরিমাপ সমাজের পাঁচটি সভায় তিনি সভাপতিত্ব করেন, পাকিস্তান স্ট্যাটিসটিকেল অ্যাসোসিয়েশনের ফেলো, মাদ্রিদের ইনসটিটিউট অভ্ স্ট্যাটিসটিকেল রিসার্চ-এর অবৈতনিক সদস্য, লণ্ডনের রয়েল স্ট্যাটিসটিকেল সোসাইটির অবৈতনিক সদস্য। সাম্মানিক ডক্টরেট ডিগ্রি পেয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৭-এ, বালগেরিয়ার সোফিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬১ সালে। ১৯৬৮ সালে তাঁকে পদ্মবিভূষণ সম্মানে ভূষিত করা হয়। ১৯৬১-তে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দেশিকোত্তম উপাধি লাভ। এ ছাড়া পেয়েছেন অকসফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েলডন মেডেল এবং পুরস্কার ১৯৪৪, স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী স্বর্ণ পদক, চেকোশ্লোভাক অ্যাকাডেমি অভ্ সায়েন্সের স্বর্ণ পদক ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, ১৯৪৮ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ তার প্রত্যেকটি স্থায়ী সদস্য দেশ ইউ. কে, ইউ এস এ, ইউ এস এস আর, ফ্রান্স এবং চীন (ফরমোসা) থেকে একজন করে বিশেষজ্ঞ নিয়ে যে পরমাণু কমিশন তৈরি করেন, তাতে একমাত্র অধ্যাপক মহলানবীশকেই স্থায়ী সদস্যের বাইরের দেশ থেকে আমন্ত্রিত সদস্যরূপে নির্বাচিত করা হয়েছিল। এ ছাড়া ১৯৫৭-৫৯ থেকে বিশ্বখ্যাত সংখ্যায়নবিদ্ ফিসার এবং তিনি ইণ্টারন্যাশনাল ইনসটিটিউট অভ্ স্ট্যাটিসটিকস-এর যুগ্মভাবে সভাপতি নির্বাচিত হন। ফিসারের মৃত্যুর পর একমাত্র তিনিই ওই আসনে বৃত হয়েছিলেন। এ ছাড়াও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে পর পর সতেরটি সভায় স্থায়ী সদস্যের মর্যাদায় যোগদান করে ভারতের গৌরব তিনি বৃদ্ধি করেছেন।

সেদিনও খুব ব্যস্ত ছিলেন তিনি। যখন আম্রপালীতে গিয়ে পৌছলাম ঘড়িতে তখন সকাল দশটা। আগেই ঠিক করে নিয়েছিলাম অধ্যাপকের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে যা কিছু শোনার তা নির্মলকুমারীর কাছ থেকেই শুনব। পরে দেখলাম এতেই লাভ হয়েছে। ওঁর সঙ্গে প্রায় এক ঘণ্টা কথা হল। কী কথা, তা 'প্রসঙ্গ কথায়' বলছি।

সাড়ে এগারটার সময় অধ্যাপককে একান্তে পাওয়া গেল। শ্রদ্ধেয়া নির্মলকুমারী আগেই ওঁকে আমার কথা বলে রেখেছিলেন। এবার সঙ্গে করে ওঁর ঘরে পৌছে দিয়ে চলে গেলেন।

ঘরে ঢুকতেই অধ্যাপক বসতে বললেন। তখনও তাঁর কোলের ওপর কয়েকটা ফাইল। আশেপাশে বই ছড়ান। চেয়ারের পাশে দুটি টেলিফোন। এই মাত্র কার সঙ্গে কথা বললেন। কথা সেরে প্রশ্ন করলেন, বল।

অবস্থা দেখে বুঝলাম নিয়মমাফিক বাক্যালাপ করার অবকাশ তখন কম। বিক্ষিপ্তভাবে আমাদের মধ্যে যে ধরনের কথাবার্তা হয় সংক্ষেপে তা এই রকম:

অধ্যাপক: প্রথম জীবনে পদার্থ বিজ্ঞান নিয়েই কাজ করেছি। এক সময়ে প্রখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী উইলসনের সঙ্গেই কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছিল। ভেবেছিলাম সেখান থেকে ফিরে এসে একসপেরিমেণ্টাল ফিজিকস-এ কাজ করব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সংখ্যায়নে মনোযোগী হলাম।

প্রশ্ন: এ ব্যাপারে আবশ্যকীয় পড়াশুনা গোড়ার দিকে আপনি কীভাবে শুরু

করেন, অধ্যাপক মহলানবীশ ?

অধ্যাপক : বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য কোথাও যাকে বলে ফরম্যালএডুকেশন সেভাবে কোনদিন আমি স্ট্যাটিসটিকস পড়িনি। ফলে যেটুকু শিখেছি বা জেনেছি সেটা টেকস্ট বুক পড়িনি বলেই সম্ভব হয়েছে। আমার কাছে মনে হয়েছে, টেকস্ট বুক পড়লে নিজের উপর ভরসা কমে যায়। আমাদের দেশে বিজ্ঞানের উপর এখনও কোন ট্র্যাডিশন গড়ে ওঠেনি। পুঁথিগত বিদ্যাটা চলেছে হাইঅ্যারকির মত। বিজ্ঞান চর্চাও ওই ভাবে চলেছে।

প্রশ্ন : অধ্যাপক, বিজ্ঞান চর্চা এবং চিন্তার ব্যাপারে আজও পর্যন্ত একটা অনীহা বা অ্যাপেথি সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যেই আমরা লক্ষ করেছি। এটা কী বিপজ্জনক ব্যাপার নয় ? এর কারণ কী ?

অধ্যাপক : কারণ অজ্ঞতা। ঠিক অ্যাপেথি কথাটা বললে ভুল হবে। আসলে বিজ্ঞানকে সপ্রশংস চিত্তে উপলব্ধি করতে কম করেও যতটুকু জ্ঞান বা খবরা-খবর রাখা দরকার, দেশের বেশির ভাগ মানুষ তা রাখেন না। আর যে ব্যাপারে অজ্ঞতা থাকে তাকে অ্যাপ্রিশিয়েট করব কী করে? হ্যাঁ, এটা জাতির পক্ষে তো বিপজ্জনক বটেই।

প্রশ্ন : অধ্যাপক মহলানবীশ, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতীয় সংখ্যায়নবিদ্‌দের প্রতিশ্রুতি কতটা সুদৃঢ় বলে আপনার কাছে মনে হয়েছে ?

অধ্যাপক : বাইরের দেশে ভারতীয় স্ট্যাটিসটিশিয়ানদের পোজিশন খুব ভাল। একটি মাত্র হিসেব দিলেই চলবে। ১৯৬৮ সালের সমীক্ষায় দেখছি, শুধু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেই স্ট্যাটিসটিকসের শতকরা তিরিশ ভাগ অধ্যাপক এবং গবেষকের পদ ভারতীয়রা দখল করে ছিলেন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের দপ্তরগুলিতে ভারতীয়রাই সংখ্যায় অনেক বেশি।

প্রশ্ন : আমাদের সরকারী সংস্থাগুলির সংখ্যায়নের কাজকর্ম সম্পর্কে আপনার কী অভিমত ?

অধ্যাপক : দীর্ঘকাল ওদের সঙ্গে আমি জড়িয়ে আছি। দুঃখের বিষয় সরকারী পরিসংখ্যান দপ্তরের বেশির ভাগ কর্মী ব্যাপারটা সম্পর্কে অজ্ঞ এবং তা উপলব্ধি করার মত ক্ষমতাও অনেকের নেই। ওঁদের বুঝতে হবে, পরি-সংখ্যানে যাবতীয় তথ্যই অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে যাচাই করা দরকার, তারা কতখানি সঠিক সেটা পরীক্ষা করা দরকার, ঠিক সেইভাবে, যেভাবে ফিজিকস,

কেমিস্ট্রি বা অন্যান্য বিজ্ঞানের পরীক্ষালব্ধ ফলাফলগুলি আমরা যাচাই করি।

বস্তুত, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির যে কোন সাফল্যের যথাযথ মূল্যায়ন নির্ভর করে সঠিক সংখ্যায়নের উপর। তা সে পদার্থবিদ্যাই হোক, অথবা জ্যোতির্বিজ্ঞানের দুর্ভেদ্য কোন রহস্য, সমাজ বিজ্ঞান অথবা কৃষি উৎপাদন, আবহাওয়া বিজ্ঞান, শারীরবৃত্তীয় জ্ঞান, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, সংখ্যায়নের প্রবেশ সর্বত্র। পৃথিবীতে দৈনন্দিন বিজ্ঞান, প্রযুক্তি অথবা প্রকৃতি জগতে নিয়ত যে সমস্ত ঘটনা ঘটে চলেছে তাদের কার্য, কারণ এবং অভিমুখ, তাদের প্রকৃতি এবং পারস্পরিক সম্পর্ক— এদের যথাযথ অস্তিত্ব, সম্ভাব্যতা যাচাই করার অন্যতম অবলম্বন যে পরিসংখ্যান, একথা সকলেই আজ স্বীকার করবেন। এই পরিসংখ্যানের উপরই নির্ভর করছে মানব-সভ্যতার ভারসাম্যতা।

অথচ আশ্চর্যের কথা, বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেও বিশেষ এই বিজ্ঞানের ব্যাপারে পৃথিবীর মানুষ এক প্রকার অজ্ঞই ছিল বলা চলে।

১৯১৩। প্রশান্তচন্দ্র গিয়েছিলেন কেমব্রিজে উচ্চতর পদার্থবিদ্যা এবং গণিতের উপর পড়াশুনা করতে। ভারতে যখন ফিরলেন হাতে তাঁর কার্ল পিয়ার্সনের জার্নাল 'বাইওমেট্রিকা অ্যাণ্ড বাইওমেট্রিক টেবল্স'। সংখ্যায়ন সম্পর্কে তাঁর কৌতূহল এখান থেকেই শুরু। পরবর্তীকালে এই বিশেষ বিজ্ঞানটিকে তিনি বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত করেছেন। সে সবের হিসেব এখানে দেওয়া শক্ত। তবে একটা কথা জোর দিয়ে বলা চলে, পৃথিবীর যে-কোন দেশ এবং যে-কোন ভাষায় রচিত উচ্চতর সংখ্যায়নের কোন গ্রন্থের লেখক সূচীতে অন্তত তিনটি বিষয় প্রসঙ্গে একজনের নাম অবশ্যই উল্লেখিত থাকবে— সে নাম পি সি মহলানবীশ। তিনটি বিষয় যথাক্রমে: 'মহলানবীশ ডিসটান্স', 'হিজ কনট্রিবিউশনস টু দ্য ডিজাইন অভ্ একসপেরিমেণ্টস' এবং 'থিওরি অ্যাণ্ড প্র্যাকটিস অভ লার্জ স্কেল স্যাম্পেল সার্ভে'। তাত্ত্বিক অর্থনীতির মধ্যে গভীরভাবে অভিনিবেশ করে তিনি কয়েকটি ইকনোমেটরিক্ মডেল বা অর্থনৈতিক পরিমাপ বিষয়ক মডেল তৈরি করেছেন। যার নাম মহলানবীশের দুই এবং চার সেকটর মডেল। এর সাহায্যে জাতীয় অর্থনীতিতে ন্যূনপক্ষে কতটা বিনিয়োগ করা যেতে পারে তা জানা যায়। জওহরলাল নেহরুর আমন্ত্রণে ভারতের জাতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উপর খসড়া (১৯৫৬) রচনা করে জাতীয় জীবনে তিনি এক ঐতিহাসিক আসন লাভ করেছেন।

ওঁর আরও একটি জাতীয় অবদান কলকাতায় ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকেল ইনসটিটিউটের প্রতিষ্ঠা। যখন তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক, এ ধরনের একটি প্রতিষ্ঠানের কথা তখন থেকেই তিনি চিন্তা করে আসছিলেন। ওই সময় তিনি কয়েকজন উৎসাহী ছাত্র নিয়ে গড়ে তোলেন সংখ্যায়ন গবেষণাগার। কলেজে নিজের ঘরেই। সেটা ১৯২০-৩১। পরে স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এবং প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিখিলরঞ্জন সেন এবং তাঁর সমবেত চেষ্টায় আহূত এক সভায় ইনসটিটিউট স্থাপনের ব্যাপারটা অনুমোদিত হয়। তারই ফলশ্রুতি এপ্রিল ২৮, ১৯৩২-এ ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকেল ইনসটিটিউটের প্রতিষ্ঠা। ১৯৫৯ সালে এই প্রতিষ্ঠানটিকে স্ট্যাটিসটিকসে বি এস-সি, এম এস-সি এবং পি এইচ ডি উপাধি দেবার ক্ষমতা অনুমোদন করা হয়। আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় রূপে এর সুনাম এখন সর্বত্র। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের নজির ভারতে দ্বিতীয়টি আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। তথাকথিত পুঁথিগত বিদ্যার চেয়ে গবেষণার ব্যাপারে ছাত্রের বিষয়গত অধিকার এবং বিষয় সম্পর্কে স্বকীয় প্রবণতাই এখানে প্রাধান্য পেয়ে থাকে। এখানে এমন কেউ কেউ কাজ করেছেন, যাঁদের নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর তথাকথিত 'ফরমাল অ্যাকাডেমিক শিক্ষা' তেমন নেই, অথচ তাঁরা প্রত্যেকেই উঁচুদরের বিজ্ঞানী এবং দেশে বিদেশে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। অধ্যাপক মহলানবীশের এটাও এক বিরাট কৃতিত্ব।

ব্যক্তিগত গবেষণায় তাঁর অনন্যসাধারণ অবদানের মধ্যে আছে স্যাম্পেল সারভে বা নমুনা বিষয়ক সমীক্ষা এবং ফ্রাকটাইল গ্রাফিক অ্যানালিসিস (১৯৫৮)। বলা যেতে পারে এটা তাঁর এক অসাধারণ কৃতিত্ব। এর উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় নমুনা সমীক্ষার ফলাফলগুলি যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করা।

আরও অনেক আছে এবং একথা আগেই বলেছি, স্বল্প পরিসরে তাদের পরিচয় দেওয়া শক্ত। রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার অন্যতম ধারক এবং বাহক অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশকে তাই বলছিলাম একটি বনস্পতি যার শতেক শাখা প্রশাখা আজ দেশ বিদেশে বিস্তৃত। পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের উদ্ভাবনা, বিকাশ এবং সার্বিক প্রয়োগের ব্যাপারে এমন একক কৃতিত্ব আমাদের দেশে আর কারো নেই।

আজকের সংখ্যায়ন বিজ্ঞানে তিনটি ধারার জনক তিনজন। এক, স্ট্যাটিসটিক্যাল কোয়ালিটি কণ্ট্রোলে বেল টেলিফোনসের ডঃ ওয়ালটার সিউহার্ট; দুই, ডিজাইন অ্যাণ্ড এক্সপেরিমেণ্টে (বিশেষ করে কৃষি বিষয়ক) স্যার ফিসার এবং তিন, স্যাম্পলিং বা নমুনা সমীক্ষায় অধ্যাপক মহলানবীশ।

বরানগরে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের পাশে সেই বিখ্যাত বাড়ির তিন তলায় বসার ঘরে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক কথা বলেছি অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্রের সহধর্মিনী নির্মলকুমারীর সঙ্গে, একান্তে। রবীন্দ্র সান্নিধ্য ধন্যা নির্মলকুমারী স্বামীর সঙ্গে দেশ-বিদেশে ঘুরেছেন; বহু বিদগ্ধ বিজ্ঞানী এবং সুধীজনের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়েছে, জীবনের গোড়া থেকে অধ্যাপকের প্রতিটি কর্মবহুল জীবনের সঙ্গে ওঁর সম্পর্ক অতি নিকটের। সাধারণত দেখা যায় স্বামীরা যদি কবি-সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, শিল্পী হন, তাঁদের স্ত্রীরা হন ঠিক তার উল্টো। ওঁদের কাছে সে সমস্তের কোন দাম থাকে না। কিন্তু কথা বলতেই মনে হল নির্মলকুমারী এ ক্ষেত্রে প্রচণ্ড রকমের ব্যতিক্রম। তাই মনে হয়েছে আর কারোর কাছে না গিয়ে অধ্যাপক সম্পর্কে যদি কিছু জানতে হয় তাঁরই স্মরণাপন্ন হওয়াই ভাল। এদেশে একজন বিজ্ঞানী সম্পর্কে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কোন নজির আছে কী না, জানি না। তবু আমার অনুরোধে একমাত্র 'দেশ' সাপ্তাহিকের জন্যে একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি রাজী হয়ে গেলেন। পরিচিত মহলে ওঁর পরিচয় রাণী মহলানবীশ। এ নাম রবীন্দ্রনাথের দেওয়া। প্রশ্নোত্তরে রাণী নামটাই ব্যবহার করছি। রাণী প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের কন্যা। জন্ম ১৯০০ খৃস্টাব্দে।

প্রশ্ন: অধ্যাপকের মত মানুষকে একাত্ম হিসেবে পাওয়ায় লাভও যেমন আছে, অসুবিধেও আছে। উনি অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ, গোড়া থেকে আজও। এর জন্যে নিজেকে কি আপনি নিঃসঙ্গ মনে করেন না?

রাণী: অ্যাবসুল্যুটলি নট্। ওঁর কাজের সঙ্গে তো গোড়া থেকেই যুক্ত রয়েছি। বিয়ের কয়েক বছর আগে থেকেই ওঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। আমার সব সময়ই মনে হয়েছে উনি ঠিক পথেই চলছেন। আমি না থাকলে উনি কি এ সমস্ত কাজ করতে পারতেন? অত সব ঝক্কি নেবে কে? এই স্ট্যাটিসটিক্যালের গোড়ার দিকে দশ বারো জন ছেলে, যারা কাজ করত, তাদের খাওয়া দাওয়া দেখা, ভালমন্দ সব কিছু আমাকেই

দেখতে হত। এ ব্যাপারে উনি তো সব সময় ইনডিফারেন্ট থেকেছেন। গোড়ার দিকে ছিল সুধীরকুমার ব্যানার্জি, শুভেন্দুকুমার বসু, গয়ানাথ আদক এবং অনেকে।

প্রশ্ন : শুনেছি অধ্যাপক কাজের লোককে চট করে চিনতে পারেন, এ সম্পর্কে আপনি কী মনে করেন?

রাণী : হ্যাঁ, উনি লোক চেনেন ভাল, এ ব্যাপারে ওঁর অদ্ভুত দূরদৃষ্টি আছে।

প্রশ্ন : অধ্যাপকের নিকটতম মানুষ হিসেবে তাঁর জীবনের দু-একটি ঘটনাবহুল কথা কিছু বলুন, রাণীদি?

রাণী : ঘটনাবহুল? কী বলব বল? অনেকই তো আছে। এই মুহূর্তে গোড়ার কথা বলাই ভাল। ১৯৩২ সালে যখন ইনসটিটিউট তৈরির কথা চলছিল উনি সরকারের কাছ থেকে প্রচণ্ড বাধা পান। বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত প্রেসিডেন্সি কলেজে হেড অভ্ দ্য ডিপার্টমেন্টের কাজ। তারপর রাত পর্যন্ত হবি হিসেবে চলত স্ট্যাটিসটিকস্। সরকার ওঁকে বদলি করলেন কৃষ্ণনগর কলেজে। উনি রাজী হলেন না এবং অনেক কথা কাটাকাটির পর বদলি নাকচ হল। উনি বললেন, কলকাতা ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। নিজের টাকায় বই কিনে লাইব্রেরি করে ছেলেদের নিয়ে তখন তিনি কাজ করছেন। ১৯৩২-৩৩ সালে আবার সরকার পেছনে লাগল। এদেশে ভাল কাজ করতে গেলেই বাধা অনেক। ওই সময় একদিন ছুটির পর বাড়ি এসে বললেন, রাণী তুমি কত টাকা হলে সংসার চালাতে পার? আমি সিরিয়াসলি বলছি। মুখ থমথমে। মনে হল প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছেন কোথাও থেকে। আমি বললাম, অ্যাবসলিউট্ মিনিমাম যদি বল, পঞ্চাশ টাকাতেই চালাতে পারি। উনি বললেন, না অত কমে বলছি না। এখন যদি আমি রিটায়ার করি আড়াইশ টাকার মত পেন্সন পাব। তারপর কোন একটা বেসরকারী কলেজে কাজ করলে শতখানিক টাকা। ওরা আমাকে রাজশাহী বদলি করেছে। শিক্ষা বিভাগে কাজ নিয়েছিলাম গবেষণা করব বলে। ওরা কোন সুযোগ দেবে না। সরকার কী করে বাধা দেয় দেখি। আজ সেক্রেটারিয়েটে বলে এসেছি, কাল রেজিগনেশন দেব। তাই ভাবলুম, তোমাকে একবার জিগ্যেস করি তোমার এতে মত

আছে কী না। আমি এ কথায় ওঁর মতে রাজী হয়ে গেলুম। সেদিন খুব খুশী হয়েছিলেন উনি। বদলি অবশ্য এবারেও বাতিল হয়ে যায়। এর পরের ঘটনাটা ইনসটিটিউট থেকে ডিগ্রি দেওয়ার বিল যখন পাশ হল, তখন। এটা আমাদের দু'জনেরই স্মরণীয় মুহূর্ত।

প্রশ্ন : অধ্যাপকের কোন কোন গবেষণা যখন বিশেষজ্ঞদের কাছে উচ্ছসিত প্রশংসা পায়, আপনার কাছে তখন কেমন মনে হয় ?

রাণী : আই ফিল প্লিজ্ড !

প্রশ্ন : প্লিজ্ড অর প্রাউড ?

রাণী : প্রাউডের কিছু নেই। আজকে ওঁরটার সম্বন্ধে উদ্দীপনা হচ্ছে, কাল হয়ত আর একজনের কাজ আরও ভাল হবে। বিজ্ঞান জগতে ভালর তো শেষ নেই। কবি রবীন্দ্রনাথ এবং বাবা আমার জীবনের আদর্শ। অধ্যাপক জীবনে সম্মানও যেমন পেয়েছেন আঘাতও পেয়েছেন প্রচণ্ড। ওঁর সহ্য ক্ষমতা অনেক। সুখ-দুঃখকে উনি হাঁসের গায়ের জলের মতই মনে করে এসেছেন চিরদিন। ১৯৪৪-এ যখন ওয়েলডন মেডেল এবং পুরস্কার পেলেন অক্সফোর্ড থেকে আমরা সহজভাবেই তাকে গ্রহণ করেছি। প্রতি তিন বছর পর অত্যন্ত উচ্চমানের বৈজ্ঞানিক কাজের জন্যে এ পুরস্কার দেওয়া হয়। আগের বারে কেউ পায়নি। তার আগের বার অর্থাৎ ছয় বছর আগে পেয়েছেন হলডেন।

প্রশ্ন : স্ত্রী হিসেবে অধ্যাপকের কোন্ বৈশিষ্ট্যটি আপনার কাছে সব চাইতে বেশি মূল্যবান বলে মনে হয়েছে, রাণীদি ?

রাণী : একটা বৈশিষ্ট্য—হি রেসপেক্টস মাই পারসোনাল আইডেনটিটি অ্যাণ্ড কমপ্লিট ফ্রিডম রিগার্ডিং মাই পারসোনাল ওপিনিয়ানস। আমরা দুজনে এক মন নিয়ে কাজ করছি।

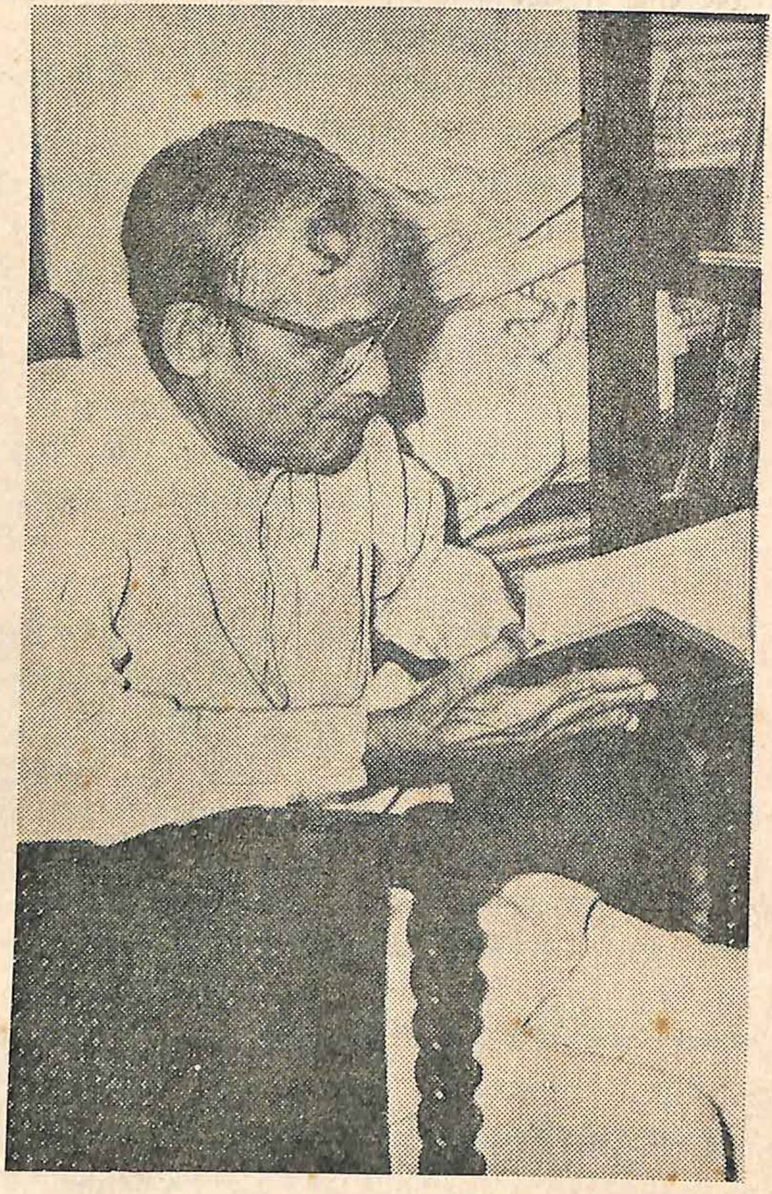
প্রশ্ন : কেউ কেউ মনে করেন গুণী মানুষের স্ত্রী হওয়াটা একটা বিড়ম্বনা, আপনার কী মনে হয় ?

রাণী : বিড়ম্বনা মনে হয় নি। তবে উনি গোলমেলে মানুষ। বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ পাঁচজনকে নেমন্তন্ন করে বসলেন।···

হ্যাঁ, নির্মলকুমারীর এও এক বৈশিষ্ট্য। বাইরের জগতের সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে রান্নাবান্না ঘরের কথা তিনি কখনও ভোলেন নি। স্বামী কী খাবেন,

বাগানের মালী কী খাবে অথবা কোন অতিথি, দেখলাম আমার সামনেই ঠাকুরকে সে ব্যাপারে তিনি নির্দেশ দিলেন।

প্রশান্তকুমার এবং নির্মলকুমারী—আমার মনে হয়েছে যেন দুটি পরিপূরক সত্তা। আচরণে, মননে এবং জীবনের গভীরতায়।



প্রিয়দারঞ্জন রায়

প্রিয়দারঞ্জন রায়

বয়েস তখন ৯০। তাই যথেষ্ট আত্মমগ্ন। তবু দেহের বয়েস বাড়লেও তুলনায় মনের বয়েস অনেক শ্লথগতি। ফলে অতীতকে এখনও যেমন উনি হারিয়ে ফেলেননি, তেমনি বর্তমানেরও প্রতীক, যোজ্যতা এবং রাসায়নিক সমীকরণ চিনে নিতে ওঁর ভুল হয় না। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ভাবশিষ্য, আচার্যের মতই অকৃতদার। জীবনের শুরু বিশ্লেষণী-রসায়নবিদ্‌রূপে। বিশ্লেষণ এখনও চলেছে। চলেছে বলেই প্রত্যয়ের সঙ্গে তিনি বলতে পারেন, 'স্বাধীনতার পর এদেশে গবেষণাকেন্দ্র অনেক স্থাপিত হয়েছে। ভাল লোকের চাহিদাও বেড়েছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সংখ্যায় তাঁরা অত্যন্ত কম। অনেক ক্ষেত্রে তাই স্বল্পযোগ্যতাসম্পন্ন লোক বড় বড় পদ আঁকড়ে বসে আছেন। এঁদের লক্ষ্য কেরিয়ারের দিকে, প্রেস্টিজ এবং পোজিসন-এর দিকে। ছেলেরাও ওই পথে এগোচ্ছে। ফলে আজকের বিজ্ঞান-প্রচেষ্টার খরচ যত বেড়েছে, তুলনায় উৎকর্ষ বা সাফল্য অনেক কম।'

বড় মানুষের সবচাইতে বড় লক্ষণ, তাঁর সত্যিকারের পারিপাট্য অন্তরে, বাইরে নয়। ওঁর সঙ্গে একান্তে কথা বলতে গিয়ে এই অভিজ্ঞতাটাই আমার সবচাইতে বড় পাওনা।

ওঁকে আমি প্রথম দেখি ১৯৭০ সালে কলকাতার বসু বিজ্ঞান মন্দিরে। সেদিন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু স্মৃতি-বক্তৃতামালার বত্রিশতম অধিবেশনে ভাষণ দিচ্ছিলেন। বিষয়বস্তু প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানচর্চা। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রচিত প্রাচীন ভারতের রসায়নের ইতিহাসের পরিমার্জিত সংস্করণের সম্পাদক প্রিয়দারঞ্জন একে একে উপস্থাপিত করলেন অতীত ভারতের বিস্তৃত বিজ্ঞান সাধনার উজ্জ্বলতম অধ্যায়। উপস্থিত প্রবীণ এবং নবীন বিজ্ঞানীরা অভিভূত হয়ে শুনলেন। অভিভূত এই কারণে যে, তাঁর বক্তব্যের উপাদানের চেয়ে সকলের মনে সবচাইতে বেশি যেটা রেখাপাত করেছিল, সেটা তাঁর আত্মপ্রত্যয়,

ভারতীয় ভাবধারার প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা এবং বিশ্বাস। যার মূল উৎস আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রেরই প্রেরণা।

আচার্য তাঁর ছাত্রদের বলতেন, বিলেত গিয়ে উচ্চতর ডিগ্রি পাওয়ার মোহ ত্যাগ করতে হবে। ডিগ্রিটা তো উপলক্ষ, আসলে কাজ চাই, ভাল কাজ। সেটা এদেশেই করা চলে। জীবনের প্রতিমুহূর্তে গায়ত্রী মন্ত্রের মত গুরুদেবের এই উপদেশটিকে প্রিয়দারঞ্জন শ্রদ্ধা করে এসেছেন। বিদেশে তিনি গেছেন। তবে ডক্টরেট ডিগ্রি আনার জন্যে নয়। প্রয়োজন ছিল অভিজ্ঞতার, কিছুটা অনুশীলন এবং বিশ্ববিজ্ঞানীদের সান্নিধ্য। তাই যাওয়া। এমন কি প্রথম জীবনে কিছু কিছু গবেষণাপত্র তিনি বিদেশী পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন বটে, তবে ১৯২৪ সালের পর তাঁর বেশির ভাগ মূল্যবান গবেষণা পত্র ইণ্ডিয়ান কেমিকেল সোসাইটির নিজস্ব পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছে। বিদেশী পত্র-পত্রিকায় নিজের প্রবন্ধ ছাপা হলে তবেই সম্মান বাড়বে, এমন অন্ধ মোহ কোনদিনই তাঁর ছিল না।

তবু দেশ এবং কালের প্রচলিত রীতিনীতির প্রাচীর ভেদ করে যতখানি সম্মান বা স্বীকৃতি তাঁর প্রাপ্য তা থেকে কখনও তিনি বঞ্চিত হননি। প্রখ্যাত জার্মান রসায়নবিদ্ অধ্যাপক উইলহেলম্ ক্রেম একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন, 'অজৈব রসায়নের উপর সাম্প্রতিক কাজ সম্পর্কে আলোচনা করলাম। কিন্তু ভারতীয় গবেষকদের কথা উল্লেখ না করে প্রবন্ধের উপসংহার করতে চাই না। এই প্রসঙ্গে রামন, কৃষ্ণান এবং পি রায়ের কথা বললেই যথেষ্ট হবে বলে মনে করি।' (Wenn ich im Vorstehenden einige Zuge der modernen Entwicklung auf dem Gebiet der anorganischen Chemie aufzeigen durfte, so mochte ich nicht schliessen, ohne des Antelisindischer Forscher an diesen Fortschritten zu gedenken. Wennich nur die Namen Raman, Krishnan, und P. Ray nenne, so mogen diese fur viele stehen.)

কেমিকেল রিভিউ পত্রিকায় অধ্যাপক রায়ের নিবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পর হাঙ্গেরীর প্রখ্যাত অধ্যাপক এম টি বেক তাঁর কাছে ব্যক্তিগত একটি পত্রে লিখেছিলেন, 'বাইগুয়ানাইড কমপ্লেকসের বিষয়ে আপনার গবেষণার ব্যাপারে আমি অত্যন্ত উৎসাহী। সম্প্রতি প্রকাশিত আপনার তথ্যপূর্ণ নিবন্ধটি গভীর

আগ্রহের সঙ্গে পড়লাম। বৈজ্ঞানিক তথ্যের দিক দিয়ে এটিকে আমার কাছে স্বর্ণখনির মত মনে হয়েছে। অনুগ্রহ করে এর একখণ্ড প্রতিলিপি পাঠালে বাধিত হব।' ওই একই সময়ে মার্কিন দেশের প্রবীণ রসায়ন-বিজ্ঞানী, ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন সি বেইলার একটি চিঠিতে তাঁকে লিখেছিলেন, 'বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে আপনার স্বদেশের জন্যে আপনি যা করেছেন, তাতে আপনি গর্ববোধ করতে পারেন।' আর অন্যতম প্রিয়ভাজন শিষ্যটি সম্পর্কে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর 'লাইফ অ্যাণ্ড একসপেরিয়েন্সেস' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, 'এমন নিরহংকার লোক, অথচ এমন একজন গুণীলোক খুব কমই আছে।...রসায়ন চর্চার সমিতিগুলিতে প্রবন্ধ পাঠানর আগে আমার লেখা তাঁকে একবার দেখিয়ে নিই, তাঁর সমালোচনা এবং বিচারের জন্যে পাঠাই।...প্রিয়দারঞ্জন অন্তত কুড়িটি প্রবন্ধ লিখেছেন। তার যে কোন একটির সাহায্যে যে কোনও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি অনায়াসে ডক্টরেট উপাধি অর্জন করতে পারতেন। তিনি তা করেননি।' গ্রন্থটির রচনাকাল ১৯৩২। বিজ্ঞানী প্রিয়দারঞ্জন সম্পর্কে আচার্যের মন্তব্য: His recent isolation of an isomer of thiosulphuric acid is a singular achievement and marks him out as an original investigator of a high order.

সেদিন বক্তৃতার পর বসু বিজ্ঞান মন্দিরের পুরোধা আচার্য ডি এম বসু এবং প্রিয়দারঞ্জন বেরিয়ে এলেন। অনুগামী কয়েক ডজন গুণী-বিজ্ঞানী, তাঁদের কেউ কেউ ভারতের বিভিন্ন বিজ্ঞান সংস্থার দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। ব্যস্ত ছিলেন প্রিয়দারঞ্জন। তবু তারই মধ্যে সুযোগ করে তাঁর কাছে এগিয়ে গেলাম। কোন ভূমিকা না করে সরাসরি বললাম, অধ্যাপক রায়, আপনি অনুমতি দিলে এক সময়ে আপনার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে আছে। আমরা আপনার মুখ থেকে আপনার কথা শুনতে চাই, আপনার ছাত্র এবং কর্মজীবনের কথা।

মৃদু হাসলেন প্রিয়দারঞ্জন। বললেন, কী আর শুনবে? আচ্ছা, এসো।

গাড়িতে গিয়ে উঠলেন তারপর। বেশি কথা নেই, বাগাড়ম্বর নেই। আমন্ত্রণের মধ্যে আন্তরিকতা ছিল, আবেগ ছিল না।

হ্যাঁ, এটাই প্রিয়দারঞ্জনের বড় পরিচয়। বললেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে, রসায়নের ঘোষ অধ্যাপক দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, ১৯৪৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে পড়তে আসি, ওঁকে আমরা তখন যমের মত ভয় করতাম। আমরা জানতাম, ওঁর কাছে এতটুকু ফাঁকি দেবার উপায় নেই। একজন শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক বললে ভুল হবে, ওঁর ব্যক্তিত্বের স্পর্শ ই ছিল আমাদের কাছে বড় পাওনা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অজৈব-রসায়ন শাখার গবেষণার উন্নতিকল্পে ওঁর অবদান অনস্বীকার্য। এ দায়িত্বও তাঁর উপর পড়েছিল আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রেরই নির্দেশে।

জন্ম চট্টগ্রাম জেলার নয়াপাড়া গ্রামে, জানুয়ারী ১৬, ১৮৮৮। পিতা কালিকুমার রায়, মাতা শ্যামসুন্দরী দেবী। ওঁরা চার ভাই, তিন বোন। প্রিয়দারঞ্জন তৃতীয় পুত্র। কবি নবীনচন্দ্র সেন, সাহিত্যিক রজনীরঞ্জন সেন, গণিতবিদ ডঃ বিভূতিভূষণ সেন, অধ্যাপক বীরেন্দ্রবিনোদ রায় ওঁদের নিকটতম আত্মীয়। পূর্ব পুরুষদের আদি নিবাস হুগলী জেলার ত্রিবেণী গ্রাম। ১৬৬৩-১৬৮০ সালে মহারাষ্ট্র বিপ্লবের সময় ঊর্ধ্বতন নবম পুরুষ রায় আনন্দ রায় ত্রিবেণী ত্যাগ করে স্বপরিজন ত্রিপুরা রাজ্যের বকসাইর গ্রামে উঠে যান। অতঃপর নয়াপাড়ার বসতি।

প্রাথমিক শিক্ষা নয়াপাড়ার দয়াময়ী উচ্চ প্রাইমারী বিদ্যালয়ে। ১৯০৪ সালে চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে এণ্ট্রান্স পাস এবং 'রায়বাহাদুর গোলকচন্দ্র বৃত্তি' লাভ। ১৯০৬ সালে প্রিয়দারঞ্জন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের বি এ শ্রেণীতে ভর্তি হন। সেই সূত্রে ইডেন হিন্দু হোস্টেলে বাস। সেই সময়েই সুহৃদরূপে কাছে পেলেন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ডঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট মানুষদের। ওঁরা সকলেই তখন প্রেসিডেন্সির ছাত্র। আর অধ্যাপকরূপে পেলেন এইচ এস পার্সিভাল, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং মনোমোহন ঘোষের মত দিকপাল পণ্ডিতদের।

১৯০৮এ রসায়ন এবং পদার্থবিদ্যায় অনার্স নিয়ে বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং ১৯১১ সালে ঐ প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকেই রসায়ন শাস্ত্রে এম এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবর্ণ পদক এবং মতিলাল মল্লিক সুবর্ণ পদক লাভ। এম এ পড়ার সময় তাঁর সতীর্থদের মধ্যে

ছিলেন পরবর্তী সময়ের প্রখ্যাত বিজ্ঞান-অধ্যাপক ডঃ হেমেন্দ্রকুমার সেন ও বিমানবিহারী দে।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তখন প্রেসিডেন্সির রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যক্ষ। অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন আচার্যের পক্ষে প্রিয়দারঞ্জনের প্রতিভার যথাযথ মূল্যায়ন করতে বেশি সময় লাগেনি। ওঁকে আহ্বান জানালেন আচার্য। এম এ পাশ করার পর তাঁরই তত্ত্বাবধানে গবেষক-ছাত্ররূপে প্রথম আত্মপ্রকাশ প্রেসিডেন্সি কলেজেই। কিন্তু এক বছর কাজ করার পর আগস্ট ১২, ১৯২২ গবেষণার সময় আকস্মিক একটি দুর্ঘটনায় পড়লেন। উষ্ণ সালফিউরিক অ্যাসিড নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। বিস্ফোরণ ঘটল। বাঁ পাশের চোখটি চিরকালের মত নষ্ট হয়ে গেল।

১৯১৪ থেকে ১৯১৮ কলকাতার সিটি কলেজে রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপনা। এই সময়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে বিজ্ঞান গবেষণার ব্যাপারে প্রায়ই তাঁর কথাবার্তা হত। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ সবেমাত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে একটি গবেষণা কেন্দ্র গঠনের জন্যে দেশের বিজ্ঞানীদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছিলেন। আচার্য রসায়নশাস্ত্রের 'পালিত অধ্যাপক'। আশুতোষ এবং আচার্যের আমন্ত্রণে ১৯১৯ সালে প্রিয়দারঞ্জন 'সহকারী পালিত অধ্যাপক'রূপে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলেন। কাজ গবেষণা এবং অধ্যাপনা, দুইই। বিজ্ঞান কলেজের অজৈব রসায়ন বিভাগের পুনর্গঠনের দায়িত্বও পড়ল তাঁর উপর। শুরু হল ব্যাপক গবেষণার কাজ। ১৯১৯ থেকে ১৯২৮, এই নয় বছর পালিত অধ্যাপকের সহকারী পদে কাজ করার সময় তিনি অনেকগুলি মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ করার ছিল, ওই সমস্ত গবেষণা কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর উপাধি লাভের মোহ তাঁর মধ্যে কোনদিনই প্রকাশ পায়নি। ওঁর কাছে কাজের জন্যেই কাজ করা, কাজের উৎকর্ষতাই কাজের সাফল্য।

হ্যাঁ, বিদেশে তিনি গেছেন একবার। তারও উদ্দেশ্য ছিল উচ্চতর কাজকর্ম সম্পর্কে অবহিত হওয়া, পাশ্চাত্য জগতের তখনকার আধুনিকতম গবেষণাপদ্ধতির সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন, নিছক উপাধি সংগ্রহ নয়। ১৯২৯ সালে আচার্য প্রফুল্ল-চন্দ্রের উপদেশে তিনি ইউরোপ ভ্রমণে বের হন। ওই সময় তিনি সেখানকার বহু

গবেষণাগার পরিদর্শন করেন এবং সুইজারল্যাণ্ডের বার্ন-এ প্রখ্যাত বিজ্ঞানী অধ্যাপক ইমক্রের গবেষণাগারে সহকর্মীরূপে কাজ করার সুযোগ পান। কাজ করেন মাইক্রো-কেমিস্ট্রির উপর অস্ট্রিয়ার গ্রাজ-এ অধ্যাপক এমিকের সঙ্গে, অভি তা অর্জন করেছেন জার্মানী, ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, হল্যাণ্ড এবং ইংলণ্ডের রসায়ন গবেষণা কেন্দ্রে এবং বিজ্ঞান সংস্থায়। ১৯৩২ সালে লাইপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক উইলহেম্ বিউটজার (Prof. W. Bottger) রাসায়নিক বিশ্লেষণ সম্পর্কে যে প্রামাণিক গ্রন্থ প্রণয়ন এবং সংকলন করেন প্রিয়দারঞ্জন তার সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য ছিলেন। জটিল-যৌগিক পদার্থের সংযুক্তি সম্পর্কে গবেষণা, অধ্যাপনা ও আলোচনায় তাঁকে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ বললে হয়ত অত্যুক্তি হবে না। ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর প্রামাণিক গ্রন্থ Theory of Valence and the Structures of Chemical Compounds। ১৯৫১ সালে বিশুদ্ধ ও ফলিত রসায়নের আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্যোগে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত The Committee of New Reactions of the International Union of Chemistryর তিনি অন্যতম সদস্যরূপে নির্বাচিত হন। উল্লেখ করা যেতে পারে, মাত্র সাতজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন রসায়নবিদদের নিয়ে এই কমিশন গঠিত হয়েছিল। পর পর আট বছর এই কমিশনের সদস্যরূপে তিনি কাজ করেন। এর পরেও যখন তাঁকে সদস্য পদে নির্বাচিত করার প্রস্তাব করা হয়, তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে কোন নবীন বিজ্ঞানীকে ওই পদে নির্বাচন করার জন্যে পরামর্শ দেন। প্রিয়দারঞ্জনের এও এক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তরুণ কর্মীদের উৎসাহ দেবার ব্যাপারে কখনই তিনি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেননি, বরং সাহায্য করেছেন।

১৯৩৫-এ ভারতের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অভ সায়েন্স ফাউণ্ডেশনের ফেলো, ১৯৩৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নশাস্ত্রের 'খয়রা অধ্যাপক', ১৯৪৬ 'পালিত অধ্যাপক' এবং বিশুদ্ধ-রসায়ন বিভাগের অধ্যক্ষ, ১৯৪৭ ইণ্ডিয়ান কেমিকেল সোসাইটির সভাপতি, ১৯৫৭ সালে আগ্রায় অনুষ্ঠিত কেমিস্ট্রি অভ কো-অর্ডিনেশন কমপাউনডস-এর সম্মেলনের সভাপতি, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অভ সায়েন্সের অবৈতনিক কর্মসচিব এবং পরিচালক—অনেক,

আরও অনেক সম্মানই তিনি পেয়েছেন। কিন্তু সর্বত্রই সেই এক ব্যবহার, কথা কম, শুধু কাজ। মধুর স্বভাব এবং আত্মপ্রত্যয়ের জন্যে তাঁর কোথাও কোন বিতর্কের অবকাশ ছিল না। উল্লেখ্য, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটি-ভেশন অভ সায়েন্স-এর অধ্যক্ষ থাকাকালে ডঃ মেঘনাদ সাহা স্মৃতি তহবিলে বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে ব্যক্তিগতভাবে তিনি তিরিশ হাজার টাকা দান করেছিলেন। ওঁর আকাঙ্ক্ষা, দেশে সার্থক গবেষণা প্রচেষ্টা গড়ে উঠুক, যেখানে বাইরের আড়ম্বরের চেয়ে কাজের উৎকর্ষতাই হবে মূল লক্ষ্য।

সহকারীদের সঙ্গে মিলিতভাবে কাজ করে তিনি রসায়ন শাস্ত্রে দু'শরও বেশি গবেষণা পত্র প্রকাশ করেছেন। সেই সঙ্গে কিছু কিছু বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের বইও। ১৯৫৬ সালে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রণীত History of Hindu Chemistry-র আধুনিক সংস্করণ History of Chemistry in Ancient and Medieval India নামে গ্রন্থটি তাঁরই সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। ভারতীয় বিজ্ঞান-ইতিহাসের গ্রন্থমালায় এ এক অভূতপূর্ব সংযোজন। বাংলায় প্রকাশিত গ্রন্থ : বিশ্বের উপাদান, রসায়ন ও সভ্যতা, অতিকায় অণুর অভিনব কাহিনী। ৯০ বছর বয়েসেও মনের দিক দিয়ে এখনও তিনি সজীব। আধুনিক বিজ্ঞান প্রগতি সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। (ওঁর জীবনী সংকলন করতে আমাকে সাহায্য করেছেন শ্রীনীলকণ্ঠ মৈত্র, ওঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতা রইল)

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন শাস্ত্রের ঘোষ-অধ্যাপক দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় (পি-এইচ-ডি, ডি-এস-সি) তাঁর মাস্টার মশায় প্রিয়দারঞ্জন সম্পর্কে বলেন : ১৯৪৮ সালে এই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ রসায়নের স্নাতকোত্তর বিভাগে ছাত্ররূপে প্রবেশ করার পর দুটি নাম সম্পর্কে আমি সন্ত্রস্ত ছিলাম— আমাদের বিভাগীয় প্রধান পালিত-অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায় এবং তাঁর সহকারী অধ্যাপক পুলিনবিহারী সরকার। সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়ার সময়ই ওঁদের সম্পর্কে নানারকম ভীতিপ্রদ কাহিনী কানে আসত। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এসে আমাদের অগ্রজ ছাত্রদের মুখেও নানারকম আশঙ্কাজনক কথাবার্তা শুনতে পেলাম। আর তার সত্যতার প্রমাণ পেলাম যখন এম-এস-সি পরীক্ষার পর বিশেষ একটি প্রশ্নের উত্তরে অত্যন্ত প্রীত হয়ে অধ্যাপক রায় আমাকে কুড়ি নম্বরের মধ্যে তেরো নম্বর দিয়ে শতকরা পঞ্চাশ নম্বরই যে ভাল নম্বর তার ব্যাখ্যা করেন তাঁর কোন এক সহকর্মীর কাছে। এরকম উদাহরণ বহু পাওয়া যাবে।

অবশ্য পরবর্তী জীবনে এর উপকারিতা আমরা উপলব্ধি করেছি। তখন এখনকার মত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ঢালাও প্রথম শ্রেণী দেওয়ার রেওয়াজ ছিল না। তাই তখন যাঁরা অধ্যাপক রায়ের মত শিক্ষকের কাছে ছাড়পত্র পেয়েছেন, কর্মক্ষেত্রে কখনও তাঁদের ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে হয়নি। তারপর কত বছর অতিক্রান্ত হল। এই সময়ে নানা কারণে স্বল্পভাষী এবং আপাত কঠোর এই মানুষটির সংস্পর্শে এসে যে কোমল এবং স্নেহশীল অন্তরের পরিচয় পেয়েছি তার তুলনা বিরল। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় তাঁর গবেষণাগার থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময়ে তাঁর ছাত্র, শিষ্য এবং সহকর্মীরূপে কাজ করেছি। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তাঁর নিষ্ঠা এবং দায়িত্ববোধ আমাকে মুগ্ধ করেছে। দায়িত্ব পালনে কখনও তিনি নীতিবোধ বর্জন করেছেন বলে আমি জানি না। ১৯১৯ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা এবং গবেষণা করে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অজৈব-রসায়ন বিভাগটিকে তিনি ভারতের অজৈব-রসায়ন গবেষণার একটি প্রাণকেন্দ্রে পরিণত করেন। ১৯৫১ সালে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অভ সায়েন্সের অজৈব-রসায়ন বিভাগটি তাঁরই পরিকল্পনায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে ১৯৫২ থেকে ১৯৫৮-র মধ্যেই তাঁরই পরিচালনায় যথেষ্ট গৌরব অর্জন করেছিল। তাঁর শ্রেষ্ঠ কাজ ম্যাগনেটো কেমিস্ট্রি, ম্যাক্রোকেমিস্ট্রি, কেমিস্ট্রি অভ কো-অরডিনেশন কম্পাউণ্ডস এবং মেটাল বাইগুয়ানাইডস-এর উপর—যা তাঁকে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানীরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তবে তার চাইতেও বড় কথা, বিজ্ঞানের স্থূল আঙ্গিককে অতিক্রম করে তাঁর মধ্যে আমরা সন্ধান পেয়েছি একজন যথার্থ মানবপ্রেমিককে। তিনি মনে করেন There is every reason to expect that Science would show us the right way to peace and freedom for mankind by its rationalising influence upon human mind and human ideas.

জগদীশচন্দ্র স্মৃতি বক্তৃতার পর কতকগুলি গবেষণাপত্র পরীক্ষার ব্যাপারে বেশ কিছুদিন ব্যস্ত রইলেন। মাঝে শরীরটাও ওঁর খারাপ গেল। মাত্র কয়েকদিন আগে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে জানালেন, মাস্টারমশাই এখন কিছুটা সুস্থ। কথাবার্তা বলতে পারেন, বেশি নয়।

উত্তরে জানালাম, খুব বেশি সময় আমি নেব না। কোন তত্ত্ব বা রসায়ন জগতের জটিল কোন সমস্যার ব্যাপার জানার চেয়ে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কিছু কিছু অভিজ্ঞতা বা ধারণা, সেটাই আমাদের কাছে অনুপ্রেরণার মত কাজ করবে।

রবীনবাবু জানালেন, আসুন। তবে বিকেল চারটের মধ্যে। সন্ধের দিকে উনি একটু বেড়াতে বেরোন।

যথাসময়ে প্রিয়দারঞ্জনের বাড়ির পাঠাগারে গিয়ে উপস্থিত হলাম। রবীনবাবুও আমার অনুরোধে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। প্রিয়দারঞ্জনের তিনি ছাত্র। কথা ছিল, তাঁর মাস্টারমশাই-এর স্মৃতিচারণের সময় তিনি আমাকে সাহায্য করবেন।

কয়েক মিনিট পর পাঠাগারে প্রবেশ করলেন প্রিয়দারঞ্জন। মুখে স্বভাবসুলভ বিনম্র হাসি। সামান্য দু একটি প্রাসঙ্গিক কথাবার্তা বলার পর বললেন, কী জিগ্যেস করবে, কর।

বিরক্তি নয়, কাজের প্রতি আনুগত্য। মনে হল আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের নিয়মানুবর্তিতা এখনও তাঁর মধ্যে সক্রিয়।

আমাদের কথা শুরু হল তখনই।

প্রশ্ন : অধ্যাপক রায়, আপনি যখন স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্র, সেই সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন শাস্ত্রের পঠন-পাঠনের সুযোগ সুবিধে কী ধরনের ছিল, অনুগ্রহ করে একটু বলুন।

অধ্যাপক : ঠিক বিশ্ববিদ্যালয় কথাটা বললে ভুল হবে। কারণ তখনও পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নের উপর কোন স্নাতকোত্তর কোর্স খোলা হয়নি। আমাদের সময় প্রথম প্রেসিডেন্সি কলেজেই দুই বছরের এম এ, এবং এম এস-সির রসায়ন বিভাগ খোলা হয়। শিক্ষকদের মধ্যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তো ছিলেনই, আর ছিলেন চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী। এঁর কোন উচ্চতর ডিগ্রি ছিল না। ইনি ডেমনস্ট্রেটরের কাজ এবং অ্যাডমিনিসট্রেশন দুই-ই দেখতেন। আগে বিভাগীয় প্রধান ছিলেন স্যার আলেকজাণ্ডার প্যাডলার। প্যাডলারের পর ওই পদে আসেন কানিংহাম। ওঁরা দুজনই আচার্যকে যথেষ্ট সম্মান করতেন। তখন ভারতীয় অধ্যাপকদের মধ্যে আরও ছিলেন জ্যোতিভূষণ

ভাতুড়ী। ইনি ফিজিকেল কেমিস্ট্রি পড়াতেন। জৈব রসায়ন পড়াতেন প্রফুল্লচন্দ্র। বি এস-সি ক্লাসে তিনি অজৈব রসায়নও পড়াতেন। ওই সময়ে বি এস-সি'তে রসায়ন এবং পদার্থবিদ্যা মিলিয়ে একটাই পেপার তৈরি হত। রসায়ন শাস্ত্রে এম এস-সি ডিগ্রি পরীক্ষায় আমাদের সময়ই এখনকার মত প্রথম আটটি পেপার চালু হয়। তবে হ্যাঁ, এখনকার দিনে সুযোগ বলতে যা বোঝায় তেমন কিছু আমাদের সময় ছিল না। অবশ্য কাজ যেটুকু হতো এক্সটেনসিভই হতো।

প্রশ্ন : অধ্যাপক রায়, অন্যান্য অধ্যাপকদের তুলনায় আচার্য জগদীশচন্দ্রের পড়ানর ধরনটা নাকি কিছুটা স্বতন্ত্র ছিল। শুনেছি—

অধ্যাপক : খুবই স্বতন্ত্র। ওঁর পড়ানর কায়দাটাই ছিল অন্যরকম। অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতেন তিনি। বি এস-সি পাশ এবং অনার্স ক্লাশ তিনি এক সঙ্গে নিতেন। তিনি পড়াতে আসার আগে ছাত্ররা এসে বসে থাকত। সেই সঙ্গে পড়ানর সময় যে সমস্ত পরীক্ষা করা হবে, তার সমস্ত যন্ত্রপাতি এবং উপকরণ প্রস্তুত রাখা হত। ক্লাশ নিতেন খুব কম সময়ের জন্যে, পনের কুড়ি মিনিটের বেশি নিতেন না। উনি পড়াতেন, সেই সঙ্গে একের পর এক চলত পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ। কম সময়ের জন্যে পড়ালে কী হবে, ছাত্ররা মন্ত্রমুগ্ধের মত বসে থাকত।

প্রশ্ন : আপনাদের পাঠক্রমের সঙ্গে সমসাময়িক পাশ্চাত্য-পাঠক্রমের পার্থক্য কতটা ছিল?

অধ্যাপক : তেমন কোন পার্থক্য ছিল না। তবে এখানকার পঠন পদ্ধতিটি তেমন ভাল ছিল না।

প্রশ্ন : স্নাতকোত্তর পাঠের পর গবেষণার ব্যাপারে কতটা সুযোগ-সুবিধে আপনারা পেতেন, অধ্যাপক রায়?

অধ্যাপক : প্রথম দিকে গবেষণার ব্যাপারে মোটেই কোন সুযোগ সুবিধে ছিল না। পরে প্রফুল্লচন্দ্র এবং জগদীশচন্দ্র—ওঁরা সরকারের সঙ্গে ফাইট করে গবেষণা উপলক্ষে কিছুটা অর্থ সংগ্রহ করেন। প্রেসিডেন্সিতেই প্রথম গবেষণার সূচনা হয়। ওই সময়েই আমি গবেষণার কাজ শুরু করি। সেটা ১৯১১। আমার প্রথম গবেষণা হাইড্রাজিন এবং ফেরিসায়ানাইড ডিটার-মিনেশনের উপর ছিল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রই প্রেসিডেন্সি কলেজে স্কুল অভ

কেমিস্ট্রি প্রথমে শুরু করেন।

প্রশ্ন : শুনেছি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র অনেক সময় উচ্চতর ডিগ্রিবিহীন, অথচ মেধাবীদের কাছে টেনে নিয়ে গবেষণার কাজে লাগিয়ে দিতেন।

অধ্যাপক : কথাটা মিথ্যে নয়। জিতেন রক্ষিতের কথা ধর। উনি বি এস-সি পাশ করতে পারেননি। কারণ অবশ্য অন্য। ওই সময় বেশ কিছু ছাত্র স্বাদেশিকতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ থাকায় ডিগ্রির মোহ তাঁদের অনেকেরই ছিল না। এই জিতেন রক্ষিত খুব বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। আচার্য ওঁকে ধরে এনে গবেষণার কাজে লাগিয়ে দেন। পরে ওঁর সঙ্গে পেপার তৈরি করেন। পরবর্তীকালে উনি গাজীপুরে আফিম রসায়ন বিভাগের প্রধান এবং রয়েল ইনসটিটিউট অভ কেমিস্ট্রির ফেলো নির্বাচিত হন। হ্যাঁ, ঐ গবেষণার সুযোগের কথা যা বলছিলাম। আমাদের সময়ে নিজের পেপার নিজের গাইড-এই করতে হত। তখন ডি ফিল ছিল না, ডি এস সি ছিল। গবেষণা-পত্রের মান নির্ধারণ করা হত বিদেশে, বিদেশী পরীক্ষকরাই তা করতেন। আমাদের সময়কার লণ্ডনের ডি এস সি ছিলেন ডঃ এইচ কে সেন। ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম ডি এস সি পান সম্ভবত রসিকলাল দত্ত। পরে তিনি পোস্ট গ্রাজুয়েট লেকচারার হন। আমাদের সময়ে গবেষণার জন্যে মাত্র তিনজন অধ্যাপক টাকা পেতেন—পালিত অধ্যাপক ২০০০ টাকা, ঘোষ এবং খয়রা অধ্যাপক প্রত্যেকে এক হাজার টাকা পেতেন। সাধারণ অধ্যাপকরা কোন অর্থসাহায্য পেতেন না। পড়ানর জন্যে যে সমস্ত মালমশলা আসত তা থেকে কিছুটা বাঁচিয়ে সংগ্রহ করে প্রথম দিকে নিজেদের গবেষণা আমাদের চালাতে হয়েছে। পরে স্যার আশুতোষের চেষ্টায় আমরাও বছরে দু'শ আড়াই'শ টাকার মত গ্রাণ্ট পেতে থাকি। তবে ওই সীমিত সুযোগ সুবিধের মধ্যেও কাজ যেটুকু হত, তা এখনকার বেশির ভাগ কাজের থেকে অনেক নির্ভরযোগ্য।

প্রশ্ন : অধ্যাপক রায়, আপনার দীর্ঘ জীবনে ভারতের বহুমুখী গবেষণার সঙ্গে আপনি কোন না কোনভাবে জড়িয়ে রয়েছেন। আপনার কী মনে হয়, স্বাধীনতার পর আমাদের জাতীয় গবেষণায় তেমন কি কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসেনি?

অধ্যাপক : তা কেন আসবে না। আমাদের পরবর্তীকালে ক্রমে শিক্ষণ এবং

গবেষণায় অনেক উন্নতি ঘটেছে। গবেষকের সংখ্যা বেড়েছে, সেই সঙ্গে সুযোগ এবং বিভিন্নমুখী ক্ষেত্র। স্বাধীনতা পাওয়ার পরও কোন কোন গবেষণাগারে ভাল কাজ হয়েছে। তবে ইদানীং অর্থাৎ গত দশ বছর কাজের মান খুব কমে গেছে। স্পিরিট অভ ডিভোশন কমেছে, ডেডিকেটেড স্পিরিটের অভাব লক্ষ করছি। এর প্রধান কারণ, স্বাধীনতার পর দেশে প্রচুর গবেষণাগার খোলা হল। সে তুলনায় যোগ্য গবেষক শিক্ষক পাওয়া গেল না। স্বল্প যোগ্যতা সম্পন্ন লোকের উপর ভার পড়ল কাজ চালানর। এর ফলে অনেক প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন তরুণ কাজে বাধা পেতে লাগলেন।

প্রশ্ন : এই মানের ব্যাপারে আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কিছু বলুন।

অধ্যাপক : বলব? বলার অনেক আছে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে, অনেক গাইড এখন মনে করেন, যত বেশি সংখ্যক ডি ফিল তিনি তৈরি করতে পারবেন, ততই তাঁর সম্মান, বড় বড় প্রমোশন মেলে। অবশ্য প্রচলিত অবস্থায় ব্যক্তিগত স্বার্থে তা লেগেও যায়। কিন্তু এটা করতে গিয়ে পরিস্থিতিটা কেমন দাঁড়ায়, শোন। কিছুদিন আগে ভারতীয় কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমার কাছে একটি থিসিস পরীক্ষার জন্যে পাঠান হয়। আমার সহ-পরীক্ষক ছিলেন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিখ্যাত এফ আর এস। ডি ফিল-এর ঐ থিসিসটা পড়ে আমি রিজেকট করি। রেজিস্ট্রার আমাকে লিখে পাঠালেন, আপনি তো রিজেকট করলেন, কিন্তু লণ্ডন ইউনিভার্সিটির ওই অধ্যাপক কিন্তু ওটিকে রেকমেণ্ড করেছেন। আমি উত্তরে তাঁকে লিখলাম, আমার রিপোর্টটা ওই পরীক্ষকের কাছে পাঠিয়ে তাঁর কী রিঅ্যাকসন হয়, আমাকে জানাবেন। লণ্ডন থেকে পরে ভদ্রলোক জানান, আমি যেসব ত্রুটি দেখিয়েছি সবই সত্য। তবে অনেক ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে সমস্ত থিসিস তাঁর কাছে পাঠান হয়, তার বেশির ভাগই ওই ধরনের। তাই তিনি রেকমেণ্ড করেছেন। এমনও হয়েছে, থিসিস রিজেক্ট করা হলে, থিসিসের যিনি গাইড, তিনি স্বয়ং পরীক্ষকের কাছে এসে সেটিকে অনুমোদন করিয়ে নেবার চেষ্টা করেন।

প্রশ্ন : গবেষণাপত্র দাখিল করার ব্যাপারে শুনেছি বেশ কিছু অব্যবস্থাও এখন ধরা পড়েছে। এ সম্পর্কে আপনার কী বক্তব্য, অধ্যাপক রায়?

অধ্যাপক : সবচাইতে বড় ত্রুটি, রিসার্চ ল্যাবোরেটারিগুলিতে অনেক সময় দেখা যায়, যিনি যে বিষয়েই কাজ করুন না কেন, তাঁর গবেষণাপত্র প্রকাশের সময় তাতে বিভাগীয় অধ্যক্ষের নাম জুড়ে দিতে হয়। এটা এখন একেবারে রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা থাকুক বা না থাকুক। এটা না করলে গবেষণাপত্র প্রকাশের অনুমতিই পাওয়া যায় না। এর ফলে গবেষণা প্রকাশের ব্যাপারে তরুণ বিজ্ঞানীরা মোটেই উৎসাহ পান না। এ ছাড়াও, গবেষকরা যদি তাঁদের উপরস্থ কর্মীর প্রীতিভাজন না হন, বাধা আসে। পাছে নিজের দুর্বলতা অর্থাৎ অযোগ্যতা ধরা পড়ে, তার জন্যে অনেক গাইড খুব ভাল ছাত্রদের এড়িয়ে চলেন। অনেক গাইড তো নিজে হাতে পরীক্ষাও করে দেখেন না, অফিসে বসে টাইপ করে হুকুম দেন, আর দেশ বিদেশে মিটিং করে বেড়ান।

প্রশ্ন : অধ্যাপক রায়, কোন কোন দেশে বিজ্ঞানের-ইতিহাস নামে একটি কোর্স বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটার মূল্য অনেক বেশি। এক, এতে করে প্রাচীন যুগের বিজ্ঞানের অগ্রগতি কীভাবে ধাপে ধাপে ঘটেছিল, সেটা জানা যাবে। দুই, জীবনের সঙ্গে বিজ্ঞানের অর্থবহুল সম্পর্কটি বিজ্ঞানের ছাত্রদের কাছে স্পষ্ট হবে। তিন, বিশেষ করে সেটা যদি স্বদেশের হয়, তাতে নিজেদের ওপর শ্রদ্ধাও বাড়বে। আচ্ছা, এ ব্যাপারে আপনার কী অভিমত? কাজই বা কতদূর এগিয়েছে?

অধ্যাপক : তোমার এক, দুই এবং তিন নম্বর বক্তব্য সম্পর্কে আমি একমত। তবে কাজের কথা যদি বল, খানিকটা কটু মন্তব্য করতে হয়। ভারতের বিজ্ঞান-ইতিহাস রচনার ব্যাপারে ডঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তো পথিকৃৎ হয়েই রয়েছেন। (উল্লেখ্য, প্রিয়দারঞ্জন নিজেও একজন) কিছুদিন আগে ন্যাশনাল ইনসটিটিউট অভ্ সায়েন্সের উদ্যোগে প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানের ইতিহাস লেখার ব্যবস্থা হয়েছে। গত দশ বছর কাজ চলছে। তার সভ্য পঁচিশ তিরিশজন হবে। বছরে তাঁদের সভা-সমিতি বসে দু' তিনবার। তার খরচ এবং শুনছি অন্যান্য বাবদ বাজেট ধরা হয়েছে এক লক্ষ টাকার মত, বছরে। অতএব দশ বছরে কত খরচ হল ভাব। এখনও সেই সংকলনের কাজ শেষ হয়নি। শোনা যাচ্ছে, শীঘ্র হবে। অথচ

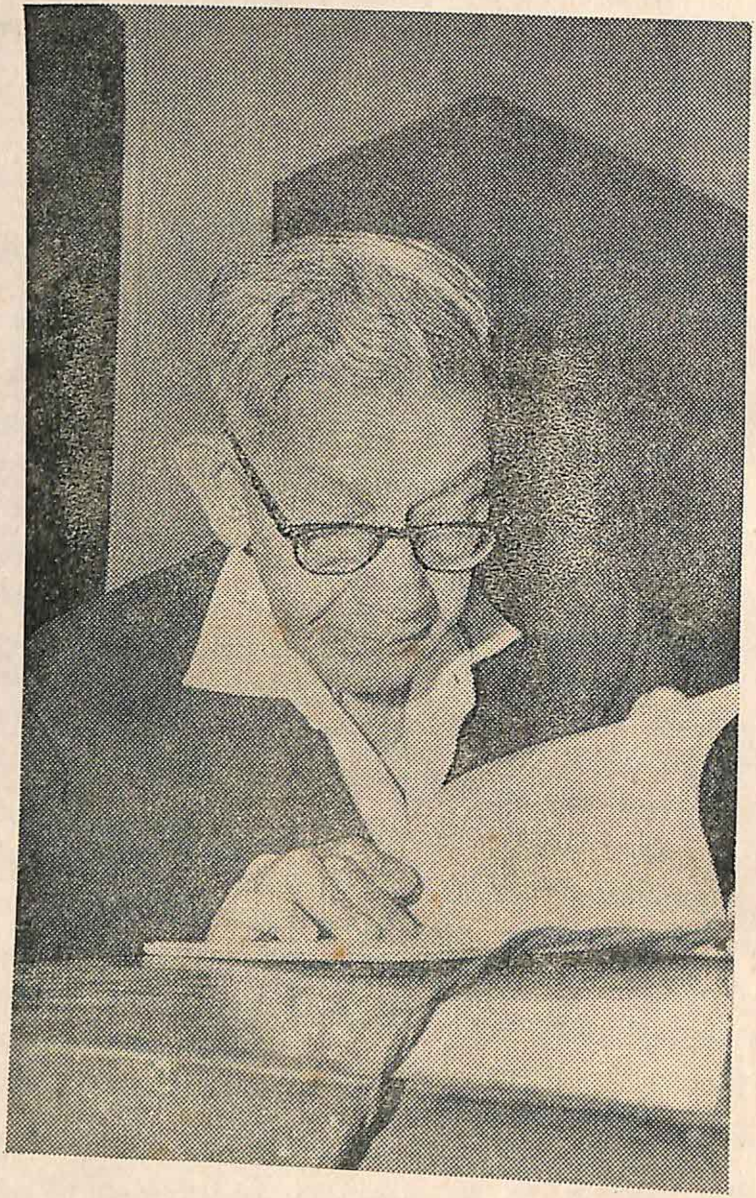
যে কোন একজন যোগ্য বিজ্ঞানী, যিনি প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান সম্পর্কে অবহিত আছেন, তাঁকে হাজার পনের টাকা দিলে যে ধরনের বই প্রকাশিত হতে চলেছে, তার চেয়ে কিছু নিচু মানের কাজ হত না। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, ডঃ বিভূতি দত্ত মহাশয় হিসটোরি অভ্‌ হিন্দু ম্যাথেমেটিকস-এর দুটি খণ্ড প্রকাশ করে গেছেন। এর চেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য বই এখনও কেউ প্রকাশ করতে পারেননি।

অধ্যাপক রায় বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা প্রসঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্রের উক্তিটি স্মরণ করিয়ে দেন :

'While there is a gain in quantity, there is corresponding deterioration in quality. The average graduate is found to be a licensed ignoramus. In fact, in the course of my several lectures, I have not hesitated to say that the degree only serves as a cloak to hide degree holder's ignorance.

তাঁর বক্তব্য, উচ্চতর গবেষণার মান উন্নত করতে হলে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে মাধ্যমিক এবং কলেজীয় শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে ব্যাপক পুনর্বিন্যাসের দরকার। মূল লক্ষ্য হবে, যথাযথ একটি আত্মনির্ভর ব্যক্তিত্বকে তৈরি করা। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এই লক্ষ্যপথে অনেকটা এগিয়েছিলেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন এইচ কে সেন। তিনিই প্রথম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলিত-রসায়ন বিভাগটির প্রতিষ্ঠা করেন ; ডঃ বি কে দে প্রভৃতি। আচার্যের প্রেরণায় যাঁরা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে আছেন প্রখ্যাত রসায়নবিদ ডঃ নীলরতন ধর, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ডঃ মেঘনাদ সাহা, ডঃ পুলিনবিহারী সরকার প্রমুখ বিশিষ্ট বিজ্ঞানী। উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করেও আচার্যের আদর্শে যাঁরা স্বাধীন বৃত্তিতে প্রবেশ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রখ্যাত পুস্তক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান চক্রবর্তী চ্যাটার্জি অ্যাণ্ড কম্পানির মুকুন্দ চক্রবর্তী, রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী এবং অহীন্দ্র চ্যাটার্জি, ক্যালকাটা কেমিকেলের ভূতপূর্ব ম্যানেজিং ডাইরেক্টার বীরেন্দ্রনাথ মৈত্র, প্রিয়দারঞ্জনের সহপাঠী এবং নদীয়া কেমিকেলস-এর প্রতিষ্ঠাতা ক্ষিতিভূষণ ভাদুড়ী।

ভারতীয় আধ্যাত্মিকতায় অপরিসীম বিশ্বাস প্রিয়দারঞ্জনের। মহাত্মা গান্ধীর তিনি অনুরাগী। ওঁর বিশ্বাস, বিজ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে মানবিক সম্পর্কের যথাযথ সমন্বয় ঘটানর ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি দেওয়া উচিত।



জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কলয়েড বা আঠাল বস্তুর ভৌত এবং রাসায়নিক গুণাগুণ এবং বিভিন্ন শিল্পে ওই ধরনের সামগ্রীর প্রয়োজনীয়তা কতখানি এই নিয়ে ২৫ অক্টোবর, ১৯২০ ইংলণ্ডে 'দ্য ফ্যারাডে অ্যাণ্ড ফিজিক্যাল সোসাইটিজ' একটি আলোচনাচক্রের ব্যবস্থা করেছিলেন। আলোচনাচক্রে মূল বিষয়বস্তুর উপস্থাপনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন সুইডেনের উপ্‌সালা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী অধ্যাপক থিওডর স্তেদ্‌বার্গ। তার পাঁচটি শাখার উদ্বোধকের ভূমিকায় ছিলেন সে সময়কার ছয়জন প্রথিতযশা বিজ্ঞানী। অধ্যাপক এফ জি ডোনান, ই হ্যাৎশেক এবং অধ্যাপক এইচ আর প্রোকটার, স্যার হার্বার্ট জ্যাকসন, স্যার রবার্টসন এবং অধ্যাপক এ ডব্লু পোর্টার।

বিদগ্ধ এই আলোচনাচক্রে ভারতের তরুণ বিজ্ঞানী জ্ঞানেন্দ্রনাথ যে গবেষণাপত্রটি উপস্থাপিত করেছিলেন তার শিরোনাম: 'দ্য অরিজিন অব দ্য চার্জ অব এ কলয়ডেল পার্টিকল্‌ অ্যাণ্ড ইট্‌স নিউট্র্যালাইজেশন বাই ইলেকট্রোলাইটস'।

বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞান-পত্রিকা নেচার: (৪ নভেম্বর, ১৯২০ সংখ্যার পৃষ্ঠা ৩২৭-৩২৯) আলোচনাচক্রটির প্রতিবেদন প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিল: Perhaps the most important paper of the whole discussion, in that it represented a distinct advance in theory was that by Mr J. N. Mukherjee in section (5).

জ্ঞানেন্দ্রনাথের বয়েস তখন ২৭। আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানীমহলে সম্ভবত এই তাঁর প্রথম প্রবেশের সূত্র।

উল্লেখ করা যেতে পারে, দ্রাব্যতার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন বস্তুকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। ক্রিস্ট্যালয়েড এবং কলয়েড। সাধারণ উদাহরণ হিসেবে প্রথম শ্রেণীর মধ্যে পড়ে চিনি, লবণ প্রভৃতি। এদের বৈশিষ্ট্য জলীয় দ্রবণে এরা এমনভাবে মিশে থাকে যে, অণুবীক্ষণের সাহায্যেও এদের উপস্থিতি কখনই ধরা

পড়ে না। কারণ, জলের সঙ্গে মিশে এরা তৈরি করে সমসত্ত্ব দ্রবণ বা হোমোজেনাস মিকসচার। কিন্তু কলয়েড-এর ব্যাপারটা ভিন্নতর। যেমন ধরুন, স্টার্চ, গঁদের আঠা প্রভৃতি। এই সব বস্তুর অণু আয়তনে বড়। জলীয় দ্রবণে এদের অবস্থাটা গিয়ে দাঁড়ায় আঠার মত। কেমন যেন চটচটে, থলথলে ভাব। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জলের বদলে যদি অন্য কোন তরল পদার্থকে দ্রাবক হিসেবে নেওয়া যায়, তা হলে দেখা যাবে, জলে যে বস্তুটি ক্রিস্ট্যালয়েড হিসেবে কাজ করে, ওই তরলে হয়তো সেটা কলয়েড-চরিত্র পেয়ে গেছে। বলা বাহুল্য, শিল্পজগতে কলয়েড-বিজ্ঞানের ভূমিকা এখন প্রায় অপরিহার্য।

'কিন্তু আমাদের যখন ছাত্র অবস্থা, এই ১৯১০-এর দশকের গোড়ার কথাই বলি, বিশেষ এই বিজ্ঞানটি নিয়ে শুধু এ দেশেই নয়, সারা পৃথিবীতেই ব্যাপক হারে যে কাজ হয়েছিল তা বলব না। কিছু কিছু জার্নাল এবং বইপত্র ঘেঁটে যেটুকু শেখা সম্ভব, তাই নিয়েই ভাবনা চিন্তা করছিলাম।' পুরনো স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে মন্তব্য করলেন পরিণতবয়স্ক বিজ্ঞানী ডঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। এই ভাবনাচিন্তা এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (তখনও অবশ্য এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের স্নাতকোত্তর পঠন-পাঠন শুরু হয়নি) সীমিত সাজ-সরঞ্জাম নিয়েই শুরু হয়েছিল গবেষণার কাজ। গবেষণাপত্রও লেখা হল। শিরোনাম : ইলেকট্রিক সিনথেসিস অব কলয়েডস। বাংলায় যাকে বলা চলে কলয়েডের তড়িৎ-বিশ্লেষণ। জার্নাল অব দ্য অ্যামেরিকান কেমিকেল সোসাইটি (খণ্ড ৩৭, পৃষ্ঠা ২০২, ১৯১৫) প্রবন্ধটি প্রকাশ করল।

অতঃপর এই কলয়েড নিয়েই একের পর এক গবেষণার শুরু। শুধু শিল্প নয়, মৃত্তিকা-বিজ্ঞানেও যে এই বিশেষ দিকটি নতুন চিন্তার খোরাক যোগাতে পারে, মাটির গুণাগুণ বিচারের ক্ষেত্রে কলয়েড-সংক্রান্ত জ্ঞান যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার —ভারতে এমন একটি মৌলিক চিন্তাভাবনার উদ্গাতা জ্ঞানেন্দ্রনাথই প্রথম। বিশেষ করে বিভিন্ন ধরনের খনিজ-মৃত্তিকা বা ক্লে-মিনারেলস এবং হাইড্রোজেনঘটিত মৃত্তিকার তড়িৎ-রাসায়নিক ও কলয়েড-ধর্ম, তার উপর তাঁর গবেষণা এবং মৌলিক তথ্যাবলী পৃথিবীর বিজ্ঞানী মহলে তাঁকে প্রথম সারির বিজ্ঞানীরূপে পরিচিত করেছে। ভারতে কলয়েড বিজ্ঞান, খনিজ মৃত্তিকা যেমন কেওলিন প্রভৃতি এবং মৃত্তিকা সংক্রান্ত তড়িৎ রসায়ন ও মৃত্তিকা বিজ্ঞানের বিশিষ্ট কয়েকটি শাখার উপর বস্তুনিষ্ঠ গবেষণার তিনি প্রবর্তক। উত্তরকালে এ সবের উপর আরও ব্যাপক

গবেষণার কাজ পল্লবিত হয়ে উঠেছে।

আন্তর্জাতিক সম্মান? হ্যাঁ, সে সম্মান তিনি পেয়েছেন জীবনের গোড়া থেকেই। আলট্রা-মাইক্রোসকোপ বা অতি-অণুবীক্ষণের আবিষ্কর্তা এবং নোবেল বিজ্ঞানী অধ্যাপক আর জিগমণ্ডি (R Zsigmondy) তাঁর গ্রন্থ 'কলয়েড কেমি'র পঞ্চম সংস্করণে লিখেছেন : ডঃ মুখারজি কলয়েড-রসায়নের অন্যতম উদ্গাতা। স্যার জন রাসেলের মন্তব্য : Dr. Mukherjee's work was clearing up a 'lot of difficulties in regard to chemical constitution of clay substances in the soil, which was of fundamental importance for its study.'

কূপ খননের সময় যে কাদা ওঠে সেই কাদার তড়িৎ-রাসায়নিক ধর্ম, কলয়েডের ঘনীভবন এ সব থেকে শুরু করে কৃষি-বিজ্ঞানেরও নানা রকম সমস্যা নিয়ে আজীবন তিনি মাথা ঘামিয়েছেন। ভারতে আধুনিক পদ্ধতিতে মাটির উপর সমীক্ষা নেওয়ার কাজ তিনিই প্রথম চালু করেছিলেন। মাটিতে কী কী জিনিসের ঘাটতি থাকলে শস্য এবং বিভিন্ন গাছপালা কী কী ধরনের রোগে আক্রান্ত হতে পারে, এ ব্যাপারে ভারতীয় মাটির গুণাগুণ কতটা অথবা এমন সব উপাদান (ট্রেস্ এলিমেণ্ট) উদ্ভিদের পুষ্টির জন্যে যাদের বেশি পরিমাণে যে দরকার তা নয়, অথচ যাদের অভাবে উদ্ভিদের বাড়বাড়ন্ত বাধা পায়— সে সব নিয়েও সার্থক বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা এ দেশে তিনিই প্রথম প্রবর্তন করেন।

জন্ম ২৩ এপ্রিল, ১৮৯৭। বাংলা দেশের রাজশাহী জেলার মহাদেবপুর গ্রামে। খুব কম বয়েসেই বাবা মারা যান। তখন অভিভাবক বলতে দাঁড়াল মামারা। ১৯০৯ সালে বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল স্কুল থেকে এণ্ট্রান্স পাশ।

'হ্যাঁ, সেটাই শেষ এণ্ট্রান্স পরীক্ষা। এর পর শুরু হয় ম্যাট্রিক্যুলেশন।' পরিণতবয়স্ক বিজ্ঞানী স্মৃতিচারণ করলেন।

বললেন, 'বর্ধমান থেকে এলাম কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে। আমার মামাদের ইচ্ছে, আমি উকিল হই। তা হলে স্বাধীন পেশা নিয়ে জীবনযাপন করতে পারব, বিদেশী সরকারের চাকরি নিয়ে আর দাসত্ব করতে হবে না। তাই ইণ্টার আর্টস-এ ভর্তি হলাম।'

'এর আগে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, আচার্য জগদীশচন্দ্র এঁদের নামটাম তেমন

শুনিনি। কিন্তু প্রেসিডেন্সি কলেজে আসার পর এঁদের সম্বন্ধে জানতে পেলাম। আর তখনই আমার মত পালটে গেল। ঠিক করলাম বিজ্ঞান পড়ব। প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সঙ্গে দেখা করে মনের কথা জানালাম। ছাত্রদের তিনি খুব ভালবাসতেন। সুযোগও পেলাম। একজন ছাত্র বিজ্ঞান বিভাগ থেকে কলা বিভাগে ট্রান্সফার নিল। এই সুযোগে আমিও কলা বিভাগ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে চলে এলাম। ইণ্টার সায়ান্স ক্লাসে প্রফুল্লচন্দ্র আমার অধ্যাপক ছিলেন।'

পরিণত বয়েস। তবু পুরনো স্মৃতিগুলি এখনও যেন জীবন্ত। জীবন্ত তাঁর মানসিকতাও। বিজ্ঞানী বলতে অনেক সময় যেমন ঢিলেঢালা একটা মানুষের চেহারা আমরা কল্পনা করি, পরিণত বয়েসেও জ্ঞানেন্দ্রনাথের মধ্যে তেমন কোন চেহারা নিশ্চয় কেউ খুঁজে পাবেন না। লম্বা, উন্নতনাসা। অত্যন্ত সুপুরুষ চেহারার মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রনাথের দুটি চোখ এখনও তরুণ। এখনও অনুসন্ধানী। কথাবার্তায় এখনও তিনি নিয়মানুবর্তী। টু দ্য পয়েণ্ট। আর মানসিকতায় ভারতীয় হয়েও মেজাজে পুরোপুরি সাহেব। চালচলন এবং পোশাকেও।

কথা বলছিলাম কলকাতার তালতলায় তাঁর নিজের বাড়িতে বসেই। আগে থেকেই ঠিক ছিল আমি কখন তাঁর সঙ্গে দেখা করব। নির্দিষ্ট সময়ে গিয়ে দেখি তিনি প্রস্তুত হয়ে রয়েছেন। নিজস্ব পড়ার ঘরে। টেবিলের ওপর পর পর সাজান ফাইলপত্র। বুঝলাম কাজ করছিলেন তিনি।

বললেন, 'জীবনী লিখছি। অনেক ঘটনা। ছাত্র জীবনের, গবেষণার সময়কার, তারপর কর্মজীবনে যা দেখলাম, যা করলাম সে সবের একটা রেকর্ড থাকা দরকার।'

না। কথাবার্তায় জ্ঞানেন্দ্রনাথ এখনও কোন ভূমিকা করেন না। সমস্ত বক্তব্যই স্পষ্ট করে বলতে চান সব সময়। 'তবু', কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে বললেন, 'অনেক কথা। বলে যাচ্ছি। জানি না কোনটা তোমাদের ভাল লাগবে, কোনটা লাগবে না। ইচ্ছে মত জুড়ে নিও। বাদ দেবার হলে বাদ দিও।'

প্রশ্ন: আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সম্বন্ধে কিছু বলুন।

উত্তর: খুব যে ভাল একটা পড়াতে পারতেন তিনি বলব না। তবে মানুষ হিসেবে তিনি ভাল ছিলেন। ছাত্রদের খুব ভালবাসতেন। দরকার হলে

টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্যও করতেন। সরাসরি ছাত্র হিসেবে ওঁর কাছে আমি পড়েছিলাম দু বছর। তবে তারপরেও আমাদের দুজনের সম্পর্কটা খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।

প্রফুল্লচন্দ্রের কথা বলার ব্যাপারে জ্ঞানেন্দ্রনাথের যেন ক্লান্তি নেই। বললেন, 'মজার কথা বলি শোন। প্রফুল্লচন্দ্র খাবার-দাবারের ব্যাপারে বড় কৃপণ ছিলেন। একবার আমাকে বললেন, কলেজের পর বিকেলে আমার ওখানে আসিস। জলখাবারের নেমন্তন্ন। গেলাম। কিন্তু জলখাবার? ও মা। একটা বিস্কুট আর এক পেয়ালা চা। দেখ। এই জলখাবার। এমনটি জানলে কেউ আসে?'

'আরও একটা মজার কথা বলি। জগদীশচন্দ্রের ভগিনীর সঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্রের প্রীতির সম্পর্ক ছিল। বিয়ে হওয়ার পরও ভদ্রমহিলাকে তিনি উপহার বা চিঠিপত্র পাঠাতেন। সে সব কখনও কখনও আমিই নিয়ে গিয়ে দিয়ে আসতাম।'

প্রশ্ন: জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর: প্রফুল্লচন্দ্রের চালচলন যেমন সাদাসিধে ছিল, জগদীশচন্দ্র সে তুলনায় ছিলেন উল্টো। একেবারে ব্রিটিশ অ্যারিস্টোক্রাট্। খুব টিপটপ থাকতেন। ছাত্রদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন কম। ক্লাসে আসতেন পনের মিনিট দেরি করে। যেতেন ক্লাস শেষ হওয়ার পনের মিনিট আগে। তবে পড়াতেন খুব ভাল। যা পড়াতেন, মনে গেঁথে যেত। প্রত্যেকটি বিষয় এক্সপেরিমেণ্ট করে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিতেন।

হ্যাঁ। সতীর্থদের মধ্যে ছিলেন মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, প্রাণকৃষ্ণ পারিজা, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, পি বি সরকার প্রমুখ।

মেঘনাদ সাহার কথা বলতে গিয়ে জ্ঞানেন্দ্রনাথ উচ্ছ্বসিত। বললেন, সেবার দামোদরে বন্যা হল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের নেতৃত্বে আমরা ত্রাণ কাজে লেগে গেলাম! ওই সময়ই কীভাবে দামোদর নদীকে নিয়ন্ত্রিত করলে বন্যার হাত থেকে এই অঞ্চলের মানুষদের রক্ষা করা যায় মেঘনাদ তা নিয়ে ভাবতে শুরু করেন।

'আসল কথা এই, যে সব বৈজ্ঞানিক গবেষণা নিয়ে আমরা মাতামাতি করছি, যদি তারা দেশের উপকারে না লাগে, সে সব ধুয়ে কি আমরা জল

খাবো ?' দেখলাম বর্তমান বিজ্ঞান গবেষণা এবং তার প্রয়োগের ব্যাপারে জ্ঞানেন্দ্রনাথ রীতিমত ক্ষুব্ধ।

ক্ষুব্ধ। বিশেষ করে বর্তমান কৃষি পরিকল্পনার ব্যাপারে।

প্রসঙ্গটি তুলতেই তিনি উষ্মার সঙ্গে মন্তব্য করলেন, কৃষি গবেষণা নিয়ে বড় পরিকল্পনা হচ্ছে। কিন্তু যাদের জন্যে সে সব গবেষণা তাদের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। আরে, সমস্যা তো আর গবেষণাগারে জন্মায় না। জন্মায় মাঠে। সেই মাঠে যারা কাজ করে, যারা শস্য ফলাবে, হাতে করে পোকামাকড় মারবে—বিজ্ঞানী-দের সঙ্গে তাদের যোগ কোথায় ? এ করে কাজ হয় না।

বললাম, চাষীরা জল সমস্যার হাত থেকে এখনও রেহাই পেলেন না।

বেশ। জলের কথাই ধরা যাক। স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ। বললেন, ভাখো, শুধু গভীর নলকূপ বসিয়ে কাজ হবে না। অত পয়সা কোথায় ? অগভীর নলকূপ বসাচ্ছ। তাতেও খরচ হচ্ছে। কিন্তু লাভ হচ্ছে কী ? বর্ষা না হলে অগভীর নলকূপ কাজ করে না। বর্ষার জল যদি পড়েও, তার পর কয়েক দিন, বড়জোর একটি মাস তা দিয়ে কাজ চালাতে পারবে। অথচ বর্ধমানে যাও। কত বড় বড় পুকুর পড়ে রয়েছে। মজে গেছে। সেই সব পুকুর যদি সংস্কার করা যায়, বর্ষার জল সেখানে ধরে রাখা যেতে পারে। এতে করে তিনটে লাভ। এক, ধরে রাখা জল সেচের কাজে লাগানো যায়। দুই, ওই সব পুকুরে মাছ চাষ করে লাভবান হতে পারা যায়। তিন, ছোটখাটো প্লাবনের হাত থেকে রেহাইও পাওয়া যেতে পারে।

এর পর তুললেন আর একটি সমস্যার কথা। বললেন, খাবার তেল নিয়ে এই যে আকাল যাচ্ছে, কেন ? গত রবি মরশুমে তিলের চাষ করা যেত না ? খুব সোজা কাজ। মুসুরের জমিতে তিল বুনে দাও। মুসুর গাছের বাতাস থেকে নাইট্রোজেন ধরে মাটিতে জমিয়ে রাখার ক্ষমতা অপরিসীম। এতে করে নাইট্রোজেনঘটিত সারের সুরাহা হল। তিল গাছ ওই সারেই ফলন দেবে। তিল গাছে অতিরিক্ত জলও লাগে কম। এদিকটা ভাবলে কত লক্ষ একর জমিতে তিল ফলান যেত, ভাব ? তা না করে সূর্যমুখীর চাষ, বিদেশ থেকে রেপ সিড আমদানি, এ সবের মানে হয় ?

বলা বাহুল্য, জ্ঞানেন্দ্রনাথের এ অভিজ্ঞতা পুঁথিগত নয়। হাতে কলমে।

১৯৫০-এর দশকে স্বর্গত জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে জাতীয় পরিকল্পনা রচনা করতে গিয়ে এ ধরনের কথাই তিনি বার বার বলে এসেছেন। ১৯৪৫-৫০ পর্যন্ত নতুন দিল্লির ভারতীয় কৃষি গবেষণাগারের প্রথম ডাইরেক্টার হিসেবে এই চিন্তাধারা নিয়েই তিনি কৃষি-প্রকল্প রূপায়ণে ব্রতী হয়েছিলেন। এই পরিণত বয়েসে এখনও এই পথেই ভেবে চলেছেন।

বিজ্ঞান-গবেষণা ছাড়াও বিজ্ঞান প্রসারের ব্যাপারেও জ্ঞানেন্দ্রনাথের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ইনডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েশন, ন্যাশনাল ইনসটিটিউট অব সায়েন্সেস ইন ইনডিয়া, ইনডিয়ান কেমিকেল সোসাইটি, ইনডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অব সায়ান্স এবং ইনডিয়ান সোসাইটি অব সয়েল সায়ান্সের বহু সংস্কার সাধনের কৃতিত্ব তাঁর বহুমুখী দূরদর্শিতার এবং কর্মক্ষমতার অন্যতম নিদর্শন। তিনি চান, বিজ্ঞান সাংবাদিকতা সুপ্রসারিত হোক। দেশের পত্র-পত্রিকা দেশের বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনা এবং বিভিন্ন সমস্যার ব্যাপারে দেশবাসীদের সচেতন করে তুলুক।

ডঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখারজি মনে করেন, শুধু ছাত্রছাত্রী বা বিজ্ঞানীই নন, বিজ্ঞান এবং কারিগরি জ্ঞানকে বাস্তবায়িত করার দায়িত্ব যাঁরা নিয়ে থাকেন —তিনি প্রশাসক বা মন্ত্রী, যিনিই হোন, তাঁদেরও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে। কারণ, মূল সমস্যাগুলি বুঝতে গেলে নিয়মতান্ত্রিক দিকগুলি ছাড়াও বিজ্ঞান এবং কারিগরি বিষয়ক সমস্যাবলী সম্পর্কেও অবহিত হওয়া দরকার।



নীলরতন ধর

নীলরতন ধর

স্টকহোমে নোবেল কমিটির কাছে আবার সেই প্রস্তাব : ভারতীয় বিজ্ঞানী ডঃ নীলরতন ধরকে ১৯৭৮ সালের নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হোক। প্রস্তাবক বিশিষ্ট সোভিয়েট মৃত্তিকা-বিজ্ঞানী এবং আন্তর্জাতিক মৃত্তিকা-বিজ্ঞান পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ভিকতর কোভদা। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার। এর আগে ১৯৬০ সালে ওই একই প্রস্তাব এসেছিল খোদ স্টকহোম টেকনোলজিক্যাল ইউনিভার্সিটির মৃত্তিকা-বিজ্ঞান শখার প্রধান অধ্যাপক এ অ্যাসল্যানডারের কাছ থেকে। প্রস্তাবে অধ্যাপক অ্যাসল্যানডার বলেছিলেন : সারা পৃথিবীর সার সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ডঃ ধরের আবিষ্কার একটা বড় রকমের উত্তরণ।

ডঃ নীলরতন ধর থাকেন এলাহাবাদে। কলকাতায় এসেছিলেন কয়েক দিনের জন্যে। তাঁর সঙ্গে দেখা করে অধ্যাপক কোভদার প্রসঙ্গটি তুলতেই মৃদু হাসলেন তিনি। এবং ব্যাপারটা সরাসরি এড়িয়ে গেলেন।

ডঃ ধর বললেন, 'বাবা, ওই সারের কথাই বলি, যে কথা বলে আসছি দীর্ঘকাল। এই বুড়ো বয়েস পর্যন্ত। মানুষ আবহমানকাল ধরে শস্য উৎপাদনের জন্যে জৈবিক সার ব্যবহার করে আসছে—যাকে ইংরেজিতে বলা হয় ফার্মইয়ার্ড ম্যানুওর। গোবর, হাঁস-মুরগীর মলমূত্র, ঝাঁটান পাতা, খড় থেকে যা তৈরি হয়। এ ধরনের সার মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় নাইট্রোজেন ফিকসেশন। আমি এবং আমার অসংখ্য ছাত্র প্রমাণ করেছি, ফার্মইয়ার্ড ম্যানুওরের সঙ্গে ফসফেট পাথর চূর্ণ অথবা লোহার কারখানা থেকে অপদ্রব্য হিসেবে যে বেসিক স্ল্যাগ বা ধাতুমল বেরিয়ে আসে তাকে গুঁড়িয়ে যদি মিশিয়ে নেওয়া হয় এবং সেই মিশ্রণ জমিতে ছড়িয়ে যদি চাষ করা যায়, তাহলে মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ আরও বেশি বাড়ে। ইউরোপের লোহার কারখানায় যে বেসিক স্ল্যাগ পাওয়া যায় তাতে ফসফেটের অনুপাত পনের থেকে কুড়ি শতাংশ। আর জামশেদপুরের লোহার কারখানা

থেকে আমরা যে বেসিক স্ল্যাগ পাই তাতে ফসফেট থাকে মাত্র আট থেকে দশ শতাংশ। তাই জামশেদপুরের স্ল্যাগ নিয়ে এ ধরনের গবেষণা আগে কেউ করেননি।

ডঃ ধরই প্রথম প্রমাণ করেন, ফার্ম-ইয়ার্ড ম্যানুওর, ঘাস, খড়, কচুরিপানা প্রভৃতি থেকে শুরু করে বোপঝাড়, আগাছা প্রভৃতির সঙ্গে কিছুটা বেসিক স্ল্যাগ অথবা রক-ফসফেট মিশিয়ে যদি জমিতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়, তাহলে জমির মাটি থেকে ফসল তার প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেনই যে শুধু সংগ্রহ করতে পারবে, তা নয়, ওই ফসলের পুষ্টির জন্যে আরও যে সব সামগ্রী দরকার, ইংরেজিতে যাদের বলা হয় 'নিউট্রিয়েন্টস', তাদেরও পাওয়া যাবে।

প্রশ্ন : আপনার আবিষ্কারটি আর একটু বুঝিয়ে বলুন, ডঃ ধর।

ডঃ ধর : খুবই সাধারণ ব্যাপার। চাষের জমিতে ঘাস জন্মায়। জন্মায় নানা রকম আগাছা। তারপর দেখ, ধান, গম প্রভৃতি ফসল থেকে প্রচুর খড়ও আমরা পেয়ে থাকি। এছাড়া জঙ্গলা গাছেরও তো অভাব নেই দেশে। এর পর আছে কচুরিপানা। হাজার হাজার পুকুর, ডোবা এবং জলা প্রায় সারা বছরই কচুরিপানায় ভরে থাকে। এদের সংগ্রহ করে চাষের জমিতে ছড়িয়ে দাও। আর সেই সঙ্গে ছড়িয়ে দাও কিছুটা বেসিক স্ল্যাগ। এ বস্তুটির এমন কী দাম, বল। বরং লোহার কারখানায় এটি বড় রকমের একটি মাথাব্যথা। ইচ্ছে করলে রক-ফসফেটও কাজে লাগাতে পার। পুরুলিয়া এবং ভারতের বেশ কিছু জায়গায় এ ধরনের পাথর পাওয়া যায়। এর পর চাই সেচ। সেচের সঙ্গে দাও জমিতে লাঙ্গল। ছয় সপ্তাহ থেকে দুই মাসের মধ্যে শস্যের জন্যে যা কিছু খাবার দরকার জমি সরবরাহ করবে।

প্রশ্ন : এ ধরনের সারের বৈজ্ঞানিক তাৎপর্যটি কী?

ডঃ ধর : সংক্ষেপে ব্যাপারটা এই—ঘাস, খড়, কচুরিপানা প্রভৃতি—যাদের কথা বললাম—এদের মধ্যে থাকে সেলুলোজ, লিগনিন এবং আরও নানা রকম কার্বোহাইড্রেট। জারনের ফলে এসব বস্তু থেকে নির্গত হয় কার্বোলিক অ্যাসিড এবং জল। সেই সঙ্গে কিছুটা শক্তিও। এই শক্তি জলকে ভেঙ্গে তৈরি করে হাইড্রোজেন পরমাণু এবং হাইড্রোকসিল র‍্যাডিক্যাল। হাইড্রোজেন র‍্যাডিকেল তৈরি করে হাইড্রোজেন প্যারঅকসাইড। যা পরে জৈব পদার্থগুলিকে জারিত করে। আর ওই যে হাইড্রোজেন পরমাণুর

কথা বললাম—সেই পরমাণু মাটির মধ্যে মিশে থাকা নাইট্রোজেন গ্যাসের (যা বাতাস থেকেই সংগ্রহ করে মাটি) রাসায়নিক বিক্রিয়া করে তৈরি করে অ্যামোনিয়া গ্যাস। পরে জারনের মাধ্যমে অ্যামোনিয়া থেকে হয় নাইট্রাইট এবং অবশেষে নাইট্রেট। এই নাইট্রেটই গাছের খাবার। এই সব বিক্রিয়ায় সূর্যের উত্তাপ এবং আলোর ভূমিকাও কম নয়। 'দিস ইজ কলড থার্মাল অ্যাণ্ড ফটো ফিকসেশন অব নাইট্রোজেন'। জমির উপরের স্তরের মাটিতেই এটা ঘটে সব চেয়ে বেশী।

প্রশ্ন : আপনি কি বলতে চান এ ধরনের সার কারখানায় তৈরি নাইট্রোজেন-ঘটিত সারের পরিপূরক ?

ডঃ ধর : পরিপূরক নয়, আমি বলব প্রতিস্থাপক। দিস ক্যান কমপ্লিটলি রিপ্লেস দ্য ফারটিলাইজারস এন পি কে। অর্থাৎ নাইট্রোজেন ফসফরাস এবং পটাস নামক অজৈব রাসায়নিক সার। জৈবিক সার প্রসঙ্গে যা বললাম তাতে জমির নাইট্রোজেন চাহিদাই যে শুধু মিটবে তা নয়, স্ল্যাগ বা রক-ফসফেট থেকে পাওয়া যাবে ফসফরাস। এবং পটাশ সুদ্ধ অন্যান্য পদার্থ ওই সব গাছপালা থেকেই পাওয়া যাবে।

কথা বলতে বলতে খানিকটা যেন ক্ষুব্ধ হলেন ডঃ ধর। বললেন, বিদেশীদের অনুকরণ এখনও আমাদের গেল না। এই তো, এলাহাবাদের কাছে ফুলপুরে বসানো হচ্ছে অ্যামোনিয়ার কারখানা। এতে প্রচুর খরচ। তাছাড়া অ্যামোনিয়া তৈরির জন্যে আমাদের পেট্রোলিয়ামের ওপর নির্ভর করতে হয়। এদিকে পেট্রোলিয়ামের দাম হু হু করে বাড়ছে। অথচ মজার ব্যাপার কি জান, এই পেট্রোলিয়ামের মাত্র আট শতাংশ কাজে লাগবে অ্যামোনিয়া তৈরি করতে, বাকি বিরানব্বই শতাংশই অপচয়।

'ওদিকে লাভ ক্ষতির হিসেবটি দেখ। কারখানা থেকে পাওয়া অ্যামোনিয়া লবণ জমির মাটিতে মেশালে অল্প দিনের মধ্যেই সেই মাটির অম্লত্ব বেড়ে যায়। বড় রকমের ক্ষতি। এছাড়া ওই অ্যামোনিয়া লবণ মাটিতে যে অতিরিক্ত নাইট্রেট তৈরি করে তা মাটির হিউমাসকেও ধ্বংস করে। হিউমাস মাটির মূল্যবান উপাদান। এর ভেতর থাকে মুখ্যত লিগনিন, ফসফেট এবং প্রোটিন। গাছপালা প্রভৃতি পচে এগুলি তৈরি হয়। এরা নষ্ট হলে মাটির আর পুষ্টিগুণ থাকে না। অথচ আমি যে ধরনের সারব্যবস্থার কথা বললাম, তা যদি কাজে লাগান যায়,

তাতে খরচ পড়বে অনেক কম। সাধারণ মাটি তো বটেই, কোন জমির মাটিতে যদি অম্ল অথবা ক্ষারের মাত্রা বেশি থাকে এই সার প্রয়োগ করে সে জমিতেও বেশি পরিমাণ শস্য উৎপাদন করা সম্ভব। এই সার জমির উর্বরা ক্ষমতা যেমন বাড়ায়, সেই সঙ্গে তার গুণগত দিকটিও অক্ষুন্ন রাখে।'

ডঃ ধরের দাবী ঃ জমিতে এন পি কে প্রয়োগ করলে প্রথম বছর ফসল হয় ভালই। কিন্তু দ্বিতীয় বছর থেকে ফলন কমতে থাকে। কিন্তু স্ল্যাগ মেশান জৈব সারে সে আশঙ্কা নেই। বরং এ ক্ষেত্রে প্রথম বছরের তুলনায় দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বছরে আরও বেশি ফলন হয়। অনেক সময় দ্বিতীয় বা তৃতীয় বছরে সারের প্রয়োজনই হয় না। এছাড়া মাটির সচ্ছিদ্রতা বা পোরোসিটি এবং জল সংরক্ষণ ক্ষমতাও বাড়ে।

এই আবিষ্কার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানী মহলে গোড়ায় প্রচণ্ড উৎসাহ জুগিয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটি দেশ, সোভিয়েত দেশ এবং ইউরোপে ব্যাপারটা পরীক্ষাও করা হয়েছে। সবারই এক কথা ঃ এই সার অবিশ্বাস্য রকমের ভাল কাজ করে। অনেক দেশে ডঃ ধর নিজে উপস্থিত থেকে পরীক্ষা পরিচালনা করেছেন।

'আমি নিজে সুইডেনে গিয়ে আমার আবিষ্কারের কার্যকারিতা সে দেশের জমিতেও প্রমাণ করে দিয়ে এসেছি। সুইডেনে সূর্যের আলো কম। কিন্তু সেখানেও সাফল্য অর্জন করা গেছে।' বললেন ডঃ ধর।

প্রশ্ন ঃ তা যদি হয়, অজৈব সারের দাম বাড়ছে, অনেক সময় পয়সা দিয়েও প্রয়োজন মত পাওয়া যায় না—সে ক্ষেত্রে আপনার জৈব সার এই সমস্যার তো সমাধান করতে পারে।

ডঃ ধর ঃ অবশ্যই পারে। কিন্তু চেষ্টা করছে কে? প্রথম বাধা তো ওই সার কারখানাগুলি। মোটা টাকা লুটছে তারা। চাহিদা মত যোগানও দিতে পারছে না। তাদের প্রচারের ঠেলায় কথা বলা শক্ত। কী বলব তোমাকে বাবা, বেশ কয়েক বছর আগে আমেরিকায় গিয়েছিলাম। কোন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সার নিয়ে বক্তৃতা দেবার পর যখন ফিরে আসছি, জনৈক বিজ্ঞানী আমাকে একান্তে ডেকে মন্তব্য করলেন, দারুণ কাজ করেছেন। কিন্তু ভয় হচ্ছে দেশে ফেরার আগে সার কারখানার মালিকরা আপনার ঠ্যাং দুটি আস্ত রাখলে হয়!

না, ঠ্যাং তিনি খোয়াননি। এখনও তিনি যুবকেরই মত চলেন, কথা বলেন। অত্যন্ত সাদাসিধে মানুষ। টিপ্ টপ্, আপ-টু-ডেট বলতে যা বোঝায়, তাঁর পোশাকে, কথায় এবং ব্যক্তিগত আচরণে একান্তই অভাব। তবে হ্যাঁ, একটা বিষয়ে তিনি এখনও যে কত বেশি আপ-টু-ডেট হতে পারেন, ভাবা যায় না। সেটা তাঁর স্মৃতিশক্তিতে।

আর সেটা যে কতখানি সত্যি, সাক্ষাতের প্রথম মুহূর্তেই তার প্রমাণ পেলাম।

বললাম, আপনার বৈজ্ঞানিক গবেষণার কথা তো শুনবই, কিন্তু সেই সঙ্গে আপনার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কেও কিছু বলুন।

আমার প্রশ্নে মৃদু হাসলেন তিনি। তারপর কোন ভূমিকা অথবা ব্যঞ্জনার তোয়াক্কা না করেই শুরু করলেন।

'আমার জন্ম ২ জানুয়ারি, ১৮৯২। যশোরে। আমার প্রথম শিক্ষা যশোর গভর্নমেণ্ট স্কুলে। বাবার নাম প্রসন্নকুমার ধর। যশোরেই ওকালতি করতেন। মা নিরোদমোহিনী দেবী। স্বর্গতঃ ডঃ জীবনরতন ধর আমার দাদা। যিনি ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মন্ত্রিসভায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হন।'

'যশোর গভর্নমেণ্ট স্কুল থেকেই বৃত্তি নিয়ে ম্যাট্রিক পাশ করি। সেটা ১৯০৭ সাল। তারপর চলে আসি কলকাতায়। কলকাতায় এসে রিপন (বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) কলেজে আই এস সি ক্লাসে ভর্তি হই। এখানে অধ্যাপক হিসেবে পেয়েছিলাম রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। কী সুন্দর ইংরেজী পড়াতেন তিনি! একেবারে ইংরেজের মত উচ্চারণ। পেয়েছিলাম রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে। তিনি পড়াতেন পদার্থবিদ্যা এবং রসায়ন। বাংলা ভাষায় অমন প্রাঞ্জল বিজ্ঞান পড়ান যেন কল্পনাই করা যায় না।'

'রিপন কলেজ থেকে বৃত্তি পেয়ে আই এস সি পাশ করলাম ১৯০৯ সালে। এর পর এলাম প্রেসিডেন্সি কলেজে বি এস সি পড়তে। শুরু করলাম রসায়নে অনার্স নিয়ে বি এস সি-র পাঠ। অধ্যাপক হিসেবে এখানে পেলাম আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মত দিকপাল বিজ্ঞানীদের।'

'১৯১১ সালে বি এস সি পাশ। তারপর এম এস সি। এম এস সি পাশ করলাম ১৯১৩ সালে।'

কোন কাগজপত্র দেখা নেই। গড় গড় করে স্মৃতি থেকেই বলে গেলেন তিনি।

এম এস সি পড়ার সময়ই নীলরতনের গবেষক জীবন শুরু। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তখন নাইট্রাইটের রাসায়নিক গুণাগুণের ওপর গবেষণা করছিলেন। তিনি চাইছিলেন তার ভৌতিক গুণাগুণের ওপরও কিছু গবেষণা হোক। অর্থাৎ ভৌত রসায়ন বা ফিজিক্যাল কেমেস্ট্রির গবেষণার ওপরও তখন তিনি চিন্তা করছিলেন। এ কাজেরই দায়িত্ব পড়ে ছাত্র নীলরতনের ওপর। এম এস সি পাশ করতে না করতেই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে একত্রে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গবেষণাপত্রও প্রকাশিত হল দেশ-বিদেশের কয়েকটি গবেষণা পত্রিকায়। তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল ঃ বিভিন্ন নাইট্রাইটের বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা। বলা বাহুল্য, সারা ভারতে ভৌত রসায়নের ওপরে গবেষণার কাজ এই প্রথম। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এবং ভারতীয় বিজ্ঞান চিন্তা জগতের অন্যতম পুরোধা ডঃ শান্তিস্বরূপ ভাটনগর একসময় লিখিতভাবে মন্তব্য করেছিলেন ঃ 'ডঃ ধর ইজ দ্য ফাউনডার অব ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি ইন ইণ্ডিয়া।'

তাঁর উল্লেখযোগ্য গবেষণার পুরস্কার হিসেবে ভারত সরকার ১৯১৫ সালে তাঁকে বিলেতে গিয়ে গবেষণার জন্যে 'স্টেট স্কলারশিপ' দিয়ে সম্মানিত করলেন।

তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছে। আমার বিলেত যাওয়ার কথাটা গিয়ে পৌঁছল রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর কাছে। সব শুনে তিনি বললেন, 'এখন গিয়ে কাজ নেই। ওদিকে যুদ্ধ চলছে। শেষে বেঘোরে প্রাণটা হারাবে?' বললেন ডঃ ধর।

কিন্তু নিষেধে কান দিলেন না নীলরতন।

১৯১৫ সালে তিনি ইংল্যাণ্ড যাত্রা করলেন।

কলকাতা থেকে বোম্বাই। বোম্বাই থেকে জাহাজে চড়ে ফ্রান্সের মার্সাই বন্দর। তারপর সেখান থেকে ফ্রান্সের আর এক বন্দর বোলন-এ। 'গুরুবাক্য একেবারে মিথ্যে হয়নি। কথা ছিল বোলন থেকে ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে ইংলণ্ডের বন্দর ফক্‌সটনে যাব। কিন্তু বোলনে পৌঁছতেই হই হই কাণ্ড। তখন সন্ধ্যে। রটে গেল, সারা ইংলিশ চ্যানেল নাকি জার্মান সাবমেরিনে ছেয়ে গেছে। অতএব চ্যানেল ক্রস করা চলবে না। কষ্ট করে সে-রাত্তিরটা বোলনেই কাটাতে হল শেষ পর্যন্ত। পরদিন অবশ্য যাত্রায় আর কোন ব্যাঘাত হয়নি।'

'১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯১৫। ভর্তি হলাম ইমপিরিয়াল কলেজে। এখানে ভৌত রসায়নে গবেষণা। বিষয় 'ক্যাটালিসিস' বা রাসায়নিক অনুঘটক সংক্রান্ত

পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এই গবেষণার জন্যে ইমপিরিয়াল কলেজ (আসলে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে) ১৯১৭ সালে আমাকে ডি এস সি ডিগ্রি দান করে।'

১৯১৭ সালে লণ্ডন থেকে প্যারিস। অকটোবর। যোগ দিলেন প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে (সোরবন)। গবেষণায় অসামান্য সাফল্যের জন্যে এই বিশ্ববিদ্যালয় ১৯১৯ সালে নীলরতনকে তাঁদের দুর্লভ সম্মান 'স্টেট ডকটরেট অব সায়ানস' দিয়ে ভূষিত করল।

এবার ফিরে গেলেন লণ্ডনে। চাকরি চাই। নীলরতনের ইচ্ছে ইনডিয়ান এডুকেশনাল সারভিসের মত তখনকার দিনের অত্যন্ত সম্মানজনক চাকরি (টাকার দিক দিয়েও লাভজনক) নিয়ে দেশে ফেরেন।

'বেশ মজার ব্যাপার ঘটল। ইনডিয়ান এডুকেশনাল সার্ভিসের অফিসে যেতেই ওঁরা আমাকে ওঁদের এক এক্সপার্টের কাছে পাঠাল। ভদ্রলোকের নাম মিঃ টুয়েন্টিম্যান। আমি প্যারিস গেছি শুনে তিনি সরাসরি প্রশ্ন করে বসলেন, প্যারিসে কেন? সেখানে কি ফরাসী মেয়েদের সান্নিধ্য পাওয়ার জন্যে গিয়েছিলে? আমি অপ্রস্তুত। এ আবার কী ধরনের প্রশ্ন? চট করে সরবনের সার্টিফিকেটটি তাঁর সামনে মেলে ধরলাম। এবার ধাতস্থ হলেন তিনি। বললেন, আশ্চর্য, কোন বিদেশীকে তো ওরা স্টেট ডক্টরেট সচরাচর দেয় না। ঠিক আছে। বুঝতে পারছি, পড়াশুনোর জন্যেই গিয়েছিলে সেখানে। এখন বল, চারটি জায়গা তোমাকে অফার করছি। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ, অমৃতসর, এলাহাবাদ এবং রেঙ্গুন। বল কোথায় অধ্যাপনা করতে চাও। আমি বললাম এলাহাবাদের মুইর সেণ্ট্রাল কলেজেই যাব। তিনি রাজী হলেন। আমি এলাহাবাদে চলে এলাম। ১৯১৯ সালের জুলাই মাসে এখানে ভৌত এবং অজৈব রসায়নের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিলাম।'

১৯২৪ সালে এই মুইর সেণ্ট্রাল কলেজই এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়।

প্রশ্ন করলাম, এত জায়গা থাকতে এলাহাবাদ কেন? তিনি বললেন, 'সেণ্ট্রাল প্লেস কী না, তাই জায়গাটা আমি বেছে নিলাম। শেষ পর্যন্ত এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেলাম।'

দীর্ঘ অধ্যাপনা এবং গবেষণার পর এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নীলরতন অবসর নিলেন ১৯৪৭ সালে। অধ্যাপনার সময় তিনি ছাত্র হিসেবে পেয়েছেন

অজস্র কৃতীজন। যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, ইউনিভার্সিটি গ্র্যাণ্ট কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান এবং বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ ডি এস কোঠারি, ভারত সরকারের ন্যাশনাল কমিটি অন সায়ান্স অ্যাণ্ড টেকনোলজির প্রাক্তন চেয়ারম্যান ডঃ আত্মারাম, পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল ধর্মবীর, প্রভৃতি।

ইতিমধ্যে নিজের সঞ্চিত অর্থ দিয়ে এলাহাবাদে তৈরি করলেন স্বতন্ত্র একটি গবেষণাগার। স্বর্গতা স্ত্রী শীলার নামে এর নাম রাখলেন শীলা ধর ইন্সটিটিউট। এর জন্যে তিনি প্রায় লক্ষ টাকা খরচ করেছেন। রসায়ন এবং উদ্ভিদ-রসায়ন গবেষণার জন্যে এই গবেষণাগার যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেছে। কলকাতার চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতালে সেবিকাদের বাস করার বাড়ি তৈরি বাবদ খরচ করেছেন লক্ষাধিক টাকা। তাঁর স্ত্রী শীলা দেবী ক্যান্সার রোগের চিকিৎসার সময় এখানেই মারা যান। শিক্ষা এবং গবেষণার জন্যে তাঁর ব্যক্তিগত দানের পরিমাণ প্রায় কুড়ি লক্ষ টাকা।

মৃত্তিকা-রসায়ন, সালোক-রসায়ন, কলয়েড কেমিস্ট্রি এবং ল্যাণ্ড ফার্টিলিটির ওপর তাঁর গবেষণা দেশ-বিদেশে যথেষ্ট সমাদর পেয়েছে। তাঁর অধীনে গবেষণা করে এ পর্যন্ত ডক্টরেট ডিগ্রি পেয়েছেন প্রায় একশ'র মত ছাত্র।

পরিণত বয়সেও তিনি :কর্মচঞ্চল। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে গেলে দেখা যাবে প্রবীণ এবং নবীন বিজ্ঞানীদের সঙ্গে সারাদিন ধরে তিনি শিশুর সারল্য নিয়ে ঘোরাফেরা করছেন। বলে চলেছেন তাঁর নিজস্ব চিন্তাভাবনার কথা।

সন্তর্পণে প্রশ্ন করেছিলাম, এত টাকা তো দান করেছেন। টাকা পেলেন কোথায়?

তাঁর তাৎক্ষণিক উত্তর: সঞ্চয়। মাইনে থেকে জমিয়েছি। প্রচুর মিটিং-এ বক্তৃতা দিতে যাই। ওঁরা ভাড়া দেন ফার্স্ট ক্লাস অথবা এয়ার কনডিসনড ক্লাসের। আমি ট্রাভেল করি লোয়ার ক্লাসে। তাতেও কিছু টাকা জমে। দেখ বাবা, গরীব দেশ। বিজ্ঞানীদের অত বাবু হলে চলে না। আমাদের দেশে গবেষণা যা হয়, তার চেয়ে অপচয় অনেক বেশী। এই তো অন্ধ্র প্রদেশের অধ্যাপক গেণ্ডিকোটা এবং গোপাল রাও অন্ধ্র সরকারের হয়ে সমীক্ষা চালিয়ে সেদিনই রিপোর্ট করেছেন কৃষি-প্রযুক্তিতে অন্ধ্র সরকার যে টাকা খরচ করেছে,

তার শতকরা আশি ভাগই অপচয়। এগুলি ভাবা দরকার।

নিজেকে ভারতীয় বলতে নীলরতন গর্বিত। বললেন, একবার পোপ নিমন্ত্রণ করলেন। কৃষি-বিজ্ঞানের ওপর বক্তৃতা দিতে। সমস্ত খরচ দিয়েছিলেন তিনি। একটি সমাবেশে তাঁকে আমি দুহাত জোড় করে নমস্কার করলাম। তিনিও ওই একই ভাবে প্রতি-নমস্কার করে কী বললেন, জান? বললেন, পৃথিবীর সব দেশের মধ্যে ভারতীয়রা বড় ধার্মিক। তখন আমার যে কী আনন্দ হয়েছিল! আর একবার ভিয়েনায়। রাত্রে বিশ্রামাগারে পুলিশ নিয়ে পাসপোর্ট চেক করতে এল অফিসার। আমি বললাম, আমি ভারতীয়। বলেই যেই পকেট থেকে বের করে পাসপোর্ট দেখাতে গেছি, অফিসার বারণ করলেন: না না, আপনাকে দেখাতে হবে না। ভারতীয়রা সৎ, এ ব্যাপারে চিট করে না।

কিন্তু প্রথম প্রেম সম্ভবত 'জৈবিক সার'। যখন উঠে আসছি হাত চেপে ধরলেন তিনি। বললেন, শোন, পৃথিবীতে মানুষ এবং পশু-খাদ্যের জন্যে বছরে দরকার চল্লিশ কোটি টন নাইট্রোজেন। সার কারখানা থেকে পাই তিন কোটি টন, শুঁটিজাতীয় গাছপালা মাটিতে নাইট্রোজেন যোগায় পঞ্চাশ লক্ষ টনের মত। আর বৃষ্টি, কুয়াশা প্রভৃতি বায়ুমণ্ডল থেকে নাইট্রোজেন যোগ ধরে মাটিতে পৌঁছে দেয় প্রায় সত্তর লক্ষ টন। তাই যদি হয়, নাইট্রোজেনের ঘাটতি থেকেই যাচ্ছে। এই সমস্যার বড় রকমের উত্তর থার্মাল এবং ফটো ফিকশেসন অব নাইট্রোজেন। সবারই এটা জানা দরকার। দরকার সেই মত কাজ করা।

জানি না, জাতীয় পরিকল্পনার দায়িত্ব যাঁদের ওপর ন্যস্ত তাঁরা এ নিয়ে কতটা মাথা ঘামাচ্ছেন।



পুলিনবিহারী সরকার

পুলিনবিহারী সরকার

বৈশ্লেষিক এবং খনিজ রসায়নে অধ্যাপক পুলিনবিহারী সরকার শিরোনাম। খনিজ পদার্থ সম্পর্কিত অভিজ্ঞতায় ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তাঁর কৃতিত্বঃ তিনি চল্লিশটিরও বেশি ভারতীয় খনিজ পদার্থের রাসায়নিক উপাদান বের করেছেন এবং সেই সঙ্গে নির্ধারণ করেছেন তাদের রাসায়নিক সংকেত। পথিকৃৎ হয়েছেন তেজস্ক্রিয়তা এবং ভূতাত্ত্বিক বয়েস বের করার কাজে। তাঁর বিশ্লেষণে ধরা পড়েছে সাধারণ খাদ্যবস্তু, যেমন আতপ চাল, মশুর ডাল, প্রভৃতির মৌলিক উপাদান। তিনি পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় রাসায়নিক বিশ্লেষণমূলক গবেষণায় ব্যয় করেছেন। হয়ত এই কারণেই ছাত্র এবং সতীর্থদের কাছে পুলিনবিহারীর পরিচয়— তিনি এক পরম অনুসন্ধিৎসু, সতর্ক এবং অতি তৎপর ব্যক্তিত্ব।

আসলে 'একসপেরিমেণ্টালিস্ট' হয়েই যেন তিনি জন্মেছিলেন। এবং সে পরীক্ষা রাসায়নিক জগতের ওপর, সে নিরীক্ষা স্বতঃস্ফূর্ত সহজাত সংস্কারেরই মত। বর্ণালীবীক্ষণ পদ্ধতিতে তিনি অনুসন্ধান চালিয়েছেন গয়া এবং নেলোর থেকে সংগ্রহ করা স্যামারস্কাইটের ওপর। গয়া থেকে সংগৃহীত কলামবাইটস নিয়ে। অথবা বিচিত্র রঙের মূল্যবান পাথর বেরিল বা অ্যালানাইটস। উদ্দেশ্য ওই সমস্ত বস্তুর 'ট্রেস এলিমেণ্টস'-এর পরিমাণ আবিষ্কার করা। অথবা। হ্যাঁ, সেটা ১৯৩৬। অধ্যাপক সরকার এইচ সি গোস্বামীর সহযোগিতায় প্রকাশ করলেন বিচিত্র এক গবেষণাপত্র। এই গবেষণাপত্রে তিনি আতপ চাল, পান, কাঁচকলা, মশুরডাল এমন কি উচ্ছে এবং করলা প্রভৃতির মধ্যে কী কী পরিমাণে কোন কোন ধাতু বা রাসায়নিক যোগ পাওয়া যায় তার একটি চমকপ্রদ তালিকা পেশ করে বসলেন। তিনি দেখালেন ওই সব বস্তুর প্রতি কিলোগ্রামে থাকে : তামা ·৫ থেকে ২·৫ মিলিগ্রাম, লোহা ১·৪ থেকে ৩১·৫ মিলিগ্রাম, দস্তা ১·২ থেকে ২·৪, ক্যালসিয়াম অকসাইড ২৪৫ থেকে ৯৮৪, সোডিয়াম অকসাইড ৩৭৭ এবং পটাশিয়াম অকসাইড ৪৯০০ মিলিগ্রাম। এ ধরনের রাসায়নিক বিশ্লেষণ

সব সময় যে তিনি নিজে থেকেই করতেন তা নয়। অনেক ক্ষেত্রে অপরের অনুরোধে অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিসের বিশ্লেষণের কাজে তাঁকে হাত দিতে হত। এ অনুরোধ কখনও আসত কোন প্রতিষ্ঠান, যেমন জিওলজিকেল সার্ভে অভ ইণ্ডিয়া প্রভৃতি থেকে, কখনও বা ব্যক্তিগত ভাবে। যেমন ধরুন, একবার জনৈক ব্যক্তি ধরে বসলেন 'চোখের জলের' রাসায়নিক উপাদান কী কী তা বের করে দিতে। কয়েক ফোঁটা চোখের জলও পাঠান হল পুলিনবিহারীর কাছে। অধ্যাপক অনুরোধটি রাখলেন।··· ওঁর সুদীর্ঘ গবেষণা জীবনের পরিচয় পরে দিচ্ছি।

জন্ম ২২ নভেম্বর, ১৮৯৪ দাদামশায়ের বাড়ি কলকাতার ঝামাপুকুর লেন-এ। ঠাকুর্দা যাদবচন্দ্র সরকার এখনকার যাদবপুর সহ সোনারপুরের একটি বিস্তীর্ণ এলাকার মালিক ছিলেন। উল্লেখ্য, ওঁরই নাম অনুসারে যাদবপুরের নামকরণ। বাবা বসন্তকুমার সরকার মেদিনীপুরের তমলুক শহরে স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকেন। ফলে পুলিনবিহারীর প্রথম জীবনের শিক্ষা ওই শহরেই শেষ হয়েছিল। তমলুকের হ্যামিলটন উচ্চ বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ওই পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ। এর পর তিনি কলকাতায় এসে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন এবং এখানেই হিন্দু ছাত্রাবাসে সতীর্থরূপে পেলেন মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্র নাথ বসু, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ এবং জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে।

এই সময়ে কিছুটা অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়তে হয়েছিল। কারণ বাবা বসন্তকুমার চাইছিলেন ছেলে তাঁরই মত আইন ব্যবসায়ী হোক। কিন্তু প্রতিবাদ করলেন মা সরোজিনী দেবী। তাঁর ইচ্ছে, ছেলে ভবিষ্যতে অধ্যাপনা করুক। ইতিমধ্যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রভাব তাঁকে দারুণভাবে আকর্ষণ করল। সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি অন্যান্য বন্ধুরা তখন বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা শুরু করেছেন। তাঁদের সকলের মনে তখন আচার্যের বাণী: বিজ্ঞান প্রগতি ছাড়া কোন দেশের উন্নতি হতে পারে না। অতএব বিজ্ঞানের ছাত্ররূপেই দীক্ষিত হলেন পুলিনবিহারী। যথাসময়ে বি এস-সি এবং এম এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিলেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তখন ওই বিভাগের পালিত অধ্যাপক।

বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেই গবেষণার জগতে প্রবেশ করলেন। কিন্তু সেখানেও বিস্তর বাধা। প্রথমত তখন একমাত্র বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ছাড়া গবেষণার

ব্যাপারে আর্থিক বা অন্যান্য কোন সাহায্য সাধারণ অধ্যাপকদের দেওয়া হত না। এছাড়াও আরো অনেক অসুবিধে ছিল। এর প্রতিবাদে তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, এ ধরনের নিয়ম অর্থহীন এবং অন্যায়। যোগ্যতা যাঁর আছে, তিনি সাধারণ অধ্যাপকই হোন অথবা প্রধান অধ্যাপক, তাঁকে সমানভাবে গবেষণা করার সুযোগ না দেওয়া অনুচিত। উত্তর জীবনে প্রতি মুহূর্তে চরিত্রের এই দৃঢ়বত্তা কখনও তিনি হারিয়ে ফেলেন নি।

তবু বাধাবিঘ্নের মধ্যে দিয়েই চলল, কয়েকটি গবেষণা পত্রও প্রকাশিত হল। যদিও গতানুগতিক ধারায় চালিত ওই সমস্ত গবেবণায় কোন তৃপ্তিই তিনি পান নি।... সুযোগ এল ১৯২৫-এ। ওই বছর ঘোষ ট্রাভেলিং ফেলোশিপ নিয়ে তিনি ইউরোপে পাড়ি দিলেন। উদ্দেশ্য তখনকার আধুনিকতম রাসায়নিক গবেষণা সম্পর্কে কিছু জানা। প্যারিসের সোরবনে প্রখ্যাত অধ্যাপক জি আরবেঁর গবেষণাগারে গিয়ে বেশ কিছুদিন তিনি গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। সেখানে স্কানডিয়াম, গাডোলিনিয়াম এবং ইউরোপিয়াম এই তিনটি মৌলিক পদার্থ নিয়ে কাজ করার সময় অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করলেন তিনি। মাত্র আট গ্রাম গাডোলিনিয়াম থেকে ওই ধাতুর চল্লিশ রকমের নতুন যৌগ তৈরি করে এবং অবশেষে তাদের বিশ্লেষণ করার পর সেগুলি থেকে ওই আট গ্রামের শতকরা পঁচানব্বুই ভাগ ধাতু উদ্ধার করে অর্পণ করলেন অধ্যাপক আরবেঁর হাতে। এই পারদর্শিতায় মুগ্ধ হলেন অধ্যাপক। এ যেন অসাধ্য সাধন। কারণ রসায়নবিদ মাত্রেই জানেন, অত কম ধাতু নিয়ে চল্লিশ রকমের যৌগ তৈরি করা, তাদের রাসায়নিক গুণাগুন বিশ্লেষণ করা, পরে ঐ সমস্ত যৌগ থেকে শতকরা মাত্র পাঁচ ভাগ ধাতু বাদে অবশিষ্ট ধাতু পৃথকভাবে উদ্ধার করা কী প্রচণ্ড রকমের কঠিন কাজ। এর জন্যে প্রয়োজন কল্পনাতীত সতর্কতা এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ব্যাপারে অসাধারণ নৈপুণ্য।

স্কানডিয়াম, গাডোলিনিয়াম এবং ইউরোপিয়ামের উপর পুলিনবিহারীর কাজের অসাধারণ কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ দেওয়া হল স্টেট ডক্টরেট অভ্ ফ্রান্স। এ ধরনের সম্মান সচরাচর পাওয়া দুষ্কর। এর দরুন গবেষণাপত্রটি তিনি ফরাসী ভাষাতেই লেখেন। ফ্রান্সে আরও যে কয়জন স্বনামধন্য রসায়নবিদের সঙ্গে তিনি কাজ করেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম পোর, অধ্যাপক আউপার, অধ্যাপক ডুভাল, অধ্যাপক হেরোভস্কি প্রভৃতি।

অতঃপর ১৯২৮-এ ভারতে প্রত্যাবর্তন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই পুরানো পদে যোগদান। ১৯৪৬-এ ঘোষ-অধ্যাপক এবং ১৯৫২-তে রসায়ন বিভাগের প্রধান। ওই পদ থেকেই ১৯৬০ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। মহাপ্রয়াণ বুধবার, ১৪ জুলাই, ১৯৭১।

সে শুধু খাতায় কলমে অবসর। তখনও তিনি তেজস্ক্রিয়তার উপর সমানে গবেষণা চালাচ্ছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান এবং কারিগরি গবেষণা সংস্থার সহযোগিতায় কয়েক বছর আগেও তিনি বাতাসে ভাসমান তেজস্ক্রিয় কণার পরিমাণ মাপার ব্যাপারে অনুসন্ধান চালিয়েছেন। অবশ্য অধ্যাপক সত্যেন বসু এবং অধ্যাপক শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে মিলিতভাবে। উল্লেখ্য, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ যে সমস্ত পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পরীক্ষা চালায়, বিস্ফোরণের পর পারমাণবিক ভস্ম কী পরিমাণে বাতাসের সঙ্গে ভেসে থাকে এবং কতদূর পর্যন্ত তার প্রভাব বিস্তৃতি লাভ করে এ ধরনের পরীক্ষায় তা জানা যেতে পারে। দেখা গেছে, ওই সময়ে শাকসব্জী, ধান, গম প্রভৃতির মধ্যে তেজস্ক্রিয়তা হঠাৎ বেড়ে যায়। এক সময়ে কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান কারিগরি গবেষণা সংস্থার তদানীন্তন অধ্যক্ষ ডঃ শান্তিস্বরূপ ভাটনগর কলকাতায় একটি জাতীয় খনিজ গবেষণাগার তৈরি করে অধ্যাপক সরকারকে তার অধ্যক্ষ করতে চেয়েছিলেন। কোন কারণে এই প্রস্তাবে তিনি রাজি হন নি। অবশ্য ভারতে এ পর্যন্ত তেমন কোন গবেষণাগার আজও স্থাপিত হয় নি। সম্মান: ১৯৩৮-এ ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস রসায়ন শাখার সভাপতি, ন্যাশনাল ইনসটিটিউট অভ্ সায়েন্সের ফেলো, স্যার পি সি রায় স্বর্ণপদক প্রাপ্তি।

অধ্যাপনার ব্যাপারেও ওঁর দৃষ্টি ছিল সতর্ক। জোড়াতালির তিনি ধার ধারতেন না। দুর্ভাগ্য, অনিবার্য কারণে মৃত্যুর পূর্বে ওঁর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ আমার ঘটে নি। যেদিন ঘটল, তখন সব শেষ। ১৪ই জুলাই বুধবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে পালিত বিল্ডিং-এর সামনে অমৃত-লোকযাত্রী অধ্যাপক পুলিনবিহারী— তাঁর চারপাশে অধ্যাপক, বন্ধু এবং ছাত্রছাত্রীদের ভীড়। পরদিন রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক পুরুষোত্তম বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা হল। সেখানে আরও দু একজন অধ্যাপক এবং গবেষক ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের একজন বললেন, মনে পড়ে, মাত্র কয়েক মাস আগে স্যার এসে আমার সামনের আলমারি থেকে জার্মান ভাষায়

লেখা কী যেন একটা বই বের করে ঝেড়ে মুছে পড়লেন। যেন সমাহিত। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, প্রকৃত জ্ঞানান্বেষী ছাত্রের তিনি অকৃত্রিম সুহৃদ। ছাত্রদের জোর করে কখনও কখনও তিনি পাঠাগারে নিয়ে যেতেন। নিজে হাতে বই নামিয়ে পড়তে বাধ্য করতেন, কখনও বা ফরাসী বা জার্মান রচনা মুখে মুখে তর্জমা করে শোনাতেন। অবসর নেবার পরও প্রত্যেক বছর পঞ্চম বার্ষিক ছাত্র-ছাত্রীদের প্রথম দিনের ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিত থেকে অনুপ্রেরণা যোগাতেন তিনি। এমন সম্প্রীতির নজির কদাচিৎ চোখে পড়ে।

অধ্যাপক পুলিনবিহারীর সঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অজৈব রসায়ন বিভাগের ডঃ পুরুষোত্তম বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পর্ক দীর্ঘকালের, ঘনিষ্ঠ ছাত্র এবং সহকারী হিসেবে। নিজের মাস্টারমশায় সম্পর্কে ওঁর অভিজ্ঞতা: বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা এসেছে, সন্ধ্যার পর রাত্রি। ডঃ সরকার ল্যাবোরেটারিতে বসে হয় জার্নাল পড়ছেন, নয়তো গবেষক ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলছেন। তিনি জীবনের তিপ্পান্ন বছর কাটিয়েছেন বিজ্ঞান কলেজের ল্যাবোরেটারিতে। তাঁর মুখে রসায়ন এবং বিজ্ঞান কলেজ ছাড়া অন্য কোন কথা বড় একটা শোনা যেত না। একবার খেয়াল হল ভারতে স্কাণ্ডিয়াম পাওয়া যায় কি না ভাল করে দেখতে হবে। আর তার জন্যে একটা বিশেষ রাসায়নিক সামগ্রী দরকার। একদিন এক কিলোগ্রাম আটা এনে আমাদের বললেন, 'দেখ তো, এর থেকে ফ্যাটি অ্যাসিড বের করতে পার কি না?' আমরা খুব উৎসাহ পেলাম না। করছি করব বলে সময় কাটাতে চাচ্ছি। একদিন দেখি অ্যাপ্রন পরে নিজেই তিনি ল্যাবোরেটারিতে এসে হাজির। বললেন, 'আমিই দেখছি স্কাণ্ডিয়ামের কাজটা।' দিনের পর দিন কাজ চলল, সকাল থেকে রাত্রি। শেষ পর্যন্ত সমস্ত পরিশ্রমই ব্যর্থ হল, আসল বস্তুটি তিনি পেলেন না। তখন ওঁর বয়স সত্তর। কিন্তু কোন রকম বিচলিত না হয়ে বললেন, 'ও রকম হয়ই। সব সময়েই কি সাকসেসফুল হওয়া যায়?'

এ তাঁর গবেষণা জীবনের একটি দৃষ্টান্ত। অধ্যাপক সরকার ছাত্রদের গবেষণার স্বাধীনতায় বিশ্বাস করতেন। তাই তাঁর গবেষণাগারে বিষয়বস্তু নির্বাচনে তেমন কড়াকড়ি ছিল না। যার যে বিষয়ে ইচ্ছে কাজ করে যেতে পারত। কাজ করলেই তিনি খুশি হতেন।…তবে গবেষণা এবং রসায়ন শিক্ষার মান সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি ছিল সদাসতর্ক।…রসায়ন ছাড়া তাঁর জীবনের শুধু

একটি ব্যতিক্রম, খেলাধুলা সম্পর্কে প্রবল আকর্ষণ। সহপাঠী মেঘনাদ সাহা একাধিকবার ফুটবল খেলার মাঠ থেকে ধরে এনে তাঁকে পরীক্ষার ঘরে বসিয়ে দিয়েছেন। তবে উত্তর জীবনে ফুটবলের চেয়ে ক্রিকেট এবং টেনিসেই তাঁর আকর্ষণ ছিল বেশি। নিজেও ভাল খেলতে পারতেন।

কিন্তু তার চাইতেও বিরল ঘটনা তাঁর নজিরহীন গবেষণা জীবনের ধারাবাহিক ইতিহাস। প্যারিসে অধ্যাপক আরবেঁর গবেষণাগারে জটিল রাসায়নিক বিশ্লেষণ করার যে অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেন, দেশে ফেরার পর অধ্যাপক পুলিনবিহারী তাকেই পরিবৃত্ত করার কাজে হাত দিলেন। ভারতীয় খনিজ সামগ্রীর রাসায়নিক বিশ্লেষণে তখন বাধা ছিল। যন্ত্রপাতি নেই। সুযোগের অভাব। তবু পরাজয় স্বীকার করলেন না। মাইনের টাকা বাঁচিয়ে একের পর এক তখনকার দিনের আধুনিকতম যন্ত্রপাতি কিনে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজের গবেষণাগারটি তিনি সাজিয়ে নিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত যন্ত্রপাতির মধ্যে ছিল হিলজার-এর বড় কোয়ার্টজ বর্ণালী বীক্ষণ যন্ত্র—হিলজার কনস্টাণ্ট ডিভিয়েশন স্পেকটোগ্রাফ কমপারেটর মাইক্রোফটোমিটার প্রভৃতি। এর সমস্তই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করে গেছেন।

বৈশ্লেষিক রসায়ন বা অ্যানালিটিক্যাল কেমিস্ট্রিতে প্রায় পনেরটি মৌলিক পদ্ধতির তিনি প্রবর্তক, জটিল যৌগ প্রায় তিরিশটি, প্রায় দশটি বিচিত্র যৌগের সমাকৃতি (Isomorphous) কেলাস তৈরি, স্কাণ্ডিয়াম, গ্যাডোলিনিয়াম প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য ধাতুর প্রকৃতি অনুসন্ধান প্রভৃতির উপর যে সমস্ত কাজ তিনি করেছেন তা থেকে মোট প্রায় দুশটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর সবচাইতে বড় মহত্ত্ব: তিনি চাইতেন তাঁর ছাত্ররা স্বাধীনভাবে তাঁদের গবেষণাপত্র প্রকাশ করুন। নিজের নাম তাঁদের সঙ্গে জড়াতে কখনই তিনি আগ্রহ প্রকাশ করতেন না।

অধ্যাপক পুলিনবিহারীর গবেষণার ক্ষেত্রকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। এক, ভারতে তেজস্ক্রিয় খনিজ পদার্থ সম্পর্কে অনুসন্ধান চালান, ওই সমস্ত পদার্থের তেজস্ক্রিয়তার কারণ বের করা এবং ঐ সঙ্গে ভূ-তাত্ত্বিক বয়েস। দুই, কোন্ কোন্ খনিজ পদার্থের মধ্যে কতটা মৌলিক পদার্থ রয়েছে সেটা বের

করা এবং তাদের জারণকালীন অবস্থা লক্ষ করা ; এবং তিন, জটিল খনিজ সামগ্রীর গঠন-বৈচিত্র্য নির্ণয়।

খনিজ রসায়নে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান : তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন গয়ায় কলামবাইটস নামে যে আকরিক পদার্থ পাওয়া যায় তার তেজস্ক্রিয়তার কারণ ওই পদার্থের মধ্যে যৎসামান্য ইউরেনিয়াম এবং থোরিয়ামের উপস্থিতি। তার মধ্যে তিনি রেনিয়াম (Rhenium) মৌলিক পদার্থটির উপস্থিতি লক্ষ করেন। পরে তিন কিলোগ্রাম ওই আকরিক পদার্থ থেকে ওই মৌলিক পদার্থটিকে তিনি নিষ্কাশন করতে সমর্থ হন। ভারতীয় খনিজ পদার্থ থেকে রেনিয়াম নিষ্কাশনের ঘটনা এই প্রথম। বিহারের ঝাঝা থেকে সংগৃহীত কলামবাইটস-এও রেনিয়ামের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। ওই সঙ্গে কিছুটা মলিবডেনামও। তাঁর আবিষ্কার, গয়ার সিনগারের অভ্র খনি থেকে পাওয়া ট্রিপলাইট খনিজ পদার্থের রাসায়নিক গঠন। সিংভূম এবং ময়ূরভঞ্জ জেলায় লৌহঘটিত আকরিক পদার্থের শতকরা পাঁচ ভাগ ভ্যানাডিয়াম। পৃথিবীর আর কোথাও ওই ধরনের আকরিক পদার্থে অত বেশি ভ্যানাডিয়াম পাওয়া যায় না। এ তথ্য অধ্যাপক সরকারেরই গবেষণার ফলশ্রুতি। তাঁর ১৪২ এবং ১৪৩ নম্বর গবেষণাপত্রে ত্রিবাঙ্কুরের মোনাজাইট বালির গঠন সম্পর্কে বলা হয়েছে। দেখা গেছে ওই বালির শতকরা ৭.৬ ভাগ থোরিয়ামের অকসাইড, ল্যানথানাইডসের পরিমাণ ৫৭.৮ এবং শতকরা ২৮ ভাগ ফসফরাস পেণ্টোকসাইড। ভারতের খনিজ বেরিলস অর্থাৎ চুনি, এবং পান্না জাতীয় পাথরের রং কেন ফিকে লাল, গোলাপী-হলদে, সবুজ, নীল প্রভৃতি হয় বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তা পরীক্ষা করেন। তিনি লক্ষ করেন ফিকে নীল এবং সাদা রঙের পাথরগুলি একসরশ্মির সংস্পর্শে ফিকে সবুজ এবং ফিকে বাদামী রঙে রূপান্তরিত হয়। এ থেকে তাঁর সিদ্ধান্ত : কেলাসের আণবিক বিন্যাসই ওই ধরনের বিচিত্র রঙের কারণ। ভারতের প্রায় সমস্ত রকম খনিজ পদার্থের জটিল যৌগের উপর তিনি গবেষণা করেছেন। বলা বাহুল্য, এই সব গবেষণা করতে গিয়ে তাঁকে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয়েছে। গবেষণার যাবতীয় উপকরণ সংগ্রহের জন্যে নিজের উদ্যোগের উপরই তাঁকে নির্ভর করতে হয়েছিল বেশী।

থোরিয়াম নিয়ে গবেষণার কথাই ধরা যাক। ত্রিবাঙ্কুরের সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চল থেকে সংগৃহীত হলো বিশেষ এক ধরনের বালি। যার নাম মোনাজাইট

বালি। এই বালির কথা আগেই উল্লেখ করেছি। ঠিক হলো, এই বালির উপাদান বের করতে হবে। কিন্তু কোন্ পদ্ধতির সাহায্যে বের করবেন সেই উপাদান? পুলিনবিহারী দেখলেন যে সব পদ্ধতি সচরাচর কাজে লাগানো হয়ে থাকে তাতে সুফল পাওয়া দুষ্কর। অতএব শুরু করলেন নতুন পথে চিন্তা ভাবনা। শেষ পর্যন্ত একটি নতুন পদ্ধতিই বের করলেন তিনি। যার সাহায্যে খুব সহজ ভাবেই মোনাজাইট থেকে থোরিয়াম নাইট্রেট এবং সিজিয়াম নাইট্রেট নিষ্কাশন করা সম্ভব হলো। এই পদ্ধতিতে আকরিক থেকে থোরিয়াম সংগ্রহ কাজ সহজতর হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে, পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনে জ্বালানি হিসেবে আমরা কাজে লাগাচ্ছি ইউরেনিয়াম। এ পর্যন্ত ভারতে যতটুকু ইউরেনিয়াম পাওয়া গেছে, তাতে বড় জোর আরও পঁচিশ কি তিরিশ বছর চলতে পারে। গত কয়েক বছর ধরে ইউরেনিয়ামের বিকল্প হিসেবে থোরিয়ামকে পারমাণবিক জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করছেন বিজ্ঞানীরা। পুলিনবিহারীর গবেষণালব্ধ ফলাফল এ ব্যাপারে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

বাংলার অন্যতম কৃষিজাত সামগ্রী পাট। পাটের সঙ্গে চাষীদের অর্থনৈতিক সম্পর্ক নিবিড়। আর এই অর্থনৈতিক দিকটি নির্ভর করে পাটের গুণগত উৎকর্ষের উপর। এর জন্যে দরকার রাসায়নিক বিশ্লেষণ। পুলিনবিহারী তাঁর সহযোগীদের সাহায্যে প্রমাণ করলেন, পাটের শুকনো ছালের পঁয়ষট্টি শতাংশ তন্তু, পঁয়ত্রিশ শতাংশে তন্তু নেই। শেষোক্ত এই সামগ্রীর মধ্যে প্রায় তেত্রিশ শতাংশ থাকে পেক্টিন নামে এক ধরনের রাসায়নিক যৌগ। এই পেক্টিনই পাটের তন্তুকে তার ছালের সঙ্গে আটকে রাখে।

বৈশ্লেষিক রসায়ন প্রসঙ্গে তাঁর আতপ চাল, উচ্ছে প্রভৃতির উপাদান বের করার কথা আগেই বলেছি। এ ছাড়া খনিজ পদার্থে খুব সহজে এবং তাড়াতাড়ি ম্যাগনেসিয়াম এবং ক্যালসিয়ামের পরিমাণ বের করার একটি সহজ পদ্ধতি তিনি আবিষ্কার করেন। লোহা, কোবল্ট, নিকেল, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতির উপর তাঁর বৈশ্লেষিক পদ্ধতি ভারতের ধাতু-বিজ্ঞানকে শুধু যে সমৃদ্ধই করেছে তা নয়, জাতীয় অর্থনৈতিক স্বার্থে তাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তিনি উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন কেমিক্যাল হোমোলজি, কোঅর্ডিনেশন কম্পাউণ্ডস, যৌগিক পদার্থের গঠন এবং তাদের উপাদানগত সমস্যাবলী, জৈব রাসায়নিক সমস্যা, প্রভৃতির উপর।

অত্যন্ত কঠিন কাজ। এ ধরনের গবেষণার জন্যে প্রয়োজন অটুট ধৈর্য, অপরিমিত নিয়ম এবং শৃঙ্খলাবোধ, সূক্ষ্মতম পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা এবং অপরিসীম সতর্কতার সঙ্গে কাজ করার মত সাহস। এদিক দিয়ে ভাবতে গেলে ভারতীয় রসায়নে অধ্যাপক পুলিনবিহারী সরকারের অবদান যুগান্তকারী ঘটনা। বিশেষ করে বৈশ্লেষিক রসায়নে তাঁর মত অত ব্যাপক এবং বহুমুখী গবেষণার দৃষ্টান্ত এ দেশে খুবই বিরল।



কুদরাত এ খুদা

কুদরাত এ খুদা

স্বাধীন বাংলাদেশের অগ্রজতম বিজ্ঞানী হিসেবে আপনি কী ভাবছেন ?—ওঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারে এটাই ছিল আমার প্রথম প্রশ্ন।

ক্ষণিক নীরবতা। মুহূর্তের জন্যে আত্মসমাহিত হয়ে পড়লেন তিনি। পরক্ষণেই দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, বাংলাদেশের সর্বসাধারণ মানুষকে বিজ্ঞানের আধুনিকতম দিক সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। আমি চাই নিজেদের প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যাপারে ওদের আত্মপ্রত্যয় জাগুক। এর জন্যে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের বহুল চর্চার প্রয়োজন আছে। এবং দেশজ সম্পদকে কত বেশি জন-কল্যাণের কাজে লাগান যায়, সেটা আবিষ্কার করাই হবে আমাদের বিজ্ঞানীদের প্রাথমিক লক্ষ্য।

এটাই কি আপনাদের মৌলিক গবেষণা ?

ওঁর তাৎক্ষণিক উত্তর: দেখুন, 'মৌলিক গবেষণা' এই কথাটির নতুন মূল্যায়ন হওয়া দরকার। এতদিন গবেষণাগারে বসে জড় এবং জীবজগতের মৌলিক রহস্য উদ্‌ঘাটনের প্রয়াসকেই আমরা 'মৌলিক গবেষণা' বলে জেনে এসেছি। যার ফলশ্রুতি আজকের দিনের বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির অসাধারণ আবিষ্কার। এবার উল্টো রথের পালা। এত বড়, এত ব্যাপক, এত বহুমুখী এই যে সাফল্য, মানুষের মৌলিক চাহিদা বা প্রয়োজন কতখানি তারা মেটাতে পেরেছে ? বিজ্ঞানের কাছ থেকে কী আমরা চেয়েছিলাম, কতখানি আমরা পেয়েছি ? দার্শনিকের অস্পষ্টতা নয়, আমি বলব, বিজ্ঞানীরাই এর উত্তর দিন। হ্যাঁ, এই উত্তরের অনুসন্ধানই হবে বড় রকমের এক মৌলিক গবেষণা।

বাংলাদেশের অগ্রজ-বিজ্ঞানী ডঃ মুহাম্মাদ কুদরাত এ খুদার এই হল আসল মানসিকতা। প্রচলিত নিয়মে তখন তিনি অবসরপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী। কারণ তিনি নিজেই বললেন, 'আমি তো এখন রিটায়ার্ড লোক। ১৯৬৬ সালেই আয়ুব খাঁর চাপে আমাকে প্রত্যক্ষভাবে অবসর নিতে হয়েছে'। কিন্তু বাস্তবে তিনি শতকরা একশ ভাগ বিজ্ঞান-সেবী। স্বাধীন বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা কী ধরনের

কাজ করবেন, এ নিয়ে যেমন তিনি মাথা ঘামিয়েছেন, ওই সঙ্গে নিয়মিত লিখে গেছেন বাংলা ভাষায় সর্বস্তরের বিজ্ঞান-গ্রন্থ। শুধু জনপ্রিয় বিজ্ঞান নয়, উচ্চতর পাঠ্যপুস্তকও। ওঁর মন্তব্য, 'পশ্চিমাদের (পশ্চিম পাকিস্তান) হাতে পড়ে বাংলা ভাষার যথেষ্ট বিকৃতি ঘটেছে। সেটার সংস্কার করা দরকার।'

আমি বললাম, জনপ্রিয় বিজ্ঞান রচনাকে সার্থক করে তুলতে পারলে, সাধারণ মানুষকে অনেক তাড়াতাড়ি বিজ্ঞানমুখী করে তোলা সম্ভব হবে। এপার বাংলায় অনেক তরুণ লেখক বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে ভালই লিখছেন। আমার মনে হয়, পরিভাষার থেকেও এখন সব চাইতে বড় প্রশ্ন, কী লিখব এবং কেন লিখব, সে সম্পর্কে সতর্ক হওয়া। এ ছাড়া বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনার উন্নতি করতে হলে চাই, বিজ্ঞান লেখকদের লেখাটাকে বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করা। কারণ শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান—সব কিছুই যতক্ষণ না পর্যন্ত 'প্রোফেশনাল' স্তরে উন্নীত হচ্ছে বা হয়, ততক্ষণ যথাযথ একটি মানে পৌঁছন কখনই সম্ভব নয়।

প্রবীণ বিজ্ঞানী আমার বক্তব্য সমর্থন করলেন।

ওঁর সঙ্গে এটা আমার প্রথম সাক্ষাৎকার। কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মহাসম্মেলনে বাংলাদেশের বিজ্ঞানীদলের নেতৃত্ব করছিলেন তিনি। বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়েছিল ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২। প্রথম দিন থেকেই সরকারী এবং বেসরকারী নানান অনুষ্ঠানে দারুণ ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে তাঁর সময় কাটছিল। বিজ্ঞান কংগ্রেস উপলক্ষে ২৩ ফেব্রুয়ারি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ বসু বিজ্ঞান মন্দিরে জনপ্রিয় বিজ্ঞান রচনার উপর একটি আলোচনা-চক্রের আয়োজন করেছিলেন। ওই সভায় পৌরোহিত্য করলেন আমাদের জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু। বিশিষ্ট অতিথি বাংলাদেশের প্রবীণ বিজ্ঞানী ডঃ খুদা।

ওই অনুষ্ঠানে আমি নিজেও একজন বক্তা। শহর কলকাতার যানবাহনের কল্যাণে পৌঁছতে দেরি হয়ে গেল। যখন উপস্থিত হলাম, দেখলাম দীর্ঘদেহী পরিণতবয়স্ক এক ব্যক্তি উদাত্ত কণ্ঠে গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে বাংলা পরিভাষার উপর কথা বলছেন। দেখা হল কলকাতার সাহা ইনসটিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিকস-এর ডঃ জয়ন্তকুমার বসুর সঙ্গে। ওঁকে জিজ্ঞেস করতেই বললেন, ডঃ খুদা বক্তৃতা করছেন।

সেই প্রথম দর্শন।

ডঃ খুদা বলছিলেন, মাতৃভাষায় বিজ্ঞান রচনায় বাধা কোথায়, তার ওপর। তিনি বললেন, বহুল প্রচলিত যে সমস্ত ইংরেজী বা অন্যান্য আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক শব্দে আমরা অভ্যস্ত, তাদের বাংলা পরিভাষা তৈরি করার প্রয়োজন নেই। আসল বক্তব্যকে বাংলা ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে, এটাই আমাদের কর্তব্য।

ডঃ খুদার পর বাংলাদেশের কয়েকজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীও বক্তৃতা করলেন। জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-গ্রন্থ রচনা প্রসঙ্গে আহ্বান জানালেন।

বক্তৃতার পর ডঃ খুদার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন বাংলাদেশের চট্টগ্রামের ভেষজ গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানী ডঃ ক্ষেত্রমোহন বিশ্বাস। এখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে রয়েছেন।

সেই প্রথম সাক্ষাৎ। খানিকটা সাক্ষাৎকারও বলা চলে।

ডঃ বিশ্বাস বললেন, ডঃ খুদা এর আগেই আপনার কথা বলছিলেন। গত বছর 'দেশ' পত্রিকার বাংলাদেশ সংখ্যায় 'বাংলাদেশের বিজ্ঞান চর্চা' প্রসঙ্গে আপনার লেখা ওঁর খুব ভাল লেগেছে।

ডঃ খুদা আন্তরিকতার সঙ্গে বললেন, 'দেশ' কর্তৃপক্ষের কাছে এর জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। এই সঙ্গে আপনাকেও আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমি বললাম, এটা আমার কাছে আশীর্বাদ। কিন্তু বাংলাদেশের বিজ্ঞান সম্পর্কে আপনার নিজের মুখ থেকে কিছু শুনতে চাই।

ডঃ খুদা বললেন, আগামীকাল আসুন। আমি গোলপার্কে রামকৃষ্ণ মিশনের আন্তর্জাতিক অতিথিশালায় উঠেছি। সন্ধ্যে ছ'টা নাগাদ আসুন।

তখনকার মত আর বেশি কিছু কথা বলা সম্ভব হয় নি। বিজ্ঞান কলেজে আরও একটি আলোচনা সভায় যোগ দেবার জন্যে উদ্যোক্তাদের তাগাদায় তাঁকে ছুটতে হল।

উনি চলে যেতেই ডঃ ক্ষেত্রমোহন বিশ্বাসকে অনুরোধ করলাম, আপনার কিছুটা সময় আমি নষ্ট করব। বিজ্ঞানী হিসেবে গোড়া থেকেই ডঃ খুদার সঙ্গে আপনার পরিচয়। ওঁকে আপনি জানেন। আমাদের সাক্ষাৎকারে আপনার সাহায্য চাই।

ডঃ বিশ্বাস এক কথায় রাজী হয়ে গেলেন।

পরদিন, ফেব্রুয়ারি ২৪। বিকেল পাঁচটায় উপস্থিত হলাম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের বিশুদ্ধ রসায়ন বিভাগে। সেখান থেকে ডঃ বিশ্বাসের সঙ্গে আন্তর্জাতিক অতিথিশালার দিকে যাত্রা।

পথে যেতে যেতে ডঃ খুদা সম্পর্কে ডঃ বিশ্বাস যা বললেন, তার সার কথা : কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়ন বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদে থাকার সময় থেকেই দুটি জিনিসের উপর ডঃ খুদা গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন সব চাইতে বেশি। এক, বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষা। দুই, দেশজ সম্পদকে গবেষণার মাধ্যমে উন্নত করে একটি জাতীয় ট্র্যাডিশন সৃষ্টি করা। বয়েস তখন একাত্তর। ছাত্র হিসেবে চিরদিনই তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন শাস্ত্রের এম এস-সি, পরে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিও লাভ করেন। অতঃপর লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি এস-সি এবং ডি আই সি উপাধি লাভ। দেশ বিভাগের পর তিনি পূর্ব পাকিস্তানে ডি পি আই-এর পদে বহাল হন। পরে পাকিস্তান সরকারের কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান-কারিগরি গবেষণা সংস্থার অন্যতম পুরোধা। এবং অবশেষে বিজ্ঞান উপদেষ্টা।

তৈরি হল কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড। এই বোর্ডের বিশিষ্টতম সহযোগী-রূপে কাজ শুরু করলেন ডঃ কুদরাত এ খুদা। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-অভিধান থেকে শুরু করে উচ্চতর পাঠ্যক্রমের পাঠ্যপুস্তক রচনায় আত্মনিয়োগ করলেন। ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত হল জৈব রসায়ন। বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় রচিত অনার্স এবং এম এস-সি মানের এই গ্রন্থ বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার ব্যাপারে সেই প্রথম যেন এক ইতিহাস রচনা করে বসল। এতদিন যাঁরা বলে এসেছেন বা এখনও বলে থাকেন, বাংলা ভাষায় উচ্চতর মানের বিজ্ঞানের বই লেখা সম্ভব নয়, ডঃ খুদার এই গ্রন্থ নিঃসন্দেহে তার এক প্রতিবাদ।

'দেশ' পত্রিকার জন্যে আয়োজিত এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে ডঃ খুদা আমাকে বলেছেন, বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণাটা যদি পরিষ্কার থাকে, এবং সেই সঙ্গে বাংলা ভাষার উপর দখল, আমি মনে করি যে কোন স্তরের বিজ্ঞান রচনায় তখন বাধা থাকার কোন কারণই নেই। যে ভাষায় কথা বলি, যে ভাষায় চিন্তা করি, সে ভাষায় লিখিতভাবে বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু বুঝিয়ে বলতে পারব না, এটা ভুল ধারণা। অবশ্য এই না পারার পেছনে একটা সংস্কার কাজ করে। ইংরেজী ভাষাটাকে আমরা সংস্কারের মত গ্রহণ করেছি। এটা ভুলতে হবে।

প্রশ্ন : ডঃ খুদা, এই সঙ্গে আর একটা দিকও তো ভাবার আছে! আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পৃথিবীর যে সমস্ত দেশ ভীষণভাবে এগিয়ে রয়েছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হলে বিদেশী ভাষা তো একটা জানা চাই। ইংরেজীতে আমরা মোটামুটি অভ্যস্ত বলে, এ ক্ষেত্রে ইংরেজীতেই কাজ করা ভাল।

খুদা : ঠিক। আমি কিন্তু এ কথা বলছি না, ইংরেজী শেখার দরকার নেই। ভাষা এবং বিজ্ঞান দুটো কিন্তু পৃথক ব্যাপার। বিজ্ঞান হল বিষয়, ভাষা সেই বিষয়কেই প্রকাশ করার মাধ্যম। আমার কথা হল, স্বাস্থ্যসম্মত খাবারটা চীনে মাটি প্লেটে খাবেন না কলাপাতায় খাবেন? যেখানে কলাপাতা সুলভ এবং সহজে পাওয়া যায় সেখানে দুর্লভ প্লেট বাদ দিলেও কোন ক্ষতি নেই। বিশেষ অতিথির জন্যে একটা প্লেট রাখতে পারেন। অর্থাৎ আমার বক্তব্য, আন্তর্জাতিক মানের পর্যায়ে যাঁরা কাজ করেন এমন বিজ্ঞানী বা গবেষকের সংখ্যা কিন্তু খুবই কম। তুলনায় অবশিষ্ট যাঁরা বিজ্ঞান চর্চা করেন তাঁদের সংখ্যা অনেক বেশি। বিজ্ঞান শিক্ষাকে, বিজ্ঞান ভাবনাকে যদি ব্যাপকভাবে সার্থক করে তুলতে হয়, ওঁদের কথাই প্রথমে আমাদের ভাবা দরকার। গুটিকয় 'আন্তর্জাতিক মানের' বিজ্ঞানীরা সহজেই প্রয়োজন মত বিদেশী ভাষা শিখে নিতে পারেন।

কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালক মুহম্মদ এনামুল হক 'জৈব রসায়ন'-এর প্রসঙ্গে লিখেছেন : 'আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে শুধু নিজের কাজে নহে, দেশের কাজেও নিয়োজিত করিয়া আমাদিগকে বাঁচিতে হইবে, দেশকেও উন্নত করিয়া তুলিতে হইবে।... শিক্ষার নিম্নস্তর হইতে শুরু করিয়া উচ্চতম স্তর পর্যন্ত মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করিয়া নাগরিকদের লব্ধ জ্ঞানকে ফলপ্রসূ করিয়া তুলিতে হইবে।... বলিতে বাধা নাই, যাঁহারা শিক্ষাবিদ বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্যতা রাখেন, তাঁহাদিগকেই এ কাজ করিতে হইবে।'

জৈব রসায়ন-এর ভূমিকায় ডঃ খুদা লিখেছেন : '...কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে দিন বাংলা ভাষাকে মধ্যস্তরে শিক্ষার বাহন হিসাবে গ্রহণ করে, সেই দিন দেশের নূতন ভবিষ্যতের সূচনা হয় ; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সেই ১৯৩৬ সাল হইতে আজ পর্যন্ত উচ্চস্তরের শিক্ষার জন্য বিজ্ঞানের পুস্তক আজিও আমাদের হস্তগত হইল না। বিজ্ঞানের গতি কিন্তু অপ্রতিহত এবং উত্তরোত্তর অগ্রগামী। সুতরাং আমরা যদি এ বিষয়ে অবহিত না হই তাহা হইলে চিরদিনের জন্যই

আমরা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পশ্চাদপদ থাকিব বলিয়া ভয় হয়।…' ওই ভূমিকায় আর এক জায়গায় তিনি মন্তব্য করেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার সাঙ্গীকরণ প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, জাপান পঞ্চাশ বছরের মধ্যে পশ্চাত্ত্যের জ্ঞান আলোচনাকে নিজ ভাষায় আবদ্ধ করিয়াছিল বলিয়া বিজ্ঞান এবং শিল্প ক্ষেত্রে বেশ অগ্রগতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু আমরা বিদেশী ভাষায় বিজ্ঞান আলোচনা করি বলিয়া এখনও বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে সক্ষম হই নাই… ।'

ডঃ বিশ্বাসকে প্রশ্ন করলাম, এ ধরনের সংস্কারমূলক কাজে হাত দিতে গিয়ে ডঃ খুদা বাধা পান নি?

বাধা? ডঃ বিশ্বাস বললেন, বিস্তর বাধা ছিল। তবে ভাষা আন্দোলনের সাফল্য বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের বই লেখার ব্যাপারে প্রচুর সাহায্য করেছে। ডঃ খুদার সাফল্যে আমরা গর্বিত। তবে বৈষয়িক ক্ষেত্রে বাধা ছিল অনেক। ডঃ খুদা চেয়েছিলেন, বাংলাদেশের বিজ্ঞান গবেষণার কাজ উন্নত মানের হোক। পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান কারিগরি গবেষণার দপ্তর বা সি এস আই আর তৈরি হওয়ার পর পশ্চিমারা ভাল ভাল কাজ ওদের দেশেই করতে লাগল। ডঃ খুদার চেষ্টায় এখানেও গবেষণাগার তৈরি হল। এর জন্যে অনেকটা কাঠ-খড় ওঁকে পোড়াতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত নতুন একটা জগাখিচুরি আইন করে ডঃ খুদাকে ওরা অবসর নিতে বাধ্য করে। কিন্তু তাতেও একটা মজা হল। পশ্চিমা যে ভদ্রলোক এ সমস্তের হোতা, অর্থাৎ যার যোগসাজসে অমন আইন তৈরি হল, শেষ পর্যন্ত ওই আইনের আওতায় সেও এসে গেল। ফলে সে বেচারাও চাকরি হারাল। ১৯৬৬-৬৭ নাগাদ অবসর নেওয়ার পর ডঃ খুদা এখন মুখ্যত বাংলা ভাষায় উচ্চতম পাঠ্য পুস্তক রচনার কাজ করছেন।

রামকৃষ্ণ মিশনের আন্তর্জাতিক অতিথিশালায় পৌছলাম ঠিক ছটায়। বিজ্ঞান কংগ্রেসের তরফ থেকে যে ছেলেটির ওপর ওঁর দেখাশুনা করার ভার পড়েছিল, তাঁকে জিজ্ঞেস করতেই তিনি বললেন, ডঃ খুদা এইমাত্র ফিরলেন। সারাদিন আজ ব্যস্ততায় কেটেছে। মিনিট পনের পর একটু বিশ্রাম নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলবেন।

এবং ঠিক মিনিট পনের পরই সেই মুহূর্ত এল। দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারের মুহূর্ত। ডঃ বিশ্বাস বললেন, ডঃ খুদা এই বয়েসেও প্রচণ্ড সময় ধরে চলেন।

ডঃ খুদা এবং আমি পাশাপাশি বসলাম। মুখে তাঁর আত্মভোলা হাসি। প্রতিটি কথার মধ্যে অসাধারণ আত্মপ্রত্যয়। জোর করে পাথর চাপা দেওয়া প্রস্রবণের মুখ থেকে পাথরটুকু যেন সদ্য সরিয়ে ফেলা হয়েছে, পরিবর্তে তার ভেতর থেকে সবেগে বেরিয়ে আসছে অফুরন্ত ধারাপ্রবাহ। বাংলাদেশ এখন স্বাধীন। কাজ অনেক। ভাবনা অনেক। এই সুরেই অনর্গল কথা বলে যেতে লাগলেন প্রবীণ বিজ্ঞানী।

প্রশ্ন : ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস কেমন লাগল, ডঃ খুদা ?

ডঃ খুদা : খুবই ভাল লেগেছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর খোলাখুলিভাবে আপনাদের এবং বেশ কিছু আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আমাদের বিজ্ঞানীরা ভাব বিনিময় করার সুযোগ পেলেন। ভারতীয় বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপিত হল। এতে করে পারস্পরিক বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলী প্রভৃতির আদান প্রদান সহজতর হওয়ার পথ খুলে গেল। এটা দরকার। বিজ্ঞান এবং কারিগরি ক্ষেত্রে ভাব বিনিময় করা সহজ হবে। আর ব্যক্তিগতভাবে আমি খুবই আনন্দিত। কারণ, কলকাতা তো আমার কাছে বিদেশ নয়। আমার বিজ্ঞানী জীবনের শুরু এখানেই। কংগ্রেসে এসে বহু পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল। এটা আমার ব্যক্তিগত লাভ।

প্রশ্ন : ডঃ খুদা, ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে এটাই কি আপনার প্রথম অংশ গ্রহণ ?

ডঃ খুদা : প্রথম বললে ভুল হবে। ১৯৩০-এর কাছাকাছি সায়েন্স কংগ্রেস দেখেছি। তবে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করার মত সুযোগ আমার তেমন ছিল না। পড়াশুনার কাজকর্ম, পড়ানো, গবেষণা এসব করতেই সময় চলে যেত।

প্রশ্ন : ঠিক এই মুহূর্তে খানিকটা অপ্রাসঙ্গিক মনে হবে, তবু আপনার মত একজন প্রবীণ এবং দূরদর্শী শিক্ষাবিদের কাছে একটি প্রশ্ন করতে চাই। বর্তমান ছাত্র-অসন্তোষ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কী ?

খুদা : দেখুন, ছাত্র অসন্তোষ কোন দেশে কোন কালেই নতুন ব্যাপার নয়। এখন অবশ্য এটা ব্যাপকতর হয়ে দেখা দিয়েছে। ঢাকাতেও এসব আমরা দেখেছি। এর জন্যে, আমি বলব শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শিক্ষকই

শতকরা নব্বই ভাগ দায়ী। ছাত্রদের সঙ্গে সুষ্ঠু সম্পর্ক রাখার যোগ্যতা অনেক শিক্ষকের আজ নেই। শিক্ষকরা যদি তাদের ভালবাসেন এবং আন্তরিকতার সঙ্গে তাদের প্রতি দায়িত্ব পালন করেন, ছেলেরা কখনই বিক্ষোভ করতে পারে না। আমার মনে আছে, যখন আমি প্রেসিডেন্সিতে পড়াচ্ছি, একদল ছাত্র নিয়ে গেলাম টাটার কারখানা দেখাতে। সেখানে একদিন খবর পেলাম, একটি ছাত্র মারাত্মক রকমের অশালীন ব্যবহার করেছে কার সঙ্গে। ওকে বিকেলে ডেকে বললাম, তুমি বাড়ি ফিরে যাও। কাল থেকে আমাদের সঙ্গে আর বেরোবে না। মনে পড়ে, ছেলেটি রাতে চুপি চুপি আমার কাছে এসে কেঁদে পড়ল। বলল, কখনও এ ধরনের অপরাধ আর সে করবে না। পরে ওকে আমি ক্ষমা করেছি। পরবর্তী জীবনে সে অনেক বড় হয়েছে। কই, কেউ তো এ ব্যাপারে অসন্তোষ প্রকাশ করল না!

প্রশ্ন : শুনেছি, দেশ বিভাগের পর পাকিস্তানের বিজ্ঞান কারিগরি গবেষণার সঙ্গে আপনি জড়িত হন। এ সম্পর্কে কতটা কাজ আপনারা করতে পেরেছিলেন, ডঃ খুদা?

ডঃ খুদা : যথেষ্ট চেষ্টা করতে হয়েছে, তবে পূর্ব বাংলার মানুষ সুফল তেমন কিছুই পায় নি। প্রথমত গোড়ার দিকে পাকিস্তানে কোন রিসার্চ অরগ্যানাইজেশন ছিল না। পরে অবশ্য সি এস আই আর-এর পত্তন হয়। পূর্ব বাংলায় এর রূপায়ণের দায়িত্ব দুজনের ওপর ছিল। ডঃ সবুর এবং আমার ওপর। বিজ্ঞানী হিসেবে ডঃ সবুর ভালই ছিলেন। কিন্তু বড় বেশি তৎকালীন সরকারের কোলে ঝোল টেনে বেড়াতেন। আমি তিন'শ জন ছেলেকে বিদেশ থেকে পি এইচ ডি এবং স্নাতকোত্তর গবেষণায় শিক্ষিত করে নিয়ে এলাম। একে একে ঢাকা, রাজশাহী এবং চট্টগ্রামে একটি করে মোট তিনটি গবেষণাগার তৈরি হল। কিন্তু মুশকিল হল, গবেষণা চালানর জন্যে যতটা টাকা দেওয়া দরকার সে তো পশ্চিমারা দিতই না, বরং বরাদ্দ টাকাও যাতে ঠিক মত না পাই, তার জন্যে নানা রকম লালফিতের মারপ্যাঁচ চালাত।

প্রশ্ন : কী কী ধরনের কাজের উপর আপনারা বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন?

ডঃ খুদা : প্রাকৃতিক সম্পদ, যেমন কাঠ, প্রাণী প্রভৃতি। পুষ্টি, খাদ্য সংরক্ষণ।

বিশেষ করে মৎস্য সংরক্ষণ। আপনারা নিশ্চয় জানেন, পূর্ব বাংলায় অঢেল মাছ। ভাল সংরক্ষণ ব্যবস্থা থাকলে শুধু দেশবাসীর কল্যাণেই যে তাদের কাজে লাগান যায় তাই নয়, বিদেশেও প্রচুর রফতানি করা যেতে পারে।

প্রশ্ন: কিছু যদি না মনে করেন, ডঃ খুদা, ব্যক্তিগতভাবে কী ধরনের গবেষণার সঙ্গে আপনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িয়ে ছিলেন, অনুগ্রহ করে যদি কিছু সে সম্পর্কে বলতেন—।

ডঃ খুদা: কতকগুলি ক্ষেত্রে আমরা খুবই ভাল কাজ করেছিলাম। যেমন ধরুন পাট। বাংলাদেশ পাটের জন্যে বিখ্যাত। আমরা দেখলাম, পাটের আঁশ বিক্রি করার পর যে পাটকাঠি পড়ে থাকে, একমাত্র জালানি এবং বাগানের বেড়া দেওয়া ছাড়া কোন কাজেই তাদের লাগান হয় না। এই বস্তুটির উপর আমরা গবেষণা চালিয়ে তৈরি করলাম শক্ত বোর্ড, ঢেউখেলান টিনের মত সামগ্রী প্রভৃতি। কারিগরি অভিজ্ঞতা বা যাকে 'নো হাও' বলা হয় সেটা আমাদের। পাটকাঠি থেকে সেলুলোজ বের করে মণ্ড তৈরি করি। ওই মণ্ড থেকেই ওই সমস্ত জিনিস তৈরি করা হয়। সুবিধে হল, ওরা অত্যন্ত হাল্কা, শক্ত, তাপসহ। ঘর ছাওয়ার কাজেও ব্যবহার করা যেতে পারে। দামে দারুণ সস্তা। আরও একটি লাভ। শিল্পে পরিণত হলে পাটকাঠি বিক্রি করেও লোকেরা লাভবান হতে পারবে। এখন এক মন কাঠির দাম যেখানে আট আনা তখন তার দাম হয়ত দাঁড়াবে পাঁচ টাকা! আমাদের এই পদ্ধতিতে প্রতি একশ' মন পাটকাঠি থেকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মন মণ্ড তৈরি করা সম্ভব হয়। অথচ বাঁশের ক্ষেত্রে কখনই তিরিশ মনের বেশি মণ্ড পাওয়া যায় না। পাটকাঠির সাহায্যে পশ্চিম পাকিস্তানও মণ্ড তৈরি করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু শতকরা দশ ভাগের বেশি মণ্ড কখনও ওরা করতে পারে নি। বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা এই কাঠি থেকে এক ধরনের কাগজ তৈরি করেন। যা সাধারণ কাগজের তুলনায় বহুগুণ শক্ত এবং উন্নত মানের। পাটকাঠি থেকে আমরা কৃত্রিম সিল্কও তৈরি করেছি। আসল সিল্কের পাশে রাখলে বুঝতে পারবেন না এটি আসল, না নকল ?

প্রশ্ন: ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এ নিয়ে কি কোন কাজ করা হয়েছে ?

ডঃ খুদা: না। পাকিস্তানীরা চেয়েছিল 'নো হাও' বাগাতে। আমরা দিই

নি। গোড়া থেকেই ওরা চেয়েছিল দেশের শিল্প ওরা চালাক, মালপত্র ওরা তৈরি করুক। সেগুলি আমাদের কাছে বিক্রি করে পয়সা লুটুক। এটা কখনই আমরা হতে দিতে চাই নি। আরও ভাল ভাল গবেষণাও করা হয়েছে। যেমন ধরুন লাটাই ফল নামে এক ধরনের ফল থেকে তৈরি করা হয়েছে মূল্যবান প্রোটিন। বাংলাদেশে প্রচুর হলুদ জন্মায়। বছরে উদ্‌বৃত্ত ফলনের পরিমাণ ৫০,০০০ টন। নিজস্ব পদ্ধতির সাহায্যে ওই হলুদ থেকে আমরা এক ধরনের তেল তৈরি করি যার দাম প্রায় বাইশ কোটি টাকা। এই তেল জীবাণু নাশকের কাজে ব্যবহার করা চলে। তা ছাড়া, তেল বের করার পরও যে অধঃক্ষেপ পড়ে থাকে তা দিয়ে খাবার রঙ করা যেতে পারে। অবশ্য তেলের ব্যবহারের ব্যাপারে এখনও গবেষণা চলছে। কালমেঘ প্রভৃতির উপর ভেষজ গবেষণাতেও ভাল কাজ হয়েছে।

ডঃ খুদা জানালেন, তিতাস অঞ্চলে পাওয়া যাচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধান। বগুড়ায় মাটির প্রায় পাঁচশ ফুট নিচে পাওয়া গেছে চুনা পাথরের পাহাড়। উত্তর বঙ্গে প্রচুর কয়লার সন্ধান মিলেছে, যা কম করেও একশ বছর বাংলাদেশের জ্বালানি সমস্যা পূরণ করতে পারবে। কক্সবাজারে মোনাজাইট পাওয়া গেছে। পারমাণবিক গবেষণায় এই মোনাজাইটকে কাজে লাগান যেতে পারে।

হ্যাঁ, আছে। অতীতে বাধা হয়ত অনেক এসেছিল। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশের বিজ্ঞানীদের সামনে এখন গবেষণার শত পথ উন্মুক্ত। মাছ চাষ কৃষি-বিজ্ঞান, মেরিন বাইওলজি বা সমুদ্র-জীববিদ্যা, খাদ্য সংরক্ষণ। প্রচুর কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে, তাকে কেন্দ্র করে নানা রকম রাসায়নিক কারখানাও গড়ে তোলা অসম্ভব হবে না।

প্রশ্ন : বাংলাদেশের পারমাণবিক গবেষণার আদর্শ কী হবে, ডঃ খুদা?

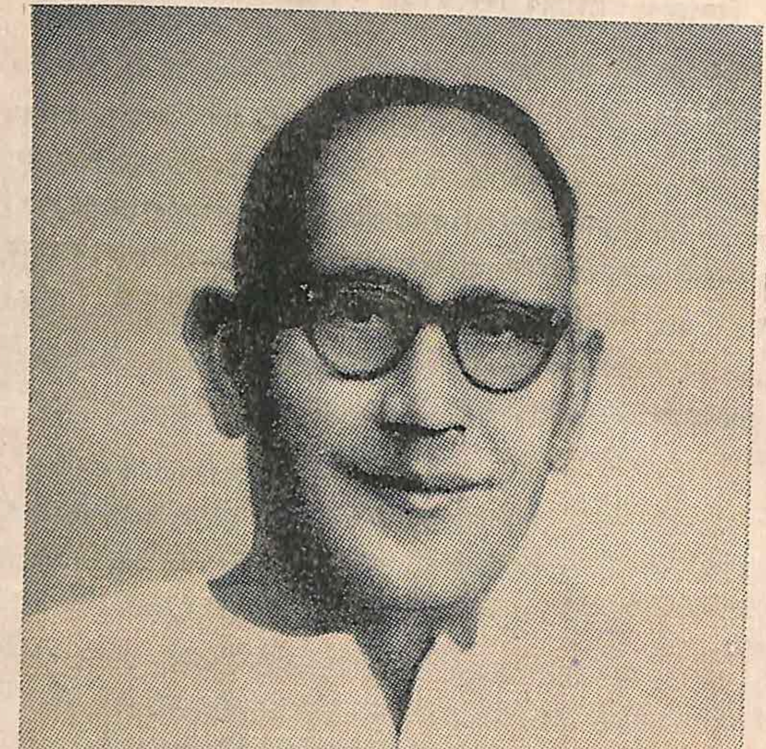
ডঃ খুদা : পারমাণবিক সম্ভার আমাদের কম। তবু এ ব্যাপারে যতটুকু আমাদের উদ্যোগ, তার লক্ষ্য হবে মানব-কল্যাণ। কৃষি-বিজ্ঞান, ওষুধ প্রভৃতিতেই একে আমরা কাজে লাগানর চেষ্টা করব।

প্রশ্ন : মৌলিক গবেষণা প্রসঙ্গে আপনি কী ভাবছেন?

ডঃ খুদা : বিশেষ বিশেষ মৌলিক গবেষণার উপর অবশ্যই আমাদের জোর দিতে হবে। যে কোন উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে এর প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি।

বিজ্ঞানের প্রায়োগিক দিককে সুষ্ঠু এবং উন্নততর করার জন্যে মৌলিক গবেষণা অবশ্যই চাই। নইলে বিদেশীদের মুখ চেয়ে বসে থাকতে হবে।

প্রায় দুই ঘণ্টা। কী ভাবে যে কেটে গেল, জানি না। দেখলাম, একাত্তর বছরের বিজ্ঞানী ডঃ খুদা তরুণের মন নিয়ে যা কিছু ভেবে চলেছেন তার মূল লক্ষ্য, স্বাধীন বাংলাদেশের বৈষয়িক উন্নতি। বাংলাদেশের সর্বসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রসার ঘটুক, বিজ্ঞান এবং কারিগরির সার্থক রূপায়ণ সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার সুযোগ সহজতর করুক। এই নিয়েই তাঁর ভাবনা চিন্তা।



দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়

দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়

নাটকীয় ঘটনা!

অধ্যাপক দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়ের নিজের লেখা বিবরণ: "সেটা ১৯৩০-এর দশক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিভাগের কাছ থেকে একটা কাচের পাত্র পেলাম। পাত্রের মধ্যে এক ধরনের কীট। নাম ব্রুকিড বিটল্ (Bruchid beetle)। আমার জানা ছিল, ডাল জাতীয় দানার পক্ষে এই কীট অত্যন্ত ক্ষতিকর। মসুর, মুগ, ছোলা, আরও কত রকমের ডাল দোকানে অথবা গুদামে সংরক্ষিত অবস্থায় রাখার সময় এই বিশেষ জাতের কীটের আগ্রাসী ক্ষুধায় কত যে নষ্ট হয়ে যায় তার হিসেব দেওয়া শক্ত। ডালের দানার ওপর এরা ডিম পাড়ে। ডিম থেকে বেরিয়ে আসে শূক কীট বা লার্ভা। এই লার্ভা ডালের খোসা ফুটো করে ভেতরে ঢুকে গিয়ে সমস্তটুকু কুরে কুরে খেয়ে নেয়। অবশেষে পড়ে থাকে খোসা। কয়েকজন গবেষক ছাত্র নিয়ে এই কীটের প্রজনন বিষয়ক সমস্যাবলী নিয়ে আমি পর্যবেক্ষণের কাজে নেমে পড়লাম। অদ্ভুত ব্যাপার! আমরা লক্ষ করলাম, বছরের আর সব ঋতুতে ব্রুকিড বিটল্ সমানে ডিম পাড়ে ঠিকই। কিন্তু বর্ষার সময়ই যেন যত সব বিপত্তি। ওদের মধ্যে তখন শুরু হয় মড়ক। বংশবৃদ্ধি দূরের কথা। ওদের কাছে আত্মরক্ষা করাটাই তখন বড় রকমের সমস্যা।

"হ্যাঁ, আমরা অবাক হয়েছিলাম প্রথমে। পরে অনুসন্ধান করতে চোখে পড়ল এক ধরনের পরজীবী বোলতা, ট্রাইকোগ্র্যামাটাইড পরিবারভুক্ত। আমরা লক্ষ করলাম পরজীবী এই বোলতারা ব্রুকিড বিটলদের ডিমের মধ্যে নিজেরাও ডিম পাড়ছে। আর এদের আক্রমণের ফলেই ব্রুকিড বিটলরা আর বংশ বিস্তার করতে পারছে না।"

বলা বাহুল্য, বিশ্বের তাবৎ কীট-বিজ্ঞানীদের কাছে পরজীবী এই বোলতার সঠিক পরিচয় তখনও অজানা। দুর্গাদাস এর পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্যে আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের কীটবিজ্ঞান বিভাগের বর্তমান এমেরিটাস অধ্যাপক

ডঃ এম এস মানির শরণাপন্ন হলেন। ডঃ মানি বিশদ পরীক্ষা করার পর জানালেন, দুর্গাদাস সত্যিই একটা নতুন প্রজাতির পরজীবী বোলতা আবিষ্কার করেছেন। তিনি এর নাম রাখলেন ক্যাস্টোস্ট্রিকা মুখার্জি (Chastostricha Mukerji)। দুর্গাদাসের নামেই এই নামকরণ।

অনেকেই জানেন, গাছপালা, ফসল এবং শস্য কীটপতঙ্গের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে কত রকমের গবেষণাই না ইদানীং চলছে। ডি ডি টি থেকে শুরু করে নানা রকমের রাসায়নিক যৌগ এর জন্যে কাজে লাগান হয়। গত কয়েক দশক ধরে অনিবার্য কারণে কীট ধ্বংস করার ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা জৈবিক পদ্ধতি কাজে লাগানর চেষ্টা করছেন। বিষে বিষক্ষয়ের মত প্রকৃতিজাত কীটপতঙ্গের সাহায্যে ক্ষতিকর কীটপতঙ্গের ধ্বংস করা যায় কি না, তা নিয়ে কত রকমের গবেষণাই না ইদানীং পৃথিবীর প্রায় সব দেশের গবেষণাগারেই করা হচ্ছে। অথচ কীট-বিজ্ঞানের এই বিশেষ দিকটি, ইংরেজিতে যাকে বলা হচ্ছে বাইওলজিকাল কনট্রোল অব পেস্‌টস্—সেই তিরিশের দশকে বিশ্বের তাবৎ বিজ্ঞানীর কাছেই যেন এক অস্পষ্ট ঘটনা। কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত বা অজ্ঞাতও। বরং প্রাণীর সাহায্যে এভাবে যে প্রাণীর নিধনযজ্ঞ মানবিক প্রয়োজনে দরকার হতে পারে, তেমন সব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানর মত প্রয়োজন উপলব্ধি করার অবস্থা তখনও আসেনি। ঠিক সেই সময় অধ্যাপক দুর্গাদাসের 'ক্রকিড বিটল্'-এর ওপর অসামান্য এই আবিষ্কার কীট-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শুধু ভারতেই নয়, সারা পৃথিবীতে এক বিরল দৃষ্টান্তের স্থাপনা করল। এ দৃষ্টান্ত আধুনিকতম কীট-বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে এক বলিষ্ঠ ভূমিকারই সমতুল্য।

অধ্যাপক দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় পরলোকগমন করেছেন। তাঁর লোকান্তর ভারতীয় কীট-বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি দীর্ঘ পরিচ্ছেদের পরিসমাপ্তি।

জন্ম ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে মামার বাড়ি হালিশহরে। পৈত্রিক বাস হুগলী জেলার বলাগড়। কলকাতার সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে ভৌতবিজ্ঞানে বি এস-সি পাস করার পর দুর্গাদাস কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিভাগের এম এস-সি শ্রেণীতে এসে ভর্তি হন।

আর এই সময় ঘটল সেই কাকতালীয় ঘটনা। উদ্ভিদ বিজ্ঞানের ছাত্রের ভাগ্য প্রাণীতত্ত্বের অভিমুখী হল।

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। অসামান্য সংগঠক এই মানুষটি তখন কীভাবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠনপাঠন এবং গবেষণার কাজকে নতুন নতুন সজ্জায় পরিপূর্ণ করা যায় সে নিয়ে মাথা ঘামিয়ে চলেছেন। ১৯১৯ সালে এখানে খোলা হল স্নাতকোত্তর প্রাণীবিজ্ঞান বিভাগ। এই বিভাগের প্রধান হয়ে এলেন সদ্য কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ফেরৎ ছাত্র এবং গবেষক অধ্যাপক সমরেন্দ্রনাথ মৌলিক।

নতুন বিভাগ তো খোলা হল। অধ্যাপকও এলেন। কিন্তু ছাত্র কোথায়?

স্যার আশুতোষ দুর্গাদাসকে ডেকে বললেন, উদ্ভিদ থাক। তোমাকে প্রাণী-বিজ্ঞানের ছাত্র হতে হবে।

আর আশুতোষের আদেশ মানেই তামিল।

দুর্গাদাস উদ্ভিদবিজ্ঞান ছেড়ে ভর্তি হলেন প্রাণীবিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে।

এখানে এসে তিনি সংস্পর্শ পেলেন কয়েকজন প্রথিতযশা বিজ্ঞানীর। যাঁদের মধ্যে অন্যতম ডঃ ক্রল, স্যার নীলরতন সরকার, ডঃ ভারতচন্দ্র ধর, খগেন্দ্র-নাথ মিত্র এবং ডঃ হরিহর গঙ্গোপাধ্যায়। এঁদের মধ্যে ডঃ ক্রল এবং স্যার নীলরতন সরকার ছাড়া বাকি সবাই ছিলেন প্রাণী এবং উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক। ডঃ ক্রল ইঞ্জিনিয়ার এবং উদ্ভিদবিজ্ঞানী। স্যার নীলরতন প্রাণী-বিজ্ঞান বিভাগের স্নাতকোত্তর পর্ষদের সভাপতি। উল্লেখ্য, তিনি এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রাণীবিজ্ঞানের দ্বিতীয় এম এ-ও বটেন। তাঁর আগে ভারতচন্দ্র ধর মেট্রোপলিটান কলেজ (বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) থেকে প্রাণীবিজ্ঞানে প্রথম এম এ পাস করেন।

১৯২১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রাণীবিজ্ঞান বিভাগের প্রথম এম এস-সি দুর্গাদাস। পাস করার পর কীটবিজ্ঞান নিয়ে এখানেই গবেষণার শুরু। পরে ১৯২২ সালে এই বিভাগে তিনি অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। এই সময় তাঁর সঙ্গে পরিচয় ঘটে ভারত সরকারের জুলজিক্যাল সার্ভে অব

ইনডিয়ার বিশিষ্ট জীবতত্ত্ববিদ স্যার নেলসন অ্যানানডেল, স্যার সেমুর সিউওয়েল, ডঃ শ্রীনিবাস রাও, ডঃ বনোয়ারীলাল চৌধুরী প্রভৃতি বিদগ্ধ প্রাণীবিজ্ঞানীদের সঙ্গে। যাঁরা তাঁর গবেষণার ক্ষেত্রে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন।

বলা বাহুল্য, গবেষণা করতে গেলে যে সব সুযোগ-সুবিধে দরকার, বিশ্ব-বিদ্যালয়ে তখন তার নিতান্তই অভাব। না ছিল পরিচালক, না ছিল যন্ত্রপাতি। কি নিয়ে গবেষণা করা যায়, কিভাবে করা যায়, সব কিছুই তখন ভাবতে হত যিনি গবেষণা করবেন তাঁকেই। অর্থাৎ যিনি গবেষক, তিনি গবেষণার পরিচালকও।

এমন একটি পরিবেশের মধ্যে শুরু হল দুর্গাদাসের বিজ্ঞানী-জীবন। প্রথম দিকে তিনি কাজ করেন পিঁপড়ে নিয়ে। পিঁপড়ের স্বভাব, বাসা তৈরির পদ্ধতি এবং কয়েকটি নতুন আবিষ্কৃত পিঁপড়ের বিবরণ প্রভৃতির ওপর তাঁর প্রথম গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয় ১৯৩০ সালে। এই সব পিঁপড়ের মধ্যে ছিল আন্দামানের পিঁপড়ে, অন্ধ পিঁপড়ে ডোরিলাসের শ্রমিকের বৈশিষ্ট্য, পুরুষ ডোরিলাসের পৌষ্টিক ও জননতন্ত্রের বিবরণ, বনগবেষণা বিভাগের পিঁপড়ে সংগ্রহ প্রভৃতি। এ সব গবেষণা আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানী মহলে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ফোর্ডহ্যাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী অধ্যাপক ফরবেস ১৯৬৬ সালে একটি নিবন্ধে বলেছেন, 'অন্ধ পিঁপড়ের শারীর-সংস্থান বিষয়ক গবেষণার কাজ পৃথিবীতে অধ্যাপক দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়ই প্রথম শুরু করেন।'

১৯৩০ সালে দুর্গাদাস সাইবিসটার (Cybister) নামে এক ধরনের জলজ পতঙ্গের শ্বসনতন্ত্রের ওপর নতুন আবিষ্কার ঘটিয়ে আরও একটি নজির স্থাপন করেন। এর আগে পৃথিবীর বিখ্যাত প্রাণীবিজ্ঞানীরা মনে করতেন, সাই-বিসটারের মধ্যবক্ষস্থিত শ্বাসছিদ্র বন্ধ। শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাপারে তার কোন ভূমিকাই নেই। দুর্গাদাস সর্বপ্রথম প্রমাণ করেন, এই মতবাদটি ভিত্তিহীন। বরং সাইবিসটারের মধ্যবক্ষের শ্বাসছিদ্র সম্পূর্ণ কার্যক্ষম। এবং তা মোটেই বন্ধ নয়। এ ছাড়া কলেমবোলা (Collembolla) নামে ডানাহীন এক ধরনের পতঙ্গ সম্পর্কেও পুরনো যে সব মতবাদ ছিল দুর্গাদাস তাদের খণ্ডন করেন। বিশ্ববিখ্যাত পতঙ্গবিদ ডঃ ভি বি উইগিলসওয়ার্থ তাঁর গ্রন্থ 'প্রিনসিপলস অব

ইনসেকট ফিজিওলজি'তে এই মতবাদটিকে স্থান দিয়েছেন। প্যারিস থেকে প্রকাশিত Traite Zoologie Concrte-ও তাঁকে এ ব্যাপারে সমর্থন করেছে।

গোড়ায় ব্রুকিড বিটল সম্পর্কে অধ্যাপক দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক গবেষণার কথা উল্লেখ করেছি। তাঁর এই গবেষণা সারা পৃথিবীতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। তিনিই প্রথম এই কীটটির জননতন্ত্র সম্পর্কে বিশদ চিত্র তুলে ধরেন। এদের সঙ্গম পদ্ধতি, কীভাবে এরা ডিম পাড়ে, এদের লার্ভার শারীর-বৃত্তীয় বর্ণনা এবং কীভাবে এদের মস্তিষ্ক সৃষ্ট হয় সে সম্পর্কে নতুন মতবাদ পতঙ্গবিজ্ঞানে অসামান্য সংযোজন।

এ প্রসঙ্গে একটি দুঃখজনক ঘটনার কথা উল্লেখ করাটা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ব্রুকিড বিটল-এর মস্তিষ্ক গঠন সম্পর্কীয় দুর্গাদাসের মতবাদটি প্রকাশিত হওয়ার পর জানা গেল এ ব্যাপারে এর আগে যে মতবাদটি প্রচলিত ছিল সেটা ভুল। এখন, পুরনো এই মতবাদটির প্রবক্তা ছিলেন প্রখ্যাত পতঙ্গবিদ এ ডি ইমস্, এফ আর এস। তাঁর এফ আর এস (ফেলো অব দ্য রয়েল সোসাইটি) হওয়ার মূলেও ছিল এই মতবাদ। ইমস্ ভারতবর্ষের চাকরি শেষ করে তখন ইংলণ্ডে অবসর যাপন করছেন। দুর্গাদাস কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডি এস সি ডিগ্রি পাওয়ার জন্যে তাঁর নতুন মতবাদ সহ আরও কিছু কিছু গবেষণাপত্র পাঠালেন ইমসের কাছে। কারণ, তাঁর ডি এস সির পরীক্ষক স্বয়ং ইমসই। ইমস্ দুর্গাদাসের গবেষণাপত্র মোটামুটি না পড়েই ফেরত দেন। কারণ, দুর্গাদাস যা বলতে চেয়েছিলেন তিনি তা গ্রহণ করতে পারেন নি। ফলে ডি এস সি আর হল না। এ আঘাত জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দুর্গাদাস ভুলতে পারেন নি। উল্লেখ্য, পরবর্তীকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেনটাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বর নিজে এ বিষয়টি নিয়ে গবেষণা চালিয়ে প্রমাণ করেন, দুর্গাদাস যা বলতে চেয়েছেন, সেটাই ঠিক। তাঁর মতবাদটিই এখন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বীকৃত।

উত্তরকালে নানা রকম কীটপতঙ্গ নিয়ে গবেষণা করেছেন দুর্গাদাস। যেমন ধরুন, হলোপেলটিস নামে এক ধরনের কীট। এক সময়ে এই কীট আসামের চা বাগিচার প্রচণ্ড ক্ষতি করত। ভারতীয় চা সমিতির অনুরোধে এই কীটের ওপর দুর্গাদাস ধারাবাহিক গবেষণা চালিয়ে তাদের জীবন-ইতিহাস

উদ্ধার করেন এবং কিভাবে তাদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় তার উপায় বের করেন। এতে করে দেশের বড় একটি শিল্প বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পায়।

তাঁর আরও একটি আন্তর্জাতিক পর্যায়ের গবেষণা উইপোকা (টারমাইটস)-এর ওপর। উল্লেখ্য, উইপোকা কোন কোন ক্ষেত্রে যেমন খুবই ক্ষতিকর—এরা ঘরের বইপত্র কাঠের আসবাবপত্র অথবা বনের কাষ্ঠসম্পদের প্রচণ্ড ক্ষতি করে, আবার উদ্ভিদ এবং মাটির সঙ্গে মিশে থাকা জৈব পদার্থের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া ঘটিয়ে মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করে। দুর্গাদাস এই উইপোকার ওপর প্রচুর তথ্য জুগিয়েছেন। তাঁর এই গবেষণালব্ধ ফলাফল অ্যাকাডেমি প্রেস থেকে প্রকাশিত 'বাইওলজি অভ্ টারমাইট' (১ম ও ২য় খণ্ড) এবং স্মিথসোনিয়ান ইনসটিটিউট থেকে প্রকাশিত অধ্যাপক জে ই স্নাইডারের লেখা উইপোকা সম্পর্কিত গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

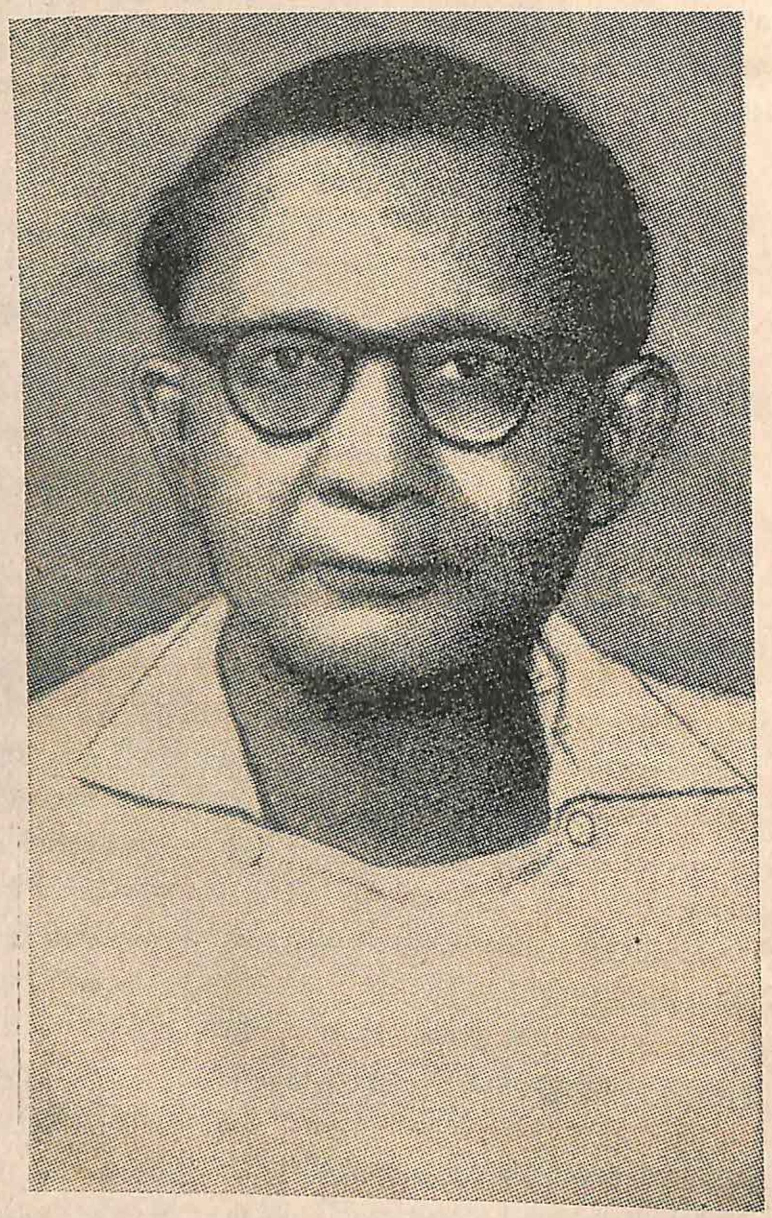
অধ্যাপক মৌলিক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিদেশে যাওয়ার পর অধ্যাপক দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিজ্ঞান বিভাগের প্রধানের পদে বৃত হন। এ পদে তিনি বহাল ছিলেন ১৯৬১ পর্যন্ত।

'অধ্যাপক মুখার্জি শুধু আমারই শিক্ষক ছিলেন না। আজ দেশে প্রাণী-বিজ্ঞান নিয়ে যাঁরা কাজ করছেন তাঁদেরও শিক্ষক। অথবা শিক্ষকের শিক্ষক।' এক সাক্ষাৎকারে বর্তমান লেখককে এ কথা বলেছেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন প্রধান ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

'তিনি প্রাণীবিজ্ঞানী ঠিকই। তবে তার চেয়েও বড় পরিচয়, ভারতে কীটবিজ্ঞান গবেষণার তিনি বিশিষ্টতম প্রবক্তা। আমরা তাঁর কাছে পড়েছি। অমন শিক্ষক দেখিনি। অমন ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পঠন, পাঠন এবং গবেষণা চোখে পড়ে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিজ্ঞান বিভাগকে তিনিই সাজিয়ে দিয়ে গেছেন।' এ মন্তব্য এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কীটবিজ্ঞানী ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর।

অধ্যাপক দুর্গাদাস সুলেখকও ছিলেন। কলকাতার দি নিউ বুক স্টল প্রকাশিত স্নাতক শ্রেণীর জন্যে লেখা তাঁর 'টেকসট বুক অভ জুলজি' শুধু ভারতেই নয়, বিদেশেও এখনও পর্যন্ত যথেষ্ট সমাদর পেয়ে থাকে।

এবং সব চাইতে বড় দৃষ্টান্ত—অনেকের মুখেই শোনা যায়, বিদেশে না গেলে নাকি বড় বিজ্ঞানী হওয়া যায় না। এ ব্যাপারে দুর্গাদাসের জীবন একটি বড় রকমের ব্যতিক্রম। তিনি বিদেশে যান নি। কিন্তু বিশ্বস্বীকৃত বিজ্ঞানী হতে পেরেছেন।



সতীশরঞ্জন খাস্তগীর

সতীশরঞ্জন খাস্তগীর

৬ মে, ১৯৭৩ বিশিষ্ট বিজ্ঞানী অধ্যাপক সতীশরঞ্জন খাস্তগীর পরলোক-গমন করেছেন। 'এই সঙ্গে আমরা একজন একনিষ্ঠ বিজ্ঞান সাধক, অকৃত্রিম ছাত্রদরদী এবং একজন সত্যিকারের ভালমানুষকে হারালাম।' নিজের অধ্যাপক সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বর্তমান লেখকের কাছে খানিকটা যেন স্বগতোক্তির মতই এমন একটি মন্তব্য করলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেডিও ফিজিকস বিভাগের 'রেডিও অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিকস' শাখার অধ্যাপক মৃণাল দাশগুপ্ত। উল্লেখ্য, ১৯৫৩ সালে ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের জডরেল ব্যাঙ্ক রেডিও অবজারভেটরি থেকে অধ্যাপক দাশগুপ্ত এবং আর সি জেনিসন মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে প্রমাণ করেন, পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে ছায়াপথের মধ্যে সিগনাস নক্ষত্র জগতে সিগনাস-এ নামে অত্যন্ত শক্তিশালী যে বেতার তরঙ্গ-উৎস রয়েছে, সেটা আসলে একটি উৎস নয়। বরং সিগনাস-এর দুটি পৃথক অঞ্চল থেকেই শক্তিশালী বেতার তরঙ্গ বিকীর্ণ হয়ে থাকে। যাদের পারস্পরিক দূরত্ব ১০০,০০০ আলোক বৎসর। (সায়েণ্টেফিক অ্যামেরিকান নভেম্বর, ১৯৬৪তে প্রকাশিত 'একসপ্লোডিং গ্যালাকসিস' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত।)

অধ্যাপক সতীশরঞ্জনের জীবনের শেষের অধ্যায় অতিবাহিত হচ্ছিল শান্তি-নিকেতনে। স্বাভাবিক কর্মজীবন থেকে বিদায় নেবার পর কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান এবং শিল্প গবেষণা পর্ষৎ (সি এস আই আর)-এর বৃত্তি নিয়ে সেখানে তিনি নতুনভাবে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। উদ্দেশ্য, বোলপুরের ধুলো-ধোঁয়ামুক্ত পরিবেশে ঊর্ধ্বাকাশে বায়ুস্তরের চৌম্বক বিকিরণ, বিদ্যুৎ সংক্রান্ত মৌলিক গবেষণা করার মত একটি গবেষণাকেন্দ্র গড়ে তোলা। কয়েকজন প্রতিশ্রুতি-সম্পন্ন ছাত্র নিয়ে এ সব ব্যাপারের উপর কিছু কিছু তাত্ত্বিক গবেষণার কাজও শুরু করেছিলেন তিনি। কিন্তু ক্রমে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ল। ইদানীং প্রায়ই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়তেন। গত ১৬ এপ্রিল, ১৯৭৩ অবস্থার অবনতি ঘটল।

পরে তিনি সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস-এ আক্রান্ত হন। শান্তিনিকেতন থেকে তাঁকে তখন কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। মৃত্যুর পূর্বে শেষ একুশটি দিন প্রায় সংজ্ঞাহীন অবস্থাতেই কাটল। এবং ওই অবস্থাতেই ৬ মে ১৯৭৩, ৭৫ বছর বয়েসে ঘটল তাঁর মহাপ্রয়াণ।

অধ্যাপক সতীশরঞ্জনের জন্ম ৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮, চট্টগ্রামের বিখ্যাত খাস্তগীর পরিবারে। পিতা স্বর্গত সত্যরঞ্জন খাস্তগীর ছিলেন সিভিল ইনজিনিয়ার। তাঁকে প্রায় বাইরে বাইরেই কাটাতে হত বেশি। কখনও অবিভক্ত বাংলায়, কখনও বিহারে অথবা ওড়িশায়। মাতা স্বর্গতা সৌরনলিনী পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্ম সমাজের বিশিষ্ট সেবক স্বর্গত রজনীকান্ত ঘোষের কন্যা। সতীশরঞ্জনের স্কুলের জীবন কেটেছে কখনও ঢাকায়, কখনও ফরিদপুর, কখনও চট্টগ্রামে। ১৯১৫ সালে চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন বৃত্তি এবং পদক নিয়ে। ১৯১৯ সালে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে প্রথম শ্রেণীর পদার্থবিজ্ঞানের স্নাতক। ১৯২১ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকেই এম এস-সি পাশ করেন। এর কিছু দিন পর নোবেল বিজ্ঞানী স্যার সি ভি রামনের অধীনে তাঁর গবেষণার শুরু। অবশ্য স্বল্পকালীন; মাত্র তিন মাসের জন্যে। তারপরই ১৯২২ সালে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি গবেষক ছাত্র হিসেবে যোগদান করেন।

এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে আর একজন দিকপাল বিজ্ঞানীর তিনি সঙ্গলাভ করলেন। তিনি বিশিষ্ট নোবেল বিজ্ঞানী অধ্যাপক সি জি বারকলা। অধ্যাপক বারকলার অধীনেই সতীশরঞ্জন বিভিন্ন মাধ্যমে কীভাবে এক্স-রশ্মির বিচ্ছুরণ এবং শোষণ ঘটে থাকে সে সবের রহস্য উদ্ঘাটনের জন্যে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্রতী হন। অবশেষে এই কাজেরই স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯২৪ এবং ১৯২৬ সালে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে যথাক্রমে পি এইচ ডি এবং ডি এস সি উপাধিতে ভূষিত করেন। অধ্যাপক বারকলার সঙ্গে মিলিতভাবে তাঁর কয়েকটি গবেষণাপত্র ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিনেও প্রকাশিত হয়েছিল।

অতঃপর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন। বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েও সতীশরঞ্জন চিরদিন ভারতীয়ই থেকে গেছেন। সম্পূর্ণ বিদেশ-নির্ভর না থেকে এ দেশের মাটিতেই এ দেশের ছাত্রদের নিয়ে কীভাবে আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা গড়ে তোলা যায় সে ব্যাপারে তাঁর আন্তরিক আগ্রহ ছিল অপরিসীম। বিদেশ থেকে ফিরে তিনি পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপকরূপে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগ

দিলেন। কিন্তু সেটাও সামান্য সময়ের জন্যে। ১৯২৮ সালে কলোনিয়াল এডুকেশান সারভিসে যোগ দিয়ে তিনি কলোম্বো বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করেন। সেখানে তিন বছর কাজ করার পর ফিরে আসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারারের পদে। অল্পদিনের মধ্যেই আচার্য ডি এম বসুর সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি রীডারের পদে বৃত হন। জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু তখন ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞান শাখার প্রধান।

বলা বাহুল্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সে এক স্বর্ণযুগ। উত্তরকালের বহু প্রথিতযশা বিজ্ঞানী এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তাঁদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক সত্যেন বসু, অধ্যাপক রমেশ মজুমদার, অধ্যাপক কেদারেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক কৃষ্ণাণ প্রমুখ। অবশ্য সতীশরঞ্জনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেওয়ার কিছু দিন পর কৃষ্ণাণ সেখান থেকে অবসর গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, সতীশরঞ্জন পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়ান্স ফ্যাকালটির ডীন নির্বাচিত হন।

ভারত বিভাগের প্রায় এক বছর পর অধ্যাপক সতীশরঞ্জন ঢাকা থেকে এসে বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞানের বিভাগীয় প্রধানের পদ গ্রহণ করেন। এখানে আসার পর গ্যাসীয় মাধ্যমে বিদ্যুৎ-ক্ষরণ বা গ্যাসিয়াস ডিসচার্জ এবং অয়নমণ্ডল ও বায়ু মাধ্যমের ভেতর কীভাবে বিদ্যুৎ এবং চৌম্বক শক্তি প্রসারলাভ করে, তাদের বৈচিত্র্য এবং কার্যাবলী এ সবের ওপর গবেষণার জন্যে একটি নির্দিষ্ট দল গঠন করে কাজ শুরু করে দেন। বারাণসী হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এ ধরনের উদ্যোগ এই প্রথম। অতি প্রয়োজনীয় এই গবেষণার আয়োজন করে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অন্যতম পথিকৃতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তাঁর অধীনে গবেষণা করে উত্তরকালে যাঁরা ভারতবিখ্যাত হয়েছেন এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাম অধ্যাপক তান্ত্রী, ডঃ আর এন সিং, ডঃ শ্রীবাস্তব, ডঃ মূর্তি প্রভৃতি। অধ্যাপক সতীশরঞ্জনের এঁরা উত্তরসাধক।

১৯৫৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খয়রা অধ্যাপক এবং বিশুদ্ধ পদার্থ বিজ্ঞানের বিভাগীয় প্রধান। ১৯৬১ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে পদার্থ বিজ্ঞান শাখার সভাপতি। ১৯৬২তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন অব দ্য ফ্যাকালটি অব সায়ান্স। ৩১ অকটোবর, ১৯৬৩ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদ থেকে

অবসর গ্রহণ। তবে ১৯৬৪র এপ্রিল পর্যন্ত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা এবং পাঠদানের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। পরে ১ মে, ১৯৬৪ বসু বিজ্ঞান মন্দিরে পদার্থ বিজ্ঞান শাখার প্রধানের পদে যোগ দেন। ওই সময় বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ডাইরেকটার এবং পদার্থ বিজ্ঞান শাখার প্রধানের ভূমিকায় বিশিষ্ট বিজ্ঞানী অধ্যাপক ডি এম বসুই কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। অধ্যাপক খাস্তগীর বিজ্ঞান মন্দিরে যোগ দেবার পর অধ্যাপক বসু পদার্থ বিজ্ঞানের প্রধানের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং শুধু পরিচালক হিসেবেই কাজ করতে থাকেন। ১৯৬৯-এর মে মাস পর্যন্ত বসু বিজ্ঞান মন্দিরে কাজ করার পর অবসর নিয়ে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন সি এস আই আর-রিটায়ার্ড সায়ান্টিস্ট হিসেবে।

কর্মজীবনে অসামান্য কৃতিত্বের জন্যে অধ্যাপক খাস্তগীর যে সমস্ত সম্মান পেয়েছিলেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য: ১৯২৬ সালে রয়েল সোসাইটি অব এডিনবরার ফেলো নির্বাচিত, ১৯৪৪ সালে ভারতের জাতীয় বিজ্ঞান আকাডেমির সদস্য, ইণ্ডিয়ান ফিজিক্যাল সোসাইটির ফেলো, ১৯৬৬ সালে ম্যুনিখে অনুষ্ঠিত 'ইনটারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব রেডিও সায়ান্স'-এর পঞ্চদশ সাধারণ অধিবেশনে ভারতীয় প্রতিনিধিরূপে অংশ গ্রহণ, ইত্যাদি।

অধ্যাপক খাস্তগীরের উল্লেখযোগ্য গবেষণা: ক্রিস্টাল রেকটিফিকেশন, কৃত্রিম অয়নমণ্ডল বা আর্টিফিশিয়াল আইওনোস্ফিয়ার, গ্যাসীয় মাধ্যমে তড়িৎ-ক্ষরণজনিত কম্পন বা অসসিলেসন্স ইন গ্যাসিয়াস ডিসচার্জ, বায়ুমণ্ডলের বেতার তরঙ্গের গতিপ্রকৃতি, কম দৈর্ঘ্যের বেতার তরঙ্গ এবং কম কম্পাঙ্কের বেতার তরঙ্গের সঞ্চারণ প্রভৃতি।

এ ছাড়াও অধ্যাপক খাস্তগীরের আরও একটি পরিচয়, একাধারে সক্রিয় বিজ্ঞানী হয়েও তিনি মনেপ্রাণে চেয়েছিলেন, বিজ্ঞানকে যদি জনপ্রিয় করে তুলতে হয়, সত্যিকারের হৃদয়ঙ্গম করতে হয়, তা হলে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান প্রচার অবশ্যই করা দরকার। শুধু বক্তৃতা করে নয়, এটা যাতে বাস্তবে রূপায়িত করা যায়, তার জন্যে নিজেই তিনি বাংলা ভাষায় উচ্চমানের বিজ্ঞানের বই লিখতে শুরু করেন।

এ প্রসঙ্গে জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর মন্তব্য: 'সারা জীবন বৈদ্যুতিক তরঙ্গ ও বায়ুমণ্ডলে তাপ প্রসারের বৈচিত্র্য নিয়ে নানা গবেষণা করে চলেছেন ডঃ খাস্তগীর। বিজ্ঞানী মহলে তাঁর সুনাম ভারত ছাড়িয়ে দেশ-

বিদেশেও বিস্তার পেয়েছে। তিনি এই বিষয়ে গবেষণা শুরু করেছিলেন পঞ্চাশ বছর আগে। তখন আমরা দুজনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করি। তখনই আলোচনা হত বিজ্ঞানের কথা কিভাবে দেশের জনসাধারণের কাছে মাতৃভাষার মাধ্যমে হাজির করানো যায়। সে সময়ে বিজ্ঞান-পরিচয় বলে একটি মাসিকও প্রকাশিত হত। বিজ্ঞানের নানা কথা নিয়ে বহু প্রবন্ধ লিখেছিলেন এই কাগজে সতীশরঞ্জন ও কিছুদিন পত্রিকা সম্পাদনার ভারও তাঁর উপর পড়েছিল।...' (বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত সতীশরঞ্জন খাস্তগীরের লেখা 'বিদ্যুৎ-পাত সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণা' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।)

বস্তুত বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান প্রসারের জন্যে অধ্যাপক খাস্তগীর আজীবন চেষ্টা করে গেছেন। বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ছাড়াও 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধাবলী বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-লেখার ব্যাপারে উত্তরসূরীদের কাছে আদর্শ হিসেবে কাজ করবে।

কিন্তু এহ বাহ্য। সতীশরঞ্জনের সত্যিকারের পরিচয় প্রতিভাত হয়েছে সম্ভবত তাঁর ছাত্রমহলেই বেশী। কারণ তাঁদের মতে, 'স্যার আমাদের ভাল-বাসতেন, সে ভালবাসা এখনকার অধ্যাপকদের মধ্যে খুবই অভাব।' পেশাগত জীবন থেকে ব্যক্তিগত জীবন পর্যন্ত সতীশরঞ্জনের ভূমিকা ছিল বিশাল বটবৃক্ষের মত। ছাত্ররা কীভাবে গবেষণা করবে, কীভাবে সে সব কাজের বাধা তারা অতিক্রম করতে পারে, এমন কি কাজের পর ব্যক্তিগত জীবনে যাতে তারা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, সমস্ত ব্যাপারে তাঁর লক্ষ্য ছিল।

অধ্যাপক মৃণাল দাশগুপ্তের ভাষায়ঃ এ সব গুণ ডঃ ডি এম বসু, অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা এবং জডরেল ব্যাঙ্কের স্যার লোভেলের মত কয়েকজনের মধ্যেই দেখেছি। অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার সঙ্গে কাজ করাটা ছিল একটা সাংঘাতিক ব্যাপার। কত কাজেই না তিনি ব্যস্ত থাকতেন কিন্তু তারও ফাঁকে হুটহাট করে ঢুকে পড়তেন সকাল-সন্ধ্যায় ছাত্রদের গবেষণার ঘরে। কে কী নিয়ে কাজ করছে, কাজ কতটা এগোল, কেন এগোচ্ছে না, কীভাবে আরও তাড়াতাড়ি শেষ করা যায় সে সব ব্যাপারে অধ্যাপক সাহা কড়া নজর রাখতেন। ছাত্রদের এতটুকু ত্রুটি দেখলে যেমন রেগে যেতেন তিনি, আবার ঠিকমত যাতে তারা কাজ করতে পারে সেদিকে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ছিল। বাইরে থেকে কখনও কখনও তাঁকে নির্দয় মনে হত। কিন্তু ছাত্রদের যাতে ভাল হয়, তারা যাতে ভাল

কাজ করতে পারে, কী আন্তরিকতার সঙ্গেই না সে সবের দিকে তিনি নজর রাখতেন। আসলে ছাত্রদের তিনি ভালবাসতেন প্রচণ্ড। ঠিক একই কথা বলা চলে ডঃ ডি এম বসুর ব্যাপারেও। অধ্যাপক সতীশরঞ্জন খাস্তগীর ওঁদেরই সমগোত্রীয়। গবেষণার পর কোন ছাত্র চাকরি পাচ্ছে না, তাকে শুধু পরিচয় পত্র দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হতেন না। অনেক সময় দেখেছি, তার হাত ধরে কখনও এ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সে-বিশ্ববিদ্যালয়ে, অথবা কোন গবেষণাগারে তিনি ছুটোছুটি করছেন। যে করেই হোক একটা কাজ তাকে জোগাড় করে দিতে হবেই। এমন আন্তরিকতার এখন একান্তই অভাব।

অধ্যাপক মৃণাল দাশগুপ্ত বললেন, ঢাকায় তিন বছর আমি ওঁর ছাত্র ছিলাম। তারপর মাঝে মাঝে ছাড়াছাড়ি ঘটেছে। কিন্তু সব সময় দেখেছি, কোন ছাত্র কোথায় কি করছে সে সব খবর তিনি নিয়মিত রাখতেন। ব্যক্তিগত জীবনে ছাত্রদের সঙ্গে কথাবার্তার ব্যাপারেও তিনি ছিলেন উন্মুক্ত।

'একবার', বললেন দাশগুপ্ত, বোস ইনসটিটিউটে তিনি তখন পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান। 'দেখি দুপুরের দিকে আমার কাছে এসেছেন একটি জার্নাল সম্পর্কে খোঁজ নিতে। আমি বললাম, এ কি করেছেন, এ কাজ তো বেয়ারা দিয়েও করতে পারতেন, স্যার! তা না করে এতটা পথ এই বয়েসে হেঁটে আসা, সিঁড়ি ভেঙ্গে এতটা ওঠা—! আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, ব্যাপার কি জান, সব কাজ বেয়ারা দিয়ে হয় না। আমি যে জার্নালের জন্যে এসেছিলাম, মনে কর সেটা তোমার কাছে নেই। আমি যে ব্যাপারটার খোঁজ করছি, সেটা জানলে তুমি হয়ত অন্য কোন বই বা জার্নাল আমাকে সাজেস্ট করতে পার। সেটা একমাত্র তোমার সঙ্গে কথা বলেই জানা যাবে, ক্ষেপে ক্ষেপে বেয়ারা পাঠিয়ে সে সব কাজ কি চলে? এমন খোলা মেজাজের মানুষ এখন বিরল।... আরও আছে। আগের এক ছাত্র স্যাটেলাইট সিগন্যাল নিয়ে কাজ করছে। স্যার খবরটা শুনে বললেন, ওর সঙ্গে আমাকে একবার পরিচয় করিয়ে দিতে পার? আজকালকার ছেলেরা অনেক নতুন খবর রাখে। তোমাদের সঙ্গে কথা বললে অনেক নতুন কথা জানা যায়।... হ্যাঁ, একেই বলে অ্যাকাডেমিক ক্যারেকটার। জ্ঞানের জন্যে শিক্ষক কীভাবে ছাত্রের দ্বারস্থ হন, লক্ষ করুন। এখনকার দিনে এ সব তো অসম্ভব ঘটনা!'

বসু বিজ্ঞান মন্দিরে সতীশরঞ্জন যখন যোগ দিলেন, তখন তাঁর পরিণত

বয়েস। কিন্তু কাজের বেলায় রীতিমত তরুণ। বসু বিজ্ঞান মন্দিরে যোগ দিয়েই তিনি আচার্য জগদীশচন্দ্রের অসমাপ্ত কাজগুলির প্রতি আকৃষ্ট হন। সে সব নিয়ে তখন তিনি মাথা ঘামাতে থাকেন বেশি। কয়েকজন ছাত্রকে ওই ধরনের গবেষণায় তিনি উদ্বুদ্ধ করেন। কয়েকজন গবেষণা করে ডক্টরেটও পান।

অধ্যাপক মৃণাল দাশগুপ্ত বললেন, পৃথিবীতে জগদীশচন্দ্রই এই বসু বিজ্ঞান মন্দিরের গবেষণাগারে বসে সর্বপ্রথম 'মাইক্রোওয়েভ' তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আচার্যের মৃত্যুর পর তাঁর গবেষণার ধারাটা বসু বিজ্ঞান মন্দিরে আর থাকে নি। সতীশরঞ্জন তার পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছিলেন। এর জন্যে কী পরিশ্রমই না তাঁকে করতে হয়েছিল। কলকাতা শহরে ইলেকট্রিক নয়েজ বড় বেশি। ফলে ওই সব কাজ এখানে করা সম্ভব নয়। এর জন্যে তিনি বারুইপুরে আলাদা গবেষণাগার তৈরি করেন। উপযুক্ত কর্মীর অভাবে সে গবেষণাগার এখন গুটিয়ে নেওয়া হয়েছে।

হ্যাঁ, গবেষণার প্রথম পাঠ এক্স-রের উপর। কর্মক্ষেত্রে নেমে এক্স-রে নিয়ে আর বেশি কাজ তিনি করেন নি। পরে অধ্যাপক শিশির মিত্র প্রভৃতির সহযোগিতায় শুরু করেন অয়নমণ্ডল এবং বায়ুমণ্ডলের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ কীভাবে চলে তার উপর কাজ। সেই কাজই শেষ পর্যন্ত তাঁকে আন্তর্জাতিক খ্যাতির কোঠায় তুলে দিয়েছিল। এবং সে সব ছাড়িয়েও যে কারণে তিনি বিজ্ঞানী এবং ছাত্রমহলে অপরিসীম শ্রদ্ধা অর্জন করতে সক্ষম হন সেটা তাঁর মানবিক দিক। মানুষ এবং কাজের ওপর অকৃত্রিম ভালবাসা।



গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

মে, ১৯৪০-এর একটি সন্ধ্যা। কলকাতার লবণ হ্রদের কাছে কেষ্টপুর গ্রামের এক রাখাল-বালকের চিৎকারে আকৃষ্ট হয়ে একটি গোয়াল ঘরে গিয়ে দেখলাম একটি মাকড়সা অদ্ভুত-দর্শন প্রাণীর সঙ্গে লড়াই করছে। চাটাই-এর তৈরি দুই দেওয়ালের দুটি বাতার সঙ্গে আটকানো একটি মাকড়সার জাল। একটু লক্ষ করতেই দেখলাম সেই জালে একটি খুদে চামচিকে বন্দী হয়ে রয়েছে। মাকড়সাটি বন্দীর ঘাড়টি তার শক্ত দুটি ঠোঁট দিয়ে আঁকড়ে ধরেছে। আর বেচারা চামচিকে থেকে থেকে চিঁ চিঁ ডাক ছাড়ছে।

সন্ধ্যে গড়িয়ে গিয়ে অন্ধকার নেমে আসছিল। ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত দেখার জন্যে ওদের ওপর টর্চের আলো ফেললাম। চামচিকেটি সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে তার ডানার প্রবল ঝাপটা মেরে জালের বন্ধন থেকে বেরিয়ে এল। মাকড়সা তখনও অবিচল। হতভাগ্য প্রাণীটিকে তখনও সে কামড়ে ধরে আছে। চামচিকেটির পিঠের ওপর মাকড়সা। সেই অবস্থাতেই চামচিকে মুক্তির আশায় চাটাই-এর দেওয়ালের মসৃণ অঞ্চলের দিকে বুকে হেঁটে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু নিষ্ফল সে চেষ্টা। চামচিকেটি ক্রমে ক্লান্ত হয়ে উঠল। তার কণ্ঠস্বর স্তিমিত হল। পনের থেকে কুড়ি মিনিট একই জায়গায় স্থির হয়ে পড়ে রইল। অবশেষে পাখার ঝাপটা মেরে আর একবার মুক্তির চেষ্টা। এবারেও সে ব্যর্থ হল।

ওই অবস্থায় একটি কাচের পাত্রের মধ্যে শিকার এবং শিকারীকে বন্দী করলাম। অদ্ভুত ব্যাপার, এমন একটি ঘটনা ঘটল, অথচ মাকড়সার তাতে যেন ভ্রূক্ষেপ নেই। বরং আরও আষ্টেপৃষ্ঠে শিকারকে সে ধরে রইল। ওদের আমার গবেষণাগারে নিয়ে এলাম। আনার সময় দেখলাম, মাকড়সাটি শিকার ছেড়ে দিয়ে কাচের আধারটির এক জায়গায় পাগুলি ছড়িয়ে দিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।…পরদিন দেখলাম চামচিকেটি একপাশে মরে পড়ে রয়েছে। আর একপাশে মাকড়সা। সারারাত শিকারকে সে স্পর্শও করে নি।…

ডিসেম্বর, ১৯৪১ সংখ্যার 'জার্নাল অভ দ্য বোম্বে ন্যাচারাল হিসটোরি'তে তাঁর এক প্রবন্ধে প্রবীণ প্রকৃতি-বিজ্ঞানী শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য ঠিক এইভাবে—সতর্ক, বিশদ এবং পুঙ্খানুপুঙ্খতা বজায় রেখে মাকড়সার চামচিকে শিকার কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য : সব রকম মাকড়সাই প্রাণীভোজী, এবং সচরাচর দুর্বল অমেরুদণ্ডী প্রাণীর ওপরই তারা নির্ভর করে বেশি।…কোন কোন জাতের মাকড়সা মাছ, ইঁদুর, সাপ, ব্যাঙ, গিরগিটি এমন ধরনের সব মেরুদণ্ডী প্রাণীও যে শিকার করে, তার নজির রয়েছে। তবে মাকড়সা যে চামচিকে-কেও আক্রমণ করে, এটা আমার জানা ছিল না।

বলা বাহুল্য, ভারতে এ ধরনের অভিজ্ঞতার কাহিনী গোপালবাবুই প্রথম শুনিয়েছেন। চামচিকে আক্রমণকারী এই মাকড়সা গৃহস্থের ঘর বাড়িতেই অনেকে দেখে থাকবেন হয়ত। বিশেষ জাতের এই মাকড়সার বৈজ্ঞানিক নাম গোপালবাবুই দিয়েছেন 'এম ফলতানা'। ফলতার নাম অনুসারে। তাঁর মন্তব্য : সেদিনের (মে, ১৯৪০) ওই ঘটনার পর থেকেই এ ধরনের মাকড়সার আচরণ সম্পর্কে বিশদ তথ্যাবলী সংগ্রহের জন্যে আমি ব্রতী হই।

কিন্তু এ সবের গৌরচন্দ্রিকা? সে কাহিনী আরও অনেক—অনেক দিনের আগের ঘটনা।

১৩২৬ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যার 'প্রবাসী' পত্রিকায়, পচা গাছপালার আশ্চর্য আলো বিকিরণ করবার ক্ষমতা' এই শিরোনামে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হল। লেখক শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য। সংক্ষিপ্ত এই নিবন্ধটিতে গোপালচন্দ্র লিখলেন :

> কিছুক্ষণ আগে খুব এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। অন্ধকার রাত। একটা রাস্তা দিয়ে চলেছি। সঙ্গে আলো নেই, দুই ধারে ছোট ছোট জংলী গাছ। হঠাৎ একটা জায়গায় দেখলাম যেন অসংখ্য জোনাকী জ্বলছে। সেখানটায় অন্ধকার একটু বেশি। কারণ উপরের দিকটা গাছগাছড়ায় ঢাকা। আরেকটু এগিয়ে দেখি, সেই একই রকমের আলো জ্বলছে। রাস্তাটির দু-পাশেই ওই রকমের আলো। আরও আশ্চর্য, একটা আলোও একটু নড়ে চড়ে না। সন্দেহ হলো—অতগুলি জোনাকী একেবারে চুপচাপ বসে আছে? কারণ কি? একটা লাঠি দিয়ে জঙ্গলটাকে খুব নেড়ে

দিলাম। তবুও সেই আগেকার মতন স্থিরভাবে জ্বলছে, তখন মনে হলো ওগুলি তবে কেঁচোর রস। কারণ কেঁচোর রসও ঠিক ওইভাবে জ্বলে। লাঠি দিয়ে খুব জোরে ওই রকমের আলো সহ খানিকটা মাটি আঁচড়ে তুলে নিলাম। বাতির আলোতে গিয়ে দেখি আর কিছুই নয়. খানিকটা মাটি আর একগাছা মরা দুর্বা। বাতির জোরালো আলোর কাছে ওটাই যে আলো দিচ্ছিল—সেটা মোটেই দেখা গেল না। অন্ধকারে নেওয়া মাত্রই আবার জ্বলন্ত ইলেকট্রিক বাতির কার্বন তারটার মত জ্বলতে আরম্ভ করল।

তখন ওই রকমের কতকগুলি আলোর টুকরো সংগ্রহ করে দেখি যে, সেগুলো কেবলি দুর্বাঘাস নয়, পচা আম পাতা, কাঁঠাল পাতা, আনারস পাতা, আরো গাছের ছোট্ট পচা ডালপালা অনেকই আছে।—সাজিয়ে রেখেছিলাম। সারারাত খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। কিন্তু তার পরের দিন রাত্রিতে দেখি—তারা আর মোটেই আলো দেয় না। কারণ অনুসন্ধানে বোঝা গেল বৃষ্টির জলে ভিজেই ওগুলি এমন সুন্দর সুন্দর আলো দিতে পেরেছিল। আবার সেগুলিকে জলে ভিজিয়ে দিলাম। পরে দেখি সেই রকমের দিব্যি আলো।

একবার মনে হয়েছিল ফসফরাসের মত কোন জিনিস নিশ্চয় এতে আছে, কিন্তু তা থাকলে শুকনো পাতাই বা আলো দিতে পারবে না কেন? তারপর আরও দেখলাম—সব জায়গার পচা জিনিস ভিজলে ওরকম আলো দিতে পারে না। কেবল যেগুলি গাছপালা বা ঝোপঝাড়ের নীচে ছায়ায় থেকে থেকে পচে তারাই অমন আলো দিতে পারে।

গোপালচন্দ্রের বাংলা ভাষায় লেখা এটাই প্রথম বৈজ্ঞানিক রচনা। এমন স্বচ্ছন্দ প্রকাশভঙ্গী সেই সঙ্গে পর্যবেক্ষণলব্ধ একটি ঘটনার এমন সাবলীল বিবরণের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ শুধু যে সর্বসাধারণ পাঠক-পাঠিকাকেই মুগ্ধ করেছিল তা নয়, এই রচনার লেখক সম্পর্কে বিদগ্ধ মহলও যথেষ্ট কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। ১৩২৬ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যার 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হল আর একটি রচনা 'গাছের আলো'। অতঃপর ১৩৭২ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যায় তাঁর 'গাছের আলো' শীর্ষক একটি আলোচনা বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহী হয়ে উঠলেন। পরে প্রখ্যাত বিপ্লবী

পুলিনবিহারী দাসের সঙ্গে আচার্য এ নিয়ে আলোচনা করেন। পুলিনবাবুর সহযোগিতায় গোপালচন্দ্রের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের পরিচয় ঘটল। জগদীশচন্দ্রের আমন্ত্রণে ১৯২১ সালে তিনি গবেষক হিসেবে বসু বিজ্ঞান মন্দিরে যোগ দিলেন।

জন্ম ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে। বাংলা দেশের ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমায় লোনসিং গ্রামে। নিম্নবিত্তের সংসার। বাবা মারা গেলেন, গোপালচন্দ্রের বয়েস তখন পাঁচ বছর। ফলে দুঃখদারিদ্র্য তাঁর বাল্যসঙ্গী হয়ে দাঁড়াল। আর সম্ভবত এর জন্যেই অল্প বয়েস থেকেই তাঁর মধ্যে একটি অন্তর্মুখী মন গড়ে তুলেছিল সতর্ক এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রাকৃতিক ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করার মত অসামান্য যোগ্যতা। না। অনিবার্য কারণে তথাকথিত শিক্ষা বলতে যা বোঝায় সে শিক্ষা অর্জন করতে গোপালচন্দ্র সক্ষম হন নি। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে লোনসিং বিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ময়মনসিং আনন্দমোহন কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর শেষ পরীক্ষার সময় আকস্মিক এক দুর্ঘটনায় পরীক্ষায় ছেদ পড়ল। গ্রামের বিদ্যালয়ে ভূগোলের শিক্ষক হয়ে তিনি ফিরে এলেন। এই সময় পোকামাকড় সংগ্রহের কাজে প্রায়ই তিনি ব্যস্ত থাকতেন। গ্রামের বিদ্যালয় ছেড়ে ১৯১৯ সালে কলকাতায় এসে কাশীপুরের এক বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকরী নেন। তখন অবসর সময়ে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় পাঠাতেন। প্রবাসী পত্রিকায় রচনা প্রকাশ তার পরিণতি।

ডঃ অজিতকুমার মেদ্দা, বসু বিজ্ঞান মন্দিরের শারীরবৃত্ত বিভাগের যে গবেষণাগারটিতে গোপালচন্দ্র দীর্ঘকাল গবেষণা চালিয়ে এসেছিলেন সেই গবেষণাগারেরই এখন প্রধান। সম্প্রতি গোপালচন্দ্রের গবেষণা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ডঃ মেদ্দা আমাকে বলেন: আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর আমন্ত্রণে বসু বিজ্ঞান মন্দিরে এসে প্রথমে তিনি (গোপালচন্দ্র) এখানকার কারখানায় গবেষণার জন্যে তৈরি যন্ত্রপাতির কলাকৌশল ও প্রযুক্তিবিদ্যা, চিত্রাঙ্কন, ব্লক তৈরি, উদ্ভিদের ওপর আণুবীক্ষণিক গবেষণা প্রণালী প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষালাভ করতে লাগলেন। লজ্জাবতী লতার পালভাইনাসে যে দানাদার বস্তুগুলি আছে বৈদ্যুতিক উদ্দীপনায় তারা সঙ্কুচিত হয়। গোপালবাবু দেখলেন

পালভাইনাসের স্ফীত অংশের নিচের দিকটি কেটে বাদ দিলে লজ্জাবতীর পাতা নিচের দিকে সঙ্কুচিত হয়ে হেলে পড়ে, আর ওঠে না। কিন্তু স্ফীত অংশের ওপরের দিকটি কেটে বাদ দিলে পাতাগুলি স্বাভাবিকভাবে প্রসারিত হয়ে উঠে যায়, আর নামে না। এ ধরনের কাজ করে তিনি উদ্ভিদ শারীরবৃত্ত গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন চিন্তার খোরাক জুগিয়েছিলেন। এছাড়া কলমিলতার কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখেন তার ভেতর নতুন ধরনের কতকগুলি কোষ কয়েক ঘণ্টা পর পরই তৈরি হয়ে চলেছে। আচার্য জগদীশচন্দ্র এসব পর্যবেক্ষণলব্ধ ফলাফল দেখে উৎসাহিত হয়েছিলেন।

তবে গোপালচন্দ্রের মৌলিক গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল প্রধানত মাকড়সা, পিঁপড়ে, প্রজাপতি, শুঁয়োপোকা, মাছ এবং ব্যাঙাচি। অদ্ভুত এই সব প্রাণী কীভাবে বাস করে, কোথায় বাস করে, তাদের প্রজনন পদ্ধতি, তাদের সামাজিক এবং ব্যক্তিচরিত্র কী ধরনের—সে সব জানার জন্যে যখন যেখানে পেরেছেন, ছুটে গেছেন। পদ্মপাতার ওপর বসে মাকড়সা কী ভাবে মাছ শিকার করে অথবা টিকটিকি ধরার জন্যে ফাঁদ পেতে কী ভাবে অপেক্ষা করে—সেসব দেখার জন্যে কখনও বা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠায় বসে থেকেছেন সন্তর্পণে, অসীম ধৈর্য ধরে। এইসব প্রাণীর স্বভাব চরিত্র জানার জন্যে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের গবেষণাগারেও তিনি প্রাকৃতিক পরিবেশ তৈরি করে নিয়েছিলেন। কখনও কখনও সেখানে বসেই দেখতেন, মাকড়সাদের মধ্যে পারস্পরিক লড়াই, বুকের নিচে আটকানো থলেয় ভরা সন্তানদের প্রতি স্ত্রী মাকড়সার অপরিসীম আকর্ষণ প্রভৃতি।

গোপালচন্দ্র দেখিয়েছেন, প্রাকৃতিক জগতে এমন ধরনের মাকড়সাও দেখা যায় যাদের চেহারা ঠিক পিঁপড়ের মত। পিঁপড়ের চেহারার সঙ্গে তাদের এত মিল স্থূল চোখে যেন তা ধরাই পড়ে না। তিনি এদের নাম দিয়েছেন পিঁপড়ে অনুকরণকারী মাকড়সা। ১৯৩১-৩২ সালে বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রকাশিত 'ট্রানজাকশন'-এ মাকড়সার মাছ শিকারের কাহিনীর বর্ণনা দেন। পরে তিনি ৪৬টি পিঁপড়ে অনুকরণকারী মাকড়সার জীবন-ইতিহাসের কথাও উল্লেখ করেছেন। সেই সঙ্গে ওইসব মাকড়সার যে কয়টি নতুন প্রজাতি আবিষ্কার করেছিলেন, তাদের কথাও। তাঁর ধারণা, পৃথিবীতে যত রকমের পিঁপড়ে আছে ঠিক তত রকমের পিঁপড়ে-অনুকরণকারী মাকড়সাও থাকতে পারে।

তাঁর সদা অনুসন্ধিৎসু চোখে কখনও ধরা পড়েছে, পিঁপড়েরা দলবদ্ধ হয়ে পরস্পর যুদ্ধ করছে, যুদ্ধের সময় মাঝে মাঝে তারা পেছনের অংশ থেকে এক ধরনের ঝাঁঝালো রস ছেড়ে দিচ্ছে। অথবা দেখেছেন একটি শুঁয়োপোকা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। যেন মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা। তাকে অনুসরণ করছে শত শত শুঁয়োপোকা। সম্মুখের পোকাটি লজ্জাবতী লতার একটি টবে গিয়ে উঠে তার ওপরকার চক্রাকার প্রান্ত বরাবর হাঁটতে শুরু করল। হাঁটছে, শুধু হাঁটছে। টবের চক্রাকার প্রান্ত বরাবর বার বার ঘুরে হাঁটছে। আর তার পেছনে দলবদ্ধভাবে হেঁটে চলেছে তার অনুগামীরা। খাওয়া নেই, শুধু হেঁটে চলা। পাঁচ ছয় দিন পর দেখা গেল অনাহারে ক্লান্তিতে একে একে তারা মরে গেল। শোনা যায় এক ধরনের ইদুর জাতীয় প্রাণী আছে, বংশ বৃদ্ধির ফলে যখন তাদের সংখ্যা ভীষণভাবে বেড়ে যায় অথচ খাদ্য যোগাতে পারে না, তখন তারা এমনি দলবদ্ধভাবেই সামনের দিকে সমানে হেঁটে বেড়ায় এবং দলবদ্ধভাবে মারা পড়ে। চলার পথে সামনে সমুদ্র পড়লেও চলা থেকে বিরত হয় না। জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তবু থামে না। প্রাণীজগতের এই যে ব্যবহারিক দিক—এর রহস্য এখনও অনুদ্ঘাটিত।

গোপালচন্দ্র দেখিয়েছেন, ভিটামিন বি-১২ প্রয়োগ করলে ব্যাঙাচির রূপান্তর ত্বরান্বিত হয়। কিন্তু পেনিসিলিন বা স্ট্রেপটোমাইসিনের প্রয়োগে এই রূপান্তর মন্দীভূত হয়। ১৯৫৪ সালে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিনি একটি প্রবন্ধও প্রকাশ করেছিলেন। বসু বিজ্ঞান মন্দিরের তৎকালীন পরিচালক ডঃ দেবেন্দ্রমোহন বসু এই উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণের ফলাফল দেখে এর ওপর উন্নত ধরনের গবেষণার জন্যে একটি পরিকল্পনাও তৈরি করেন। এই পরিকল্পনায় গোপালবাবুর পর্যবেক্ষণ-লব্ধ অভিজ্ঞতার উপর উন্নততর গবেষণা চালিয়ে ডঃ অজিতকুমার মেদ্দা এবং ডঃ প্রমথনাথ নন্দী লক্ষ করেন, পেনিসিলিন প্রয়োগ করলে ব্যাঙাচির পরিপাকনালীর মধ্যে ভিটামিন বি-১২ প্রস্তুতকারী যেসব ব্যাকটেরিয়া থাকে তারা মরে যায়। এর ফলে ব্যাঙাচির দেহে এই ভিটামিনের অভাব ঘটে এবং তাদের দৈহিক রূপান্তর মন্দীভূত হয়। কখনও বা আদৌ রূপান্তর ঘটে না। বলা বাহুল্য, অ্যান্টিবাইওটিক প্রয়োগে এ ধরনের ঘটনা অন্যান্য প্রাণী এবং মানুষের ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে। ভারতে ব্যাঙাচির রূপান্তর সমস্যা নিয়ে এ ধরনের গবেষণার কাজ এই প্রথম।

কলকাতায় হঠাৎ এমন মশার উপদ্রব বেড়ে গেল কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর জুগিয়েছেন গোপালচন্দ্র। তাঁর মতে: কোন কোন জাতের ব্যাঙাচি (Rana tigrina) মশার শুক্র-কীট বা লার্ভা ধরে ধরে খায়। কলকাতায় আগে এত মশার উপদ্রব ছিল না। কারণ, হয়ত কলকাতা এবং তার আশপাশের জলাশয়ে এই জাতের প্রচুর ব্যাঙাচি জন্মাত। তারাই মশার সমস্ত লার্ভা খেয়ে নিত বলেই মশার উপদ্রব তত ছিল না। এখন কলকাতা বা তার আশপাশের জলাশয়ে ওই ধরনের ব্যাঙাচি খুব কম দেখা যায়। এমন কি বর্ষার সময়ও তেমন চোখে পড়ে না। ডঃ মেদ্দার বক্তব্য: বর্তমান কলকাতায় মশা নিয়ন্ত্রণ ওই ধরনের ব্যাঙাচির সাহায্যে সম্ভব করে তোলা যায় কি না, সেটা পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে।

দেশ বিদেশের গবেষণামূলক পত্র-পত্রিকায় গোপালচন্দ্রের অজস্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৩৬ সালে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পত্রিকা ন্যাচারাল হিসটোরিতে (Vol. XXXVIII, 1936, No. 1 pp 77-81) প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধ 'ডাইভিং স্পাইডার' সম্পর্কে 'নিউইয়র্ক টাইমস' উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিল। হাক্সলি তাঁর কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এবং জনৈক বিজ্ঞানীর বক্তব্য, স্বয়ং আচার্য জগদীশচন্দ্র তাঁর কোন এক বন্ধুকে নাকি বলেছিলেন, গোপাল যা কাজ করেছে তা দিয়ে ডি এস সি-র প্রবন্ধ লেখা যায়।

অপবাদ, আমাদের দেশে যাঁরা বিজ্ঞান চর্চা করেন, তাঁরা বিজ্ঞান সম্বন্ধে লেখেন না। বিশেষ করে মাতৃভাষায় তো নয়ই। জগদীশচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর, জগদানন্দ রায় প্রভৃতি তাঁদের মধ্যে ব্যতিক্রম। কিন্তু গোপালচন্দ্র যেন বিশিষ্টতম ব্যতিক্রম। তাঁর আগে বাংলা ভাষায় রচিত বেশির ভাগ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের মধ্যে কখনও বা 'মেটাফিজিকস' কখনও বা অলঙ্কার বা উপমার আতিশয্য বেশি থাকায় বিজ্ঞানের মূল বক্তব্য পাঠক-পাঠিকার কাছে পরোক্ষ বিষয় বলে মনে হয়েছে। কিন্তু গোপালচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাবলী সে ক্ষেত্রে একটা বড় রকমের ব্যতিক্রম। বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তু সরাসরি পাঠকমনে যে পৌঁছে দেওয়া যায় এবং যথাযথভাবে, তাঁর প্রতিটি রচনাই তার প্রমাণ। বর্তমান প্রবন্ধের গোড়ায় গোপালবাবুর প্রথম রচনা পড়লেই কথাটা যে সত্যি,

বোঝা যাবে। মাতৃভাষায় আধুনিক বিজ্ঞান প্রচারের ক্ষেত্রে এর জন্যে তাঁকে যদি পথিকৃৎ বলা হয়, হয়ত বাড়িয়ে বলা হবে না। দীর্ঘকাল তিনি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রকাশিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার প্রধান সম্পাদক রূপে যে দায়িত্ব পালন করে আসছেন, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান প্রসারের ক্ষেত্রে তার মূল্য যে অপরিসীম, বলাই বাহুল্য। 'বাংলার কীট পতঙ্গ' নামক অমূল্য গ্রন্থের জন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৭৫ সালে তাঁকে বিজ্ঞানে রবীন্দ্র পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেছেন। দীর্ঘ জীবনে তিনি অজস্র বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখেছেন। সে সব প্রবন্ধ বাংলা ভাষায় জনপ্রিয় বিজ্ঞান রচনা সমৃদ্ধ করেছে।

—



জন্ম : ৭ জানুয়ারি, ১৯৩৪। মুর্শিদাবাদে। এখন হুগলী জেলার ডানকুনির স্থায়ী বাসিন্দা।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের স্নাতক সমরজিৎ কর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউণ্ডেশন বৃত্তি এবং ফুলব্রাইট বৃত্তি নিয়ে টেকসাস বিশ্ববিদ্যালয়ে পরমাণু-বিজ্ঞানে উচ্চতর পড়াশোনা করেছেন। এখানেই তিনি অ্যাডভান্স সায়েন্স রাইটিং কোর্স-এ কৃতিত্বের সঙ্গে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেন।

ইংরেজী ও বাংলা নানা দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞান নিয়ে লেখা দিয়েই লেখক-জীবনের শুরু। পরবর্তীকালে কয়েকটি কল্পবিজ্ঞান কাহিনী লিখে বাংলা সাহিত্যের বহু-অনুভূত অভাব পূর্ণ করেছেন। মৌলিক ও স্বাদু, বৈজ্ঞানিক ও কল্পনাপ্রবণ এই রচনাগুলির পথিকৃৎ সমরজিৎ কর একটি সম্ভ্রম-বিজড়িত আসন করে নিয়েছেন। দীর্ঘকাল যাবৎ 'দেশ' পত্রিকায় বিজ্ঞান বিষয়ের নিয়মিত লেখক। স্বদেশী ও বিদেশী বিশ্ব-বিশ্রুত বহু বিজ্ঞানীর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত যোগাযোগ রয়েছে।

বাংলাভাষায় বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার জন্য 'বিজ্ঞান সরস্বতী' পুরস্কার পেয়েছেন। প্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতির মিলনে বিশ্বাসী শ্রীকর-এর প্রিয় দুটি বস্তু অরণ্য ও পর্বত।